পদক্ষেপ

॥ আবদুল আজীজ আল্‌-আমান ॥

প্রকাশক:
এস, মল্লিক
৩৭-এ, কলেজ রো
কলিকাত-১২

প্রাপ্তিস্থান :
ইউনিভার্সাল বুক ডিপো
৫৭-বি, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ :
বিজয়া দশমী
বুধবার
৫ই কার্তিক, ১৩৬৫

দ্বিতীয় সংস্করণ,
শুক্রবার
২৩শে আশ্বিন, ১৩৭১

মুদ্রণালয় :
পি, বি, প্রেস
শ্রীশক্তিপদ পাল
১/১-এ গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ-শিল্পী :
জিতেন দাসগুপ্ত

ব্লক-নির্মাণ ও প্রচ্ছদ-মুদ্রণ
স্টাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং
১নং রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা

মূল্য : দশ টাকা মাত্র

পরম শ্রদ্ধেয় বহুভাষা-বিদ্ মনীষী

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

এম-এ, বি-এল, ডিপ্লো-ফোন, ডি-লিট্ (প্যারিস)-সাহেবকে

॥ নিবেদন ॥

চর্য্যাপদ হ'তে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্য পর্যন্ত পদক্ষেপের কাল-সীমা বিস্তৃত। এতে মোট পনেরটি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। প্রতিটি প্রবন্ধই স্বয়ং সম্পূর্ণ সকলের সমবায়ে বাংলা সাহিত্যের বিকাশ-ধারা ও আনুপূর্বিকতার সুরটি বেজে উঠেছে। আভাসিত হ'য়েছে বয়ঃসন্ধি হতে যৌবন-সমাগমের ইসারা-ইংগিত। রস-লিপ্সু পাঠক-চিত্তে প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের মোটামুটি একটি চিত্র যে ফুটে উঠবে শঙ্কিত মনে সে আশাটুকু পোষণ করি।

'চর্য্যাপদ' প্রবন্ধটি ইতিপূর্বে পৃথক গ্রন্থ সাহিত্য-সঙ্গে প্রকাশিত হ'য়েছে কিন্তু আনুপূর্বিকতাটি রক্ষার জন্যে ওটাকে পদক্ষেপের সামিল করা হ'ল। এখন হ'তে ওটা পদক্ষেপের সামগ্রী।

গ্রন্থের নামকরণ-সম্পর্কে একটি কথা আছে। কোন 'অসারবাণ সাহিত্যের' নাম-লিপি পদক্ষেপ হ'লে হয়ত সঙ্গত ও শোভন হ'তো বেশী কিন্তু কোন কল্লোচ্ছ্বাসের বশবর্তী হ'য়ে আমি প্রবন্ধ-গ্রন্থের এভাবে নামকরণ করিনি। স্নাতকোত্তর জীবনে প্রাচীন কাব্যগুলি অধ্যয়ন-কালে যত নিবিষ্ট চিত্ত হ'তে পেরেছি, ততই মনে হ'য়েছে আমি যেন ক্রমান্বয়ে এক সুবিশাল গভীর রহস্যাচ্ছন্ন অজ্ঞাত অরণ্য-ভূমির পাদ-প্রান্তে এসে উপণীত হ'য়েছি। প্রথমে ছিল সংশয়, তারপর সংশয় কাটিয়ে নিঃসংশয়-চিত্ত হ'তে পেরেছি। এই নিঃসংশয় কিন্তু মুগ্ধ চিত্তটি নিয়ে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় তত্ত্ব-গভীর কাব্যারণ্যের প্রান্ত-সীমায় পদক্ষেপ করেছি। হয়তো এ পদক্ষেপ,হাঁটি হাঁটি-পা-পা-র যুগেব মধ্যেই সীমিত। এটাই গন্থের নামকরণের উৎস-ভূমি। পদক্ষেপ—প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় কাব্যের রহস্যাচ্ছন্ন দুরূহ-সুন্দর বনপথে দুর্গম যাত্রা।

প্রায় সকল প্রবন্ধেই তথ্য, তত্ত্ব ও রস নিয়ে আলোচনা করতে হ'য়েছে। ভাল মন্দ এবং সাফল্য-বিবেচনার ভার বিদগ্ধ পাঠকের। তবে আমার তরফ থেকে বল্‌তে পারি, শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার অভাব হয়নি কখনো। যে তত্ত্ব আমি নিজে উপলব্ধি করতে পারিনি সে তত্ত্বকে বাক্যজালের আবরণে অধিকতর জটিল ও রহস্যময় করে তুলিনি কোথাও। বিশ্বাস-নিষ্ঠা নিয়ে তথ্য ও তত্ত্বের পথে অগ্রসর হয়ে যেটুকু উপলব্ধি করতে পেরেছি মুগ্ধ-চিত্তে এবং সবিনয়ে সেটাই প্রকাশ করেছি।

ঋণ আছে অনেকের কাছে—যথাস্থানে অকৃপণ হৃদয়ে সে ঋণের কথা স্বীকার করেছি। একটি গ্রন্থ-তালিকাও সংযোজিত হ'ল—এই গ্রন্থ সমূহের গবেষক পণ্ডিত-মনীষীদের কাছে আমার ঋণের অন্ত নেই।

মুদ্রণ-পরীক্ষা করেছেন বন্ধুবর আব্‌দুল জববার। এই বিষয়ের ভুল-ত্রুটি সব তাঁর। অজ্ঞতার জন্যে তথ্য তত্ত্বগত যে অসংগতি রয়ে গেল তার সব দোষটুকু আমার প্রাপ্য।

পরিশেষে, গ্রন্থখানি পাঠকদের এতটুকুও তৃপ্ত করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করব। ইতি—

সোলেমানপুর, রাজীবপুর
২৪ পরগণা

আবদুল আজীজ আল্‌-আমন

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

প্রায় এক বৎসর হল প্রথম সংস্করণ শেষ হ'য়েছে। দ্বিতীয় সংস্করণ বেরুল সম্পূর্ণ নতুন কলেবরে, নতুন আঙ্গিকে প্রথম সংস্করণে প্রায় প্রতি পৃষ্ঠায় মুদ্রণ ত্রুটি লক্ষ করা গিয়াছিল। বর্তমান সংস্করণে যত্ন সহকারে তা' সংশোধনের চেষ্টা করেছি। দ্বিতীয় সংস্করণে আরো ভাল লাগবে।

ইতি—

সোলেমানপুর, রাজীবপুর
২৪ পরগণা
২৩ শে আশ্বিন, ১৩৭১

আবদুল আজীজ আল্-আমন

সূচীপত্র

অব্দুল আজীজ আল্-আমানের কয়েটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ

পদক্ষেপ (২য় সং)—১০·০০

সাহিত্য-সঙ্গ (২য় সং)—১০·৫০

ধন্য জীবনের পুণ্য কাহিনী (৩য় সং)—২·০০

সোলেমানপুরের আয়েশাখাতুন (গল্প-সংকলন)—২·৫০

শাহানী একটি মেয়ের নাম (২য় সং ঃ উপন্যাস)—২·০০

নজরুল মানস পরিক্রমা—১০·০০

নজরুল-রচনার উৎস—৫·০০

নজরুল-জীবনী—১৫·০০

নজরুল-সাহিত্য (যন্ত্রস্থ)

॥ চর্যাপদ ॥

॥ এক ॥

॥ চর্যাপদের সাহিত্যিক মূল্য ॥

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চর্যাপদ রত্ন-গর্ভা অজন্তা। অজন্তাব আবিষ্কারে যেমন শিল্প সুষমামণ্ডিত সমৃদ্ধিশালী বিশাল ভারতবর্ষের প্রাচীনতম সভ্যতার সাথে আমাদের নিবিড় পরিচয় ঘটেছে তেমনি এই চর্যাপদের আবিষ্কার আমাদের বিস্মৃত দৃষ্টির সম্মুখে বাংলা সাহিত্যের আদিমতম সৃষ্টি ধারার গোপন উৎস-মূল খুলে দিয়েছে। চর্যাপদ বাংলা সাহিত্য-সৃষ্টি-প্রচেষ্টার প্রারম্ভিক নিদর্শন। প্রকৃত এবং অপভ্রংশের ক্রম-পরিবর্তনশীল আলোড়ন বিবর্তনের স্তর অতিক্রম করে সবে মাত্র যখন বাংলা ভাষা মাতৃগর্ভ হতে জন্মগ্রহণ করেছে জীবনের সেই ঊষালগ্ন হতেই আপন শক্তিব অকৃপণ সহায়তায় সে অসংখ্য কবিকুলের গোপন মনের ধ্যান-ধারণাকে বাঙ্ময় কবে তুলেছে, তাদের অন্তরে দিয়েছে সৃষ্টির বেগ। চর্যাপদ সেই সৃষ্টি বেগেব প্রথম ফসল। বাংলা সাহিত্যের প্রত্যুষকালে আলো-আঁধারীর মিলন-লীলায় যে অসংখ্য কবিকণ্ঠে ভোরের শান্ত আকাশ কাকলীমুখর হয়ে উঠেছিল তাঁদের চব্বিশ জনের কণ্ঠমাধুর্য আমরা চর্যাপদের মাধ্যমে উপভোগ করার সৌভাগ্য লাভ করেছি।

পৃথিবীর সকল দেশেই সাহিত্যের প্রাথমিক আত্ম-স্ফুরণে ধর্মচেতনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেছে। ধর্মকে কেন্দ্র করেই সাহিত্যের হয়েছে প্রারম্ভিক আত্মবিকাশ, বাংলা সাহিত্যও এই সাধারণ ধর্মের ব্যতিক্রম নয়। চর্যাপদের মুখ্য রাগিনী তাই ধর্মকে কেন্দ্র করে বেজে উঠেছে। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ তাঁদের ধর্ম-বিশ্বাস এবং মতকে চর্যাপদের ছন্দ-বন্ধনে ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু এই নীরস ধর্মতত্ত্বের মধ্যে চর্যার

সাহিত্যিক মূল্য নিহিত নেই, সাহিত্যের বিশেষ রসমূল্য সেখানে—যেখানে চর্যার সকল তাত্ত্বিক-তার্কিকতা কবির ব্যক্তিগত হৃদয়োপলব্ধির আনন্দের অন্তরালে আত্মগোপন করে ছন্দোবদ্ধ সুর মূর্চ্ছনায় 'গান' হয়ে উঠেছে। চর্যাকারগণ আপন ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্বটিকে কেবলমাত্র লিপিবদ্ধ করতে চাননি তাঁরা চেয়েছিলেন আপন ধর্ম মহিমাকে গণচিত্তে সঞ্চারিত করে দিতে। ধর্ম পালনের মধ্য দিয়ে তাঁরা আপন হৃদয়ে যে আনন্দোপলব্ধি করেছিলেন সেই সীমাতিক্রমী আনন্দ বেগকে আপন হৃদয়ের মধ্যে আবদ্ধ রাখা আর তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি—তার প্রকাশ অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। সেই হৃদয়োপলব্ধিজাত সত্যকে সাধারণীকরণের মাধ্যমে চর্যাকারগণ সর্বজন হৃদয়-সংবেদ্য করে তুলেছেন। ধর্মের নীরস তত্ত্ব কথাকে—হোক সে হৃদয়োপলব্ধি-জাত সত্য—এই সর্বজন-হৃদয়-সংবেদ্য করে তোলার মধ্যেই রয়েছে এক ঐন্দ্রজালিক-স্পর্শ। এই ঐন্দ্রজালিক স্পর্শেই চর্যাকারগণের রুক্ষ ধর্ম তত্ত্ব ও অন্তর গূঢ় সাধন পদ্ধতি সকল রুক্ষতা ও কর্কশতার সীমা অতিক্রম করে 'সুন্দর' হয়ে উঠেছে। এই 'সুন্দর' হয়ে উঠার পিছনে আমরা যে ঐন্দ্রজালিক স্পর্শের কথা বললাম তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করলেই চর্যার-সাহিত্যিক মূল্য আমাদের নিকট আপন মহিমায় প্রত্যক্ষ হয়ে উঠবে। বস্তুতঃ এই ঐন্দ্রজালিক স্পর্শই হলো সাহিত্যের স্পর্শ, কবিতার প্রাণ-স্পন্দনী হ্লাদিনী শক্তি।

কবিতার এই প্রাণ-সঞ্চারিণী হ্লাদিনী শক্তি আত্মগোপন করে থাকে কবিতার ছন্দ-অলঙ্কার, উপমা রূপক, ভাব-রস ইত্যাদির মধ্যে। সুতরাং চর্যার এই হ্লাদিনী শক্তির স্বরূপ-উদঘাটনে উল্লেখিত প্রত্যেকটি বিষয়ের আলোচনা প্রয়োজন। প্রথমে চর্যার ছন্দ নিয়ে আমরা আলোচনা করবো।

ক ॥ চর্যার ছন্দ :—যে সময় (৯৫০-১২৫০ খৃঃ) চর্যাগুলি রচিত হয়েছিল সে সময় সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রে সংস্কৃতের প্রভাব ব্যাপক এবং গভীর। কিন্তু চর্যাপদগুলি আশ্চর্যভাবে সংস্কৃতের প্রভাব হতে মুক্ত হয়ে ভিন্ন

পথে পদচারণা করেছে। সংস্কৃতের জাতি-ছন্দ অনুসরণ না করে চর্যাকারগণ সর্বপ্রথম সংস্কৃতের সর্বগ্রাসী কবল হতে মুক্ত হয়ে ছন্দের নতুন দিগন্ত আবিষ্কার করেছেন। সংস্কৃতের জাতি-ছন্দ অনুসরণ না করে চর্যাকারগণ মাত্রাবৃত্ত রীতির ধ্বনি প্রধান ছন্দে পদ রচনা করেছেন—যে ছন্দের আর এক নাম পাদকুলক। এই পাদকুলক ছন্দ হতেই পরবর্তীকাল বাংলার সুবিখ্যাত পয়ার ছন্দের জন্ম। সংস্কৃতে সাধারণতঃ অন্ত্যানুপ্রাসের প্রচলন নেই—চর্যাপদের প্রায় সকল পদই এই অন্ত্যানুপ্রাসের অসীম আনন্দে নৃত্যচপল হয়ে উঠেছে। ১নং চর্যা থেকেই উদাহরণ নেওয়া যাক ঃ

কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।
চঞ্চল চীএ পাইঠা কাল॥

বাংলা কাব্য সাহিত্যে পয়ার এবং ত্রিপদীর প্রভাব ব্যাপক এবং গভীর। সুদূর অতীত কাল হতে আধুনিক পূর্বযুগ পর্যন্ত এই দুই ছন্দই বাংলা কবিতার প্রধান হাতিয়ার রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয়ে এই চর্যাপদই হল এই বহুখ্যাত ছন্দের সূতিকাগার। চর্যার বুকেই এদের জন্ম। চর্যার ছন্দ-রীতিকে অনুসরণ করে পরবর্তী কালে বাংলায় এই দুই ছন্দ গড়ে ওঠে। ত্রিপদীর ক্রম-বর্দ্ধমান ধ্বনির স্পন্দনে চর্যার অনেকগুলি পদ সুন্দর হয়ে উঠেছে ঃ

বাহতু ডোম্বী বাহলো ডোম্বী
বাটত ভইল উছারা।
সদ্-গুরু-পাঅ পসাত্র্র জাইব
পুণু জিণউরা॥

পয়ারের একটি উদাহরণ ঃ

টালত মোর ঘর নাহি পড়িবেষী।[১৩]
হাঁড়িতে ভাত নাহি নিতি আবেশী॥[১২]

অবশ্য চর্যার ছন্দে যে দুর্বলতা নেই তা নয়—বরং অনেক ক্ষেত্রে বহু ত্রুটী, বহু দুর্বলতা প্রকট হয়ে উঠেছে। উপরে যে পয়ারের উদাহরণটি

গ্রহণ করা হয়েছে তাতে অক্ষর সমতা নেই। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন চর্যাগুলি গীত হতো প্রতিটি চর্যার শীর্ষদেশে রাগ রাগিণীর উল্লেখে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। ফলে সুরের টানে এবং বিবিধ রাগ-রাগিণীর বিচিত্র তালে এই অক্ষর অসামঞ্জস্য কখনো প্রধান হয়ে উঠতো না—সুর-মূর্চ্ছনার অন্তরালে সম্পূর্ণরূপে অবলুপ্ত হয়ে যেতো। সেই সুদূর অতীতকালে যখন বাংলা কাব্য-রীতির কোন আদর্শই গড়ে ওঠেনি সেই তমসাচ্ছন্ন যুগে চর্যাকারগণ যে প্রায় দুর্বলতাহীন এমন সংগীতধর্মী বলিষ্ঠ পদ ও ছন্দ রচনা করতে পেরেছেন এতো একান্তভাবে তাঁদের শিল্প-সুষম মনোভংগীরই পরিচায়ক।

অক্ষরের সংখ্যা দ্বারা বাংলায় বিবিধ ছন্দের নামকরণ করা হয়ে থাকে—চর্যা হতেই এই রীতির সূত্রপাত। ৪৯ নং চর্যায় 'আজ ভুসু বাঙ্গালী ভইলী'তে 'দশাক্ষরা বৃত্তি' ছন্দের পরিচয় সুস্পষ্ট। মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম চতুর্দশপদী কবিতা রচনার রীতি প্রচলন করেছেন বলে আমাদের বিশ্বাস প্রচলিত এবং দৃঢ় হয়েছে—কিন্তু সুদূর অতীতকালে বাংলা ভাষার গঠমান যুগের চর্যাপদে আমরা এই রীতির প্রাচীনতম রূপের সন্ধান পাই। ১০ম এবং ৫০শ সংখ্যক চর্যা দুটি আমাদের মন্তব্যের পরি-পোষক হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

সাধারণতঃ জয়দেবের গীতগোবিন্দের প্রকাশ ভংগীকে বাংলা ছন্দের আদর্শ বলে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায় গীতগোবিন্দের বহু ছন্দ তদপেক্ষা পূর্বে রচিত চর্যাপদেরই অনুরূপ। একটি উদাহরণে আমাদের কথার যথার্থতা প্রমাণিত হবে ঃ

২ ১ ১ ২ ২ ১ ১ ২ ২ ২ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ২ ২
ধীর-সমীরে। যমুনা-তীরে। বসতি বনে বন-। মালী।

২ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ২
পীন পয়োধর। পরিসর-মর্দন। চঞ্চল-করযুগ-। শালী॥

॥ গীতগোবিন্দ ॥

তুলনীয় ঃ

২ ২ ২ ২ ২ ১ ১ ২ ২ ১ ১ ২ ১ ১ ২ ২ ২
উঁচা উঁচা। পাবত তহিঁ। বসই সবরী। বালী।
২ ২ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ২ ৩ ৩ ২ ২
মোরঙ্গি পীচ্ছ। পরহিণ সবরী। গিবত গুঞ্জরী। মালী॥
॥ চর্যা—২৮নং॥

সুতরাং গীতগোবিন্দে নয় চর্যাতেই বাংলা ছন্দের আদিমতম রূপের সন্ধান করা উচিত। কেননা চর্যা একদিকে যেমন প্রাচীনতম অন্যদিকে তেমনি বাংলার সমপ্রকৃতি ছন্দও সেখানে বিরল নয়।

খ ॥ অলংকার ঃ

কাব্যং গ্রাহ্যমলঙ্কারাৎ—এই যদি হয় কাব্যের সংজ্ঞা তাহলে চর্যাপদকে কাব্যের দিগন্ত হতে বহিষ্কারের কোন স্পর্ধা আমাদের নেই। চর্যাব নিবাভরণ দেহ অলংকারের অভিনব দীপ্তিতে ঝলকিত হয়ে উঠেছে। অলংকাব দু'প্রকার—শব্দালংকার ও অর্থালংকার। বলাবাহুল্য এই উভয়বিধ অলংকারের সুষ্ঠু প্রয়োগে রুক্ষ তত্ত্বাশ্রয়ী চর্যার প্রতি অঙ্গ সৌন্দর্য-সুষম হয়ে উঠেছে।

শব্দালংকারেব মধ্যে যমক ও অনুপ্রাস সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই অনুপ্রাসের জন্যই আমবা মূল চর্যার অর্থ বুঝি বা না বুঝি শব্দের বিরামহীন ঝংকার আমাদেব চিত্তে অপূর্ব শিহরণ আলোড়নের সৃষ্টি করে এবং শ্রবণ পথের তৃপ্তি ঘটায। নিম্নের উদাহরণগুলি লক্ষ্য করলেই আমরা চর্যাকারগণের অনুপ্রাস প্রয়োগের নিপুণতা সম্বন্ধে অবহিত হতে পারবো ঃ

সঅল সমাহিঅ কাহি করিঅই।.... ॥ চর্যা—১নং॥
সঅ-সম্বেঅণ সরুঅ-বিআরেঁ
অলক্খলক্খণ ণ জাই.... ॥ চর্যা—১৫নং॥
নিরন্তর গঅনন্ত তুসে ঘোলাই.... ॥ চর্যা—১৩নং॥
ছাআ মাআ কাআ সমাণা।.... চর্যা—৪৬নং॥ ইত্যাদি।

অর্থালংকারের মধ্যে উপমা এবং রূপকের রূপময় প্রয়োগ চর্যার অন্তর্নিহিত ভাবধারাকে সুন্দর এবং ব্যঞ্জনায়িত করে তুলেছে। চর্যা সাধকগণ জনচিত্তের কাছে আবেদনশীল করার জন্যে চর্যাপদ রচনা করেছিলেন, তাই তার সংস্কৃত-অলংকার শাস্ত্রানুমোদিত অলংকরণকে উপেক্ষা করে প্রাত্যহিক চলমান জীবনের অতি পরিচিত পরিবেশ হতেই অলংকার সংগ্রহ করে গণচিত্তের সম্মুখে আপন ধর্মের দুরূহ ও গূঢ় নীরস সাধন-তত্ত্বগুলিকে স্পষ্টালোকে মেলে ধরেছেন। মহাযানীদের মতে নির্বাণ কেবল তত্ত্বমাত্র, তার কোন বাস্তব রূপ নেই, কিন্তু সহজিয়ারা এর নামকরণ এবং রূপপ্রদান করেছেন এমন কি বাসস্থান নির্দেশ করতে ভোলেন নি। মোট কথা সহজিয়াগণ নির্বাণের একটা বাস্তবরূপ কল্পনা করে বাস্তব উপমা ও রূপকের মাধ্যমে তার সহজতম রূপটি গণচিত্তের সম্মুখে তুলে ধরেছেন। এই নির্বাণকে তারা বলেছেন নৈরাত্মদেবী—নামান্তরে ডোম্বী, শবরী বা চণ্ডালী। এই নির্বাণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়—সুতরাং এঁর বাসস্থান দেহনগরীর বাইরে দূরে পর্বতের উঁচু টিলায়। বদ্ধ এবং মুক্ত উভয় প্রকার জীবকে নিয়ে ক্রীড়া করেন বলে ইনি নষ্ট চরিত্রা যুবতী বলেও কল্পিত হয়েছেন। নষ্ট চরিত্রা এক যুবতী দূর পর্বতের উঁচু টিলায় নির্জনে একাকী বাস করে—এর অন্তর্নিহিত মর্ম যাই হোক সাধারণকে আকর্ষণ করার জন্যে এইটুকুই যথেষ্ট। সুতরাং এই প্রকার বাস্তব-উপমা যেন চর্যাকারগণের হস্ত হতে নিক্ষিপ্ত লক্ষ্যভেদী বাণ—এর নিক্ষেপ অব্যর্থ। এ ছাড়াও ডোম ডোমনীর যুগল প্রেম সংগঠন, নৌকা বাওয়া, সাঁকো তৈরী, চ্যাঙাড়ী-বোনা, তুলোধোনা ইত্যাদি যে-চিত্রগুলি ধর্মের গূঢ় সংকেতকে আভাসিত করেছে—সেগুলিও চর্যাকারগণ বাস্তব পটভূমি হতেই গ্রহণ করেছেন। অসংখ্য রূপকের প্রয়োগচর্যার গূঢ় মর্মকে রসরূপের মাধ্যমে সদাজাগ্রত রেখেছে। প্রথম চর্যায় কায়াকে তরুর সাথে তুলনা করা হয়েছে দ্বিতীয় চর্যায় নৈরাত্ম সাধকের বধূরূপে কল্পিত, তৃতীয় চর্যায় মদের দোকানে তাঁকে শুঁড়ি বধূর সাথে তুলনা করা হয়েছে, পঞ্চম চর্যায় পার্থিব জীবন চলমান নদীর

সাথে কল্পিত. যষ্ঠ চর্যায় চর্যা-সাধক-ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে হরিণ শিকারের উপমায়। সুতরাং চর্যার সর্বত্র উপমা-রূপকের বহুল প্রয়োগ তার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব কথাকে সুন্দর সহজতম রসরূপ দান করেছে। ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রকাশে সাধারণ জীবন-পরিচিত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করে সেই অনুভূতিকে সর্বজন-হৃদয়-সংবেদ্য করে তুলেছে। সাহিত্যে একেই বলে সাধারণীকরণ। "চর্যাগুলি সন্ধ্যাভাষায় রচিত। সন্ধ্যাভাষা আলো-আঁধারী ভাষা, কতক আলো কতক অন্ধকার।" এ ভাষায় সন্ধ্যার ম্লান গোধূলি লগ্নের মত এক গভীর রহস্য আছে—কতক স্পষ্ট, কতক অস্পষ্ট, কতক বোঝা যায়, কতক বোঝা যায় না। সুতরাং এ ভাষায় যা প্রকাশ হয় তদপেক্ষা বেশী অস্পষ্টই রয়ে যায়। প্রকাশের মাধ্যমে আমাদের সম্মুখে অপ্রকাশের দিগন্ত বহুদূর উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। এই সন্ধ্যা ভাষাই শ্লেষ অলংকারের উপযুক্ত ক্ষেত্র—কেননা শ্লেষ অলংকারও সন্ধ্যা ভাষার মত লীলাময়ী। একই শব্দ যখন দ্বিবিধ অর্থে প্রযুক্ত হয় তাই শ্লেষ অলংকার হয়ে ওঠে।

চর্যার বহুপদে শ্লেষ অলংকার প্রয়োগ লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে ঃ

সোনে ভরন্তী করুণা নাবী।
রূপা থোই নাহিক ঠাবী ॥....॥ চর্যা—৮নং ॥

এখানে রূপা শব্দটি দ্বিবিধ অর্থে প্রযুক্ত হওয়ায় শ্লেষ অলংকার হয়ে উঠেছে। সমাসোক্তি অলংকারের প্রয়োগ চর্যার বহুস্থানে লক্ষ্য করা যায়। দুজ্ঞেয় নিরাত্মাকে শবরী রূপে কল্পনায়, চঞ্চল চিত্তকে মূষিক রূপে বর্ণনায় সমাসোক্তি অলংকারের সমাবেশ হয়েছে। চর্যার কোন কোন পদে বিরোধ অলংকারও লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। "বলদ বিআইল গবিআঁ বাঝে" (বলদ বিয়াইল গাভী হয় বন্ধ্যা) এবং "যো সো চৌর সোই সাধী" (যে চোর সেই সাধু) ইত্যাদি পদগুলি বিরোধ অলংকারের সার্থক প্রমাণ। অলংকার প্রয়োগে চর্যাকারগণের সুনিপুণ দক্ষতা-প্রসঙ্গে অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী বলেছেন ঃ "ভারত চন্দ্রের অলংকরণ প্রচেষ্টা বাংলা সাহিত্যে সর্বজন প্রশংসিত। কিন্তু প্রাচীনতম বাংলা

ভাষায় চর্যাকারগণের এই অলংকরণ প্রচেষ্টাও কম প্রশংসনীয় নয়,—বরং অধিকতর বিস্ময়কর, দুরূহ ভাষা এবং কঠিন প্রকাশ ভংগীর গণ্ডী অতিক্রম করে চর্যা সাহিত্যের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করলে এ সত্য উপলব্ধি হতে পারবে. ভারত চন্দ্র যেখানে কেবল বিদগ্ধ বাগ্‌জালই বিস্তার করেছেন। সেখানে চর্যাকারগণ অলংকার-সাহায্যে বস্তু-নিষ্ঠ জীবন এবং ব্যক্তিগত জীবনানুভূতিকে সার্থক রূপ-মূর্তি দান করেছেন।"

গ ॥ চর্যার ধ্বনি ঃ কাব্যের সংজ্ঞা নির্ণয়ে কেউ কেউ বলেছেন "ধ্বনিরাত্মা কাব্যস্য" বা বক্রোক্তি জীবিত।" বলাবাহুল্য উভয়বিধ লক্ষণই চর্যায় প্রভূত পরিমাণে বিদ্যমান। ধ্বনিবাদীর মতে যে ছন্দোবদ্ধ কবিতায় বাচ্য অপেক্ষা বাচ্যাতীতই প্রধান হয়ে উঠে, বাচ্যার্থ অপেক্ষা ব্যাঙ্গার্থেরই প্রাধান্য সূচিত হয়—সেই রচনাই আদর্শ কবিতা। চর্যার বহু স্থানেই এই লক্ষণের সুন্দর প্রকাশ ঘটেছে, আমরা পুর্বেই বলেছি নীরস তত্ত্বকথাকে গণচিত্তের কাছে আবেদনশীল করার জন্যে চর্যাকারগণ বহুবিধ রূপকের ব্যবহার করেছেন। এই রূপকের ব্যাখ্যাই তাঁদের কাছে প্রধান নয় রূপকের অন্তরালে ধর্মের গূঢ় তত্ত্বগুলিকে প্রচার করাই তাঁদের মূল লক্ষ্য। সুতরাং চর্যার প্রায় সর্বত্রই রূপক অপেক্ষা রূপকাতীত, বাচ্য অপেক্ষা বাচ্যাতীতের প্রকাশই মুখ্য হয়ে উঠেছে।

ঘ ॥ চর্যার রস ঃ রসবাদীরা কাব্যের সংজ্ঞা দিয়েছেন—"বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম" অর্থাৎ রসাত্মক বাক্যই কাব্য। বলা বাহুল্য এই মানদণ্ডে বিচার করেও চর্যাপদকে কোন প্রকারে কাব্যের দিগন্ত হতে বহিষ্কার করে দেওয়া যায় না। রসের মধ্যে আদি রসই শ্রেষ্ঠ, চর্যার বহু স্থানেই আদিরসের প্রয়োগ লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। একটি উদাহরণ ঃ

দিবসই বহুড়ী কাড়ই ডরে ভাঅ।
রাত্তি ভইলে কামরু জাস ॥ ॥ চর্যা—২নং ॥

অনুবাদ ঃ

দিবসে বধূটি কাঁদে ভয়ে হয়ে ভীত।
রাত্রিতে চলিয়া যায় কামে হয়ে প্রীত ॥

এ প্রসঙ্গে স্বর্গীয় মনীন্দ্রমোহন বসুর মন্তব্য বিশেষরূপে স্মরণ যোগ্য ঃ "উক্তিটি সরস বটে, কিন্তু তত্ত্বন্বেষীগণ এই বধূটির খোঁজ করিতে গলদঘর্ম হবেন। তত্ত্বের মরুভূমিতে কবি বিশেষ নিপুণতার সহিত রসের ধারা প্রবাহিত করেছেন।"

"উঁচা উঁচা পাবত তহিঁ বসই সবরী বালী"....(চর্যা-নং ২৮)

ইত্যাদি কবিতাটির মধ্যেও আদি রসের প্রাবল্য অনুভব করা যায়। কানে কুন্তল, গলায় গুঞ্জার মালা, পরণে বহুবিচিত্র ময়ূর পুচ্ছ ইত্যাদি সাজে সজ্জিতা হয়ে শবরী বালা একাকী পর্বতের শিখরে ভ্রমণ করে, শবর তাকে চিন্‌তে না পেরে পরকীয়া প্রেমের প্রাণোন্মাদিনী তীব্রতা অনুভব করে। পরে বিস্ময় দূর হলে চিরপুরাতন প্রেয়সীর সাথে চির নতুন মিলনে দৃঢ়বদ্ধ হয়। এখানে রসের প্রবল স্ফূরণের দোলায়িত তরঙ্গাঘাতে সকল তত্ত্বকথা কোথায় ভেসে গেছে। প্রেম ব্যাকুল শবরের উন্মত্ত প্রেমাবেগ সঞ্চারী ভাবে পাঠক-চিত্তে সঞ্চারিত হয়ে কাব্য রসে সমস্ত দেহমন আপ্লুত করে দিয়েছে।

সুতরাং অলংকারবাদ, ধ্বনিবাদ, রসবাদ যে দিক হতেই বিচার করা যাক না কেন চর্যাপদকে সার্থক কাব্য বলতে আমরা বাধ্য।

ঙ ॥ চর্যার প্রবচন ঃ এ ছাড়াও চর্যার কয়েকটি পদ প্রবচনের আকার ধারণ করেছে। ভাষা ব্যবহারে অপূর্ব দক্ষতা না থাক্‌লে কখনো ভাব প্রবচনের সৃষ্টি করতে পারেনা। বলাবাহুল্য সে দক্ষতা চর্যাকারগণের ছিল। তাই "অপনা মাংসেঁ হরিণা বৈরী" (আপনার মাংসেয় হরিণ নিজেই নিজের শত্রু), "হাথেরে কাঙ্কণ মা লোউ দাপণ" (হাতের কঙ্কন দেখার জন্যে দর্পণের প্রয়োজন নেই), "সুণ গোহলী কিমো দুঠ বলন্দেঁ" (দুষ্ট গরু হতে শূন্য গোয়াল ভাল) ইত্যাদি পদগুলি সেই প্রাচীন কাল হতেই আপন প্রবাহ ধারা অক্ষুণ্ণ রেখে অতি আধুনিক কালের দ্বার-প্রান্তে এসে উপনীত হয়েছে।

চ ॥ চর্যায় ধাঁধা ঃ বাংলায় প্রচলিত কয়েকটি ধাঁধার সন্ধানও আমরা চর্যাপদের মধ্যে পাই। "বলদ বিআইল গবিআঁ বাঁঝে", "নিতি নিতি

শিআলা সিহে সম যুঝএ। ঢেণ্টণ পাএর গীত বিরলে বুঝএ" ইত্যাদি ছত্রগুলির মধ্যে বাংলা ধাঁধার আদি রূপটি অনুভব করা যায়।

চর্যার সাহিত্যিক মূল্য নির্ণয়ের জন্য আমরা ছন্দ, অলংকার, উপমা, রূপক, রস, ধ্বনি, প্রবচন, ধাঁধা ইত্যাদি বহু বিষয়ের আলোচনা করেছি—কিন্তু এ সবের অতিরিক্ত আছে কবি হৃদয়ের ব্যক্তিগত অনুভূতির নিবিড়তা। এই নিবিড় অনুভূতিব তীব্র বেগই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে প্রকাশিত হযেছে চর্যার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়। এই তীব্র বেগই সকল তার্কিক-তাত্ত্বিকতাকে অতিক্রম কবে চর্যাকে সাহিত্যের দিগন্তে প্রবেশাধিকারের ছাড়পত্র সংগ্রহ কবে দিযেছে। এই অন্তরাবেগই ধর্মের নিরস মরুভূমি হতে চর্যাকে নিয়ে এসেছে সুন্দবের রসলোকে।

॥ দুই ॥

॥ চর্যাপদে সামাজিক চিত্র ॥

(চর্যাপদকে আমবা অজন্তা-ইলোবাব সমগোত্রীয কবেছি। অজন্তাব আবিষ্কাবে যেমন সম্পদশালী ভারতেব আদিম সভ্যতাব সাথে সমাজ জীবনের বিচিত্র ধাবাব সন্ধান আমবা পেযেছি তেমনি চর্যাপদেব আবিষ্কারেও বাংলা সাহিত্যেব আদিমতম সৃষ্টিধাবাব সাথে আমাদেব সম্মুখে উদ্ঘাটিত হয়েছে সমকালীন সমাজ-জীবনেব মর্মালেখ্য। চর্যাপদ প্রাচীন বাংলাব সমাজ-চিত্রব এক বহু-বিচিত্র এ্যালবাম।) সমাজেব অতি খুঁটিনাটি দিকও এ গ্রন্থে সুঅঙ্কিত হযেছে। অবশ্য এই সুঅঙ্কনেব অন্তবালে উপযুক্ত কাবণ বিবাজমান। সাহিত্য সমাজ-জীবনেব প্রতিচ্ছবি। যিনি লেখক তিনি সামাজিক জীব—সুতরাং তাঁব সৃষ্ট কর্মে যে সমাজ-চিত্র অঙ্কিত হবে তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এ সব সাধারণ কাবণ ছাড়াও চর্যাপদে সমাজ-চিত্র-অঙ্কনেব আর এক গভীবতর কারণ বয়েছে। চর্যাকাবগণ আপন ধর্মতত্ত্বকে জন সাধারণের চিত্তে সঞ্চারিত কবে দিতে চেয়েছিলেন এবং সাধাবণ সমাজে আপন ধর্মবোধকে প্রচার কবতে চেয়েছিলেন বলেই তারা

সংস্কৃত সাহিত্যের রাজসিক উপমা রূপকের শান বাঁধান পথ পরিত্যাগ করে নেমে এসেছিলেন ধূলি মাটির পথ বেয়ে লৌকিক জীবনের কেন্দ্র ভূমিতে। 'অন্তর হতে আহরি বচন' নয় এই স্থূল লৌকিক জীবন হতে তাঁরা উপমা রূপক আহরণ করে এক অভিনব বাণী-মূর্তি নির্মাণ করেছেন। এ বাণী-মূর্তির অন্তরালে তাই ধরা পড়েছে লৌকিক সমাজ জীবনের অভিনব রূপ।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী হতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের সময়ে আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি বাংলা দেশের অভ্যন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হতে থাকে। বাংলা দেশ তখন অনার্য জাতিরই প্রায় একচেটিয়া আবাস-ভূমি হয়ে উঠেছিল। অনার্য জাতির মধ্যে কোল, শবর, রাজবংশী, দুলে, বাগদী, বাউড়ী ইত্যাদি ছিল প্রধান—এবং প্রাচীন সমাজ এদের ছিল গুরুত্বপূর্ণ স্থান। চর্যাপদের মধ্যে নানা ভাবে বার বার এই আদিমজাতি সমূহের কথা উল্লিখিত হয়েছে। এদের সমাজ জীবনের কথা, এদের ধর্মপালনের কথা, এদের বিবাহ ইত্যাদির বর্ণনা—চর্যায় সুন্দর রূপে বর্ণিত হয়েছে। আর্য জাতির কথা বাদ দিয়ে অনার্য জাতির কথা এই ভাবে বার বার উল্লিখিত হওয়ায় মনে হয় তখনো বাংলা দেশে সর্বভারতীয় আর্য সংস্কৃতি প্রাধান্য লাভ করতে পারেনি। গ্রামীন জীবনে তখনো আদিম জাতি সমূহের প্রতিপত্তিই প্রধান হয়েছিল।

বাংলা ভাষার প্রাচীনতম সৃষ্টি চর্যায় যে সমাজ চিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎলাভ করি—যদি ধৃষ্টতা না হয় তা হলে বলা চলে—লৌকিক জীবনের তেমন নিখুঁত চিত্র সমগ্র মধ্যযুগীয় সাহিত্যের কোথাও নেই। মধ্যযুগের সাহিত্যে আমরা পেয়েছি দেবদেবীর চিত্র, ধনিক সম্প্রদায়ের কেলি বিলাস এবং মধ্যে মাঝে লৌকিক জীবনের রূপায়ণ কিন্তু চর্যাপদে যে চিত্র পাই তা কোন দেব দেবীর নয়, কোন রাজা উজিরেরও নয়, একেবারে নিখুঁত লোক জীবনের। আদিম জাতির প্রাত্যহিক জীবন যাত্রার আচার অনুষ্ঠানে প্রতিটি চিত্রই উজ্জ্বল। লৌকিক সমাজের যে দৈনন্দিন পারিবারিক চিত্র চর্যায় প্রতিবিম্বিত হয়েছে তা হতে জানা যায় সমাজের অধিকাংশ লোকই ছিল শ্রমশীল এবং মেহনতী। কিন্তু

মেহনতী জনগণের ভাগ্যে যে অভিশাপ আজও বিদ্যমান সেই দারিদ্র্য, দুঃখ সেদিনও ছিল তাদের একমাত্র প্রাপ্য। শবর পাদের উঁচা "উঁচা পাবত" (২৮) চর্যাটিতে তৎকালীন আদিবাসীদের পারিবারিক জীবনের একটি সুন্দর চিত্র ফুটে উঠেছে। পাহাড়ের উপরে উচু টিলায় শবর শবরী বাস করে, শবরী বালা গলায় পরিধান করে গুঞ্জারের মালা এবং কানে পরে কুণ্ডল। একখানি পর্ণকুটীর তাদের সম্বল। নিকটেই কাগ্‌নীর খেত, কঞ্চির বেড়া দিয়ে ঘেরা। কাগ্‌নী ধান পেকে উঠলে উৎসবের আনন্দ কোলাহলে সমগ্র পল্লী মুখর হয়ে ওঠে। চাটিল পাদেব একটি চর্যায় (৫) গাছ কেটে পাটা জুড়ে সাঁকো নির্মানের কথা বর্ণিত হয়েছে।

ফাডিঅ মোহতরু পাটী জোডিঅ।
অদয় দিঢ় টাঙ্গী নিবাণে কোরিঅ।

বিরুবা পদেব (৩) চর্যায় মদ তৈবীর উল্লেখ আছে। কহ্নুপাদেব "নগব বাহিবিবে ডোম্বি তোহোবি কুড়িয়া" (১০) চর্যাটি তৎকালীন সমাজ জীবনের একটি সুন্দব আলেখ্য। চর্যাকাবগণ যে পরধর্ম বিদ্বেষী ছিলেন —অন্ততঃ বিদ্বেষী না হোক নিন্দা করতেন—তা' এই পদটি হতে জানা যায়। বেদ পুরাণ দার্শনিকতা এবং আনুষ্ঠানিক ধমচাবণের নিন্দায় চর্যাকারগণ পঞ্চমুখ। এই পদটিব "বাহ্মণ নাড়িআ" অর্থাৎ নেড়ে ব্রাহ্মণ সিদ্ধাচার্যগণেব আক্রোশজাত বক্রোক্তির সুস্পষ্ট প্রমাণ। এই পরধর্ম বিদ্বেষ বা নিন্দা ছাড়াও ডোম জাতির বৃত্তির প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। তাঁত নির্মান, চ্যাঙাড়ী বোনা এবং নৌকা বাওয়া ছিল তাদেব অন্যতম বৃত্তি। কাপালিকেরা হাড়ের মালা পরতো এবং নগ্ন থাকতো— এছাড়া তাদের অন্যতম বৃত্তি নট-ব্যবসায়ের উল্লেখও এ চর্যায় আছে ঃ

তান্তি বিকণঅ ডোম্বি অবরণা চাংগেড়া।
তোহোর অন্তরে ছাড়ি নড়-পেড়া॥

ডোমেরা ছিল সাধারণ নাগরিকের কাছে ঘৃণার পাত্র—তাই নগরের মধ্যে তাদের বাস নিষিদ্ধ ছিল। তারা বসবাস করতো নগরের উপকণ্ঠে

নাগরিক পরিবেশ হতে দূরে। কাহ্নুপাদের "ভনির্বাণে পড়হ মাদলা" (১৯নং) চর্যাটির মধ্যে পাই ডোম বিবাহের পুর্ণাঙ্গ চিত্র। বিবাহের সময় প্রয়োজন হয় দুন্দুভি, ঢাক ঢোলের বাজনা। বাদ্য-যন্ত্রের তুমুল বাদ্যে পৃথ উতরোল করতে করতে বিবাহ করতে যায় ডোম এবং বিবাহান্তে নববধুর সাথে রাত্রি যাপন করে। ডোমের বিবাহেও যে যৌতুকের প্রয়োজন হতো এ চর্যাটি তারই প্রমাণ বাহী।

ডোম্বী বিবাহিআ অহারিউ জাম।
জউতুকে কিঅ আণুতু ধাম॥

চর্যায় একদল যাযাবর শ্রেণীর কথা বার বার উল্লিখিত হয়েছে। এই যাযাবর শ্রেণীর লোকেরা কখনো নৌকাযোগে, কখনো পদব্রজে গ্রাম-গ্রামান্তরে বেড়াত। নাচগান দেখিয়ে এবং ঔষধ বিক্রি করে তারা জীবিকা নির্বাহ করতো। এই যাযাবর শ্রেণীর ধ্বংসাবশেষ হলো বর্তমানের বেদের দল।

স্ত্রী পুরুষের মেলামেশার অবাধ অধিকার ছিল। 'সাপুড়ী'র সাথে ডোম্বীর সম্মিলিত নৃত্যের তালে যে ছবি ফুটেছে তাতে রক্ষণশীলতার কোন পরিচয় নেই—আছে সমকালীন সমাজ-জীবনের উলঙ্গ বাস্তবালেখ্য।

বাংলা দেশ নদীমাতৃক। বাংলা সাহিত্যে নদীর হয়েছে তাই অবাধ সঞ্চার। মধ্যযুগের সমগ্র সৃষ্টিতে নদীর কথা বার বার বিভিন্ন ভাবে উল্লিখিত হয়েছে। চর্যাপদেও এই নদীর চিত্র বহুবার অঙ্কিত হয়েছে। নদীর প্রসঙ্গেই এসেছে নৌকার কথা, দ্রুত দাঁড় ফেলে পাল তুলে নৌকা বাওয়ার কথা। নৌকায় নদী পার হতে পাড়ানী লাগতো এবং কড়ি নেই-বল্‌লেও যে যাত্রীদের নিস্তার ছিলনা তার ইংগিত পাওয়া যায় ডোম্বীপাদের "গঙ্গা জউনা মাঝাঁরে বহুই নাঈ" চর্যাটিতে। শান্তিপাদের "তুলা ধুণি ধুণি আঁসুরে আঁসু" চর্যাটিতে (২৬নং) তুলা ধোনার কথা বর্ণিত হয়েছে। ধামপাদের চর্যায় (৪৭নং) পাই ঘরে আগুন লাগার কথা। বীণাপাদের চর্যাটিতে (১৭নং) বীণার তানে কণ্ঠ মিলিয়ে গান করা এবং তালে তালে নৃত্যের বর্ণনা ফুটে উঠেছে। শ্বশুর (সসুরা),

শাশুড়ী-ননদ (সাসু-ননদ), বউ (বউড়ী) এবং প্রতিবেশীদের (পড়িবেষী) নিয়ে গৃহস্থেরা শান্তিতে একত্রে বসবাস করতো। কিন্তু এই শান্তি যে বার মাস তাদের ভাগ্যে জুট্‌তো না তার প্রমাণ নিহিত রয়েছে "হাঁড়িতে ভাত নাই" চর্যাটিতে। এর থেকে অনুমান করা যায় তৎকালীন অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থা ছিল অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের। কিন্তু এর পাশেই আবার শবরপাদের ৫০নং চর্যায় অঙ্কিত হয়েছে ধনীর গৃহসজ্জার চিত্র। একটি চর্যায় বিছানাপাতা খাটে শয়ন করে বিলাসীর পান (তাবোল) কর্পূর (কাপুর) দিয়ে খাওয়ার কথা উল্লিখিত হয়েছে। পথে প্রান্তরে এবং জলযাত্রায় ছিল দস্যুর ভয়। ভুসুকুপাদের একটি চর্যায় (৪৯নং) নৌ সৈন্য অথবা জলদস্যু কর্তৃক বাংলাদেশ লুণ্ঠনের ইংগিত রয়েছে। চোর ধরার জন্যে দারোগা (দুষাধী) ছিল এমন কি থানা বা কাছারীরও (উথারী) উল্লেখ পাওয়া যায়। বিভিন্ন উপায়ে আপন জীবিকা অর্জন করতো। ডোম এবং যাযাবর শ্রেণীর কথা আমরা পুর্বেই পেয়েছি। কৈবর্তরা মাছ ধরতো। ধুনুরীরা ধুনতো তূলা। ছুতোর মিস্ত্রীদের কাজের কথাও কিছু উল্লিখিত হয়েছে চর্যায়। ধার্মিক লোকেরা আগম-পুঁথি পড়তো, কোশাকুশি নিয়ে পূজো করতো—মালা জপ করাও ছিল তাদের আর একটি উদ্বৃত্ত কাজ। বিদ্বান ব্যক্তিদের যে বিশেষ কদর ছিল চর্যায় তারও ইংগিত রয়েছে। এমনি করে চর্যার সর্বত্র সাধারণ বাঙ্গালীর জীবন-চিত্র সুন্দর হয়ে ফুটেছে অবশ্য ধনী-সমাজের চিত্র যে একেবারেই নেই তা নয়—তবে বিত্তশালী লোক-জীবনের যে চিত্র পাই তা সাধারণ মানুষের জীবন-চিত্রনের তুলনায় ভগ্নাংশ মাত্র। ধনীর গৃহে নিত্য উপাসনা হতো, দেববিগ্রহের নামেরও উল্লেখ আছে। চোর ডাকাতদের দ্বারা আকস্মিক গৃহ লুণ্ঠিত হলে নিঃস্ব হৃদয়ের বেদনা যে তীব্র হতো তার ইংগীত পাওয়া যায় একটি চর্যায়।

আমরা প্রথমেই উল্লেখ করেছি চর্যাকারগণ আপন ধর্মের মাহাত্ম্যকে জনচিত্তের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিতে চেয়েছিলেন। এই চর্যা-সাধকেরা একদিকে যেমন ছিলেন উচ্চস্তরের ধর্ম-সাধক তেমনি অন্যদিকে ছিলেন তৎকালীন সামাজিক জীবন-যাত্রার সাথে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত। এই

নিবিড় পরিচয়ের ফলেই নীরস ধর্মতত্ত্বের মাঝেও সামাজিক জীবন-চিত্র বার বার বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন রস-মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। সমাজের সাথে চর্যাকারগণের এই ঘনিষ্ঠ পরিচয় এবং সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি ছিল বলেই চর্যায় অঙ্কিত হাজার বছরের পুরোণো সমাজ চিত্র আজও অম্লান হয়ে রয়েছে।

॥ তিন ॥

॥ পরবর্তী বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে চর্যার প্রভাব ॥

চর্যাপদ প্রাচীন বাংলা ভাষার প্রাচীনতম সৃষ্টি। কিন্তু প্রাচীন ভাষায় প্রাচীনতম সৃষ্টি হলেও এই গ্রন্থটির মধ্যে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভাষা, ছন্দ ও কাব্য রীতির অনেক উপকরণই বিদ্যমান। বস্তুতঃ চর্যাপদগুলি আধুনিক বাংলা ভাষার অমার্জিত সংস্করণ। অমার্জিত কিন্তু সকল কিছুই বীজাকারে নিহিত। অপভ্রংশের পরবর্তী স্তরে প্রাচীন বাংলা ভাষার জন্ম। অপভ্রংশ হতে ক্রমশঃ পরিবর্তিত হয়ে বাংলা ভাষা বহুকাল কথ্য ভাষা রূপেই ব্যবহৃত হয়ে এসেছিল—পরে তা সাহিত্যিক ভাষায় উন্নীত হয়। বাংলা ভাষা যখন অভিজাত রূপ পরিগ্রহ করে' সাহিত্যিক ভাষায় উন্নীত হয়—সেই আভিজাত্য গর্বী ভাষা দিয়েই রচিত হয় চর্যাপদ। সুতরাং চর্যাপদ হলো বাংলা ভাষার সাহিত্যিক রূপের প্রাচীনতম নিদর্শন।

প্রাকৃত অপেক্ষা তৎসম শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায় চর্যায়। যেমন ঃ পঙ্ক, চঞ্চল, মাতঙ্গী ইত্যাদি। আধুনিক বাংলা ভাষায় যে তৎসম শব্দের বহুল প্রয়োগ লক্ষিত হয় এই চর্যাপদ হতেই তার সূত্রপাত।

ধ্বনিতত্ত্বের দিক দিয়েও চর্যা আধুনিক বাংলা ভাষাকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছে। বাংলায় অনেক সময় 'অ-কার' 'ও-কার'-এর মত উচ্চারিত হয়—যেমন ঃ ভালো, করো প্রভৃতি। চর্যাপদ হতেই এই উচ্চারণ-বিশিষ্টতার সূত্রপাত। চর্যাপদে আমরা কৃত স্থলে পাই কিউ, গত স্থলে পাই গউ। 'অ' প্রথমতঃ 'ও' এবং পরে 'উ'তে পরিণত

হয়েছে। চর্যায় হ্রস্ব ও দীর্ঘ উভয় স্বরই অবিচারিত ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে—যথা : পঞ্চ এবং পাঞ্চ। আধুনিক বাংলাতেও এই হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বরের উচ্চারণের বিভিন্নতা রক্ষিত হয় না, সে জন্যই আমরা উচ্চারণের দ্বারা বিভিন্নতা প্রতিপাদন না করে (হ্রস্ব) ই, (দীর্ঘ) ঈ প্রভৃতি পাঠ করে থাকি।

ত-বর্গ ও ট-বর্গের অন্তর্গত বর্ণ হতে বাংলায় ড় ও ঢ় এর উদ্ভব হয়েছে —যথা : পততি বা পঠতি হ'তে পড়ে। গঠতি হতে গড়ে। দুই বর্গের মাঝে এই যে নতুন বর্ণের উদ্ভব এ হল বর্ণের অত্যাধুনিক পরিণতি। কিন্তু এই পরিবর্তনের আভাস পাই চর্যার মধ্যে। যথা : কেডুআল হতে কেড়ুআল। বাংলায় বিভিন্ন জ, ন, ব এবং স এর উচ্চারণে বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয় না—এ হল বাংলার নিজস্ব বিশিষ্টতা। আমরা এখন এই বিভিন্নতা স্পষ্ট করার জন্যে (তালব্য) শ, (মুর্দ্ধণ্য) ষ, (দন্ত্য) স ইত্যাদি পাঠ করে থাকি। চর্যার আদশ পুথি লিখিত হওয়ার কালে এই উচ্চারণ বিভিন্নতা লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। যথা : মন (চর্যা-২০) কিন্তু এই মণ (চযা-৩০)। ৫০নং একটি চযাব মধ্যেই লিখিত হয়েছে শবর, যবরালী এবং সবর।

আধুনিক বাংলা ভাষায় কোন কোন কারকে সাধারণতঃ একবচনে কোনই বিভক্তি ব্যবহৃত হয় না। যথা : রাম খাইতেছে, ভাত দাও ইত্যাদি। এক-হাজার বছর পুর্বে রচিত চর্যা হতেই বোধ হয় এর সূত্রপাত। কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হল :

কর্ত্তৃ কারকে : কাআ তরুবর পঞ্চ বিডাল।

কর্ম কারকে : দিঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমাণ।

করণ কারকে : বাঢ়ই সো তরু সুভাসুভ পানী।

বাংলায় যেমন বহুবচন বোঝাবার জন্যে বহুত্ব বোধক শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে—যথা : গাছগুলি, পাখীসব ইত্যাদি—সেরূপ দৃষ্টান্ত চর্যাতেও পাওয়া যায়; যথা : সঅল সমাহিঅ, মণ্ডল ইত্যাদি। কখনো কখনো সংখ্যা দ্বারাও বহুবচন বুঝান হয়েছে। যথা : দুই ঘরে, পঞ্চ ডাল ইত্যাদি। তবে এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয় বিষয় এই আধুনিক বাংলায় বহুত্ব

বোধক 'রা' বা 'এরা' চর্যাতে নেই। সমান সবর্ণে দীর্ঘ হয়, এই সূত্রানুযায়ী গঠিত সমস্ত পদের দৃষ্টান্ত চর্যাতেও লক্ষ্য করা যায়—যথা ঃ অজরামর, ভাবাভাব ইত্যাদি। আধুনিক বাংলার ন্যায় প্রায় সর্ববিধ সমাসের দৃষ্টান্তও চর্যায় পাওয়া যায় ঃ কমল রস (তৎপুরুষ), মহাসুহ (কর্মধারয়) ভবজলধি (রূ.ক), বামদাহিণ (দ্বন্দ্ব), অপরবিভাগ (বহুব্রীহি) ইত্যাদি।

আধুনিক বাংলা এবং সংস্কৃতের ন্যায় য-শ্রুতি ও ব শ্রুতি চর্যায় পরিলক্ষিত হয়—যেমন ঃ নিকটে = নিয়ড়ী (নিয়ড়), আয়াতি – আবয়ি (আঅই)।

ভবিষ্যৎকাল বুঝাতে চর্যায় 'ইব' প্রত্যয় হতো—যেমন ঃ করিব নিবাস, তুম্হে জাইবে। এই 'ইব' প্রত্যয় আধুনিক বাংলায় ভবিষ্যৎকাল বোঝাতে ব্যবহৃত হচ্ছে।

ব্যাকরণগত উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য ছাড়াও চর্যাগীতিতে এমন কতকগুলি প্রয়োগ পাওয়া যায় যেগুলি বাংলা ছাড়া অন্য কোথাও দেখা যায় না। যেমন ঃ থির করি (স্থির করে), শুনিয়া লেহুঁ (শুনে নিই); দুহিল দুধু (দোহা দুধ) ইত্যাদি

বাংলা সাহিত্যেব চর্যার প্রভাবের জন্য পূর্ববর্তী অধ্যায়ের "চর্যার সাহিত্যিক মূল্য" দ্রষ্টব্য।

॥ চার ॥

॥ চর্যার ধর্মমত বা দার্শনিকতা ॥

বৌদ্ধ সহজিয়া সাধক সম্প্রদায়ের ধর্মসাধনার নিগূঢ় সংকেত-বাণী বহন করে আমাদের নিকট চর্যাপদগুলির আত্মপ্রকাশ। চর্যাপদে ইসারা-ইংগিতে আভাসিত হয়েছে সহজিয়া সম্প্রদায়ের ধর্মসাধনার গুহ্য তত্ত্ব কথা। কিন্তু এই তত্ত্ব কথার গহন-গভীরে প্রবেশ করার আগে আমরা সহজিয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভবের ইতিহাসটি জেনে নিতে চেষ্টা করবো।

বৌদ্ধ ধর্মের চরম লক্ষ্য ভবজন্ম হতে মুক্তিলাভ করে নির্বাণ প্রাপ্ত

হওয়া। এই নির্বাণ লাভ বা ভবচক্র হতে মুক্তি প্রাপ্তির উপায়কে কেন্দ্র করেই বৌদ্ধ দার্শনিক মতবাদ প্রতিষ্ঠিত। জীব মাত্রকেই বার বার চক্রক্রমে ভবচক্রের আবর্তনে ঘুরে অসংখ্য দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে হচ্ছে। এই বেদনা-ব্যথার, দারিদ্র্য-দুঃখের দাবদাহ হতে নিজেকে মুক্ত করার অর্থই হলো ভবচক্র (whirl of existence) হতে নিজেকে ছিন্ন করা। কিন্তু এই ভবচক্র হতে নিজেকে ছিন্ন করার উপায় কী ? বৌদ্ধ দার্শনিকগণ বলেছেন মানুষের অন্তরে হয় 'অবিদ্যা'র জন্ম—এই অবিদ্যাই তাকে বার বার ভবচক্রের নির্মম গতিশীলতার মাঝে টেনে আনে। সুতরাং ভবচক্র হতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে পরম লভ্য নির্বাণ পেতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন নির্বাণ পথের পরম এবং প্রধান শত্রু অবিদ্যাকে দূর করা। অবিদ্যার প্রতি মানুষের আর কোন আকর্ষণ না থাকলে নির্বাণ লাভ সহজ হয়ে উঠে। কিন্তু এই অবিদ্যা দূর করা যায় কী দিয়ে ? বৌদ্ধ-দার্শনিকগণের মতে এই অবিদ্যা দূর করার জন্যে প্রয়োজন শূন্যতা জ্ঞানের। বৌদ্ধ ধর্মের দুই প্রধান মতবাদী দল হীনযান ও মহাযান উভয়ই এই শূন্যতাবাদকে গ্রহণ করেছেন।

বৌদ্ধ ধর্মের প্রাচীনতম রূপ নিয়ে হীনযান গঠিত এবং পরবর্তীকালে যে মতবাদ গড়ে উঠে তা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মহাযান। ধর্মমতের দিক দিয়ে হীনযানী মতবাদ রক্ষণশীল এবং সংকীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ। হীনযানী মতাবলম্বীদের কাছে ব্যক্তিগত মুক্তির আকাঙ্ক্ষাই চরম। এই মুক্তি লাভের পথও ছিল দুর্গম—কঠিন নৈতিক আদর্শ ও দুরূহ সাধন-পন্থায় এই মতে নির্বাণ লাভ ছিল প্রায় প্রাণান্ত ব্যাপার। হীনযানীদের সাধন-পন্থায় চারটি স্তর—স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী এবং অর্হৎ। শূন্যতা জ্ঞানের দ্বারা প্রণোদিত হয়ে জগৎ ও জীবনের পশ্চাতে কোন সত্য নেই জেনে অবিদ্যার ধ্বংস সাধন করে অর্হত্ব লাভই হল এই মতবাদের চরম লক্ষ্য। এই মতবাদের পিছনে নিয়ম-নীতির প্রচণ্ড শাসন থাকায় এবং সর্বোপরি সংকীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকায় জনসাধারণ এই মতবাদের ওপর হতে আস্থা হারাতে থাকে। ফলে উদ্ভব হয় মহাযান মতবাদের। মহাযানীদের দৃষ্টি ভংগীর

উদারতা এবং এক বিশ্বপ্রসারী মনোভাব এই মতবাদের পরিপুষ্টির অন্তরালে বেগ সঞ্চার করেছে। কেবল ব্যক্তিগত মুক্তিই তাঁদের কাম্য নয়—ব্যক্তিগত মুক্তির সাথে তাঁরা চেয়েছেন নিখিল বিশ্ব-মানবের দুঃখ-মুক্তি। ফলে শূন্যতা জ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যার ধ্বংস সাধনে কেবল মাত্র অর্হৎত্ব লাভই তাঁদের লক্ষ্য হয়ে ওঠেনি—তাঁদের সমগ্র ধ্যান-সাধনা কেন্দ্রীভূত হয়েছে শূন্যতাজ্ঞানের সাথে করুণার সংমিশ্রণে বোধিচিত্ত লাভের ওপর। এই করুণার স্বরূপ কী? করুণা হলো ভবচক্রে বেদনা-লাঞ্ছিত নিখিল বিশ্বের অসংখ্য মানবের জন্য অপরিসীম বেদনা-বোধ। সুতরাং বোধিচিত্ত হল শূন্যতা-জ্ঞানের সাথে বিশ্ব-মানবের জন্য অপরিসীম করুণা বোধে নতুন চেতনায় আলোকোদ্ভাসিত চিত্ত—শূন্যতা ও করুণার সমান্বিত রূপ। সুতরাং মহাযানী মতবাদের প্রভাবে বৌদ্ধধর্ম ও সমাজ হতে নৈতিক-নৈষ্টিকতার কড়াকড়ি এবং সংকীর্ণতা দূর হলো আর হীনযানীদের শূন্যতাময় 'নেতিবাচক' (negative conception) নির্বাণ করুণার সংমিশ্রণে বোধিচিত্তের মধ্যে একটি 'ইতি বাচক' (posative conception) রূপলাভ করলো। 'উদার নীতির পটভূমিতে প্রতিষ্ঠিত মহাযান যখন তার 'মহাযান' নিয়ে মানুষের দ্বার প্রান্তে আবির্ভূত হল তখন সর্বদলের সর্বশ্রেণীর মানুষ মুক্তিলাভের আশায় সেখানে প্রবেশ করলো।' ফলে অল্পদিনের মধ্যে এই মতবাদ বাংলার লোক-সমাজের কাছে ব্যাপক প্রিয় হয়ে উঠ্‌লো। সর্বশ্রেণীর লোক মহাযানের অন্তর্গত হওয়ায় বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর লৌকিক মতবাদ এবং আচার অনুষ্ঠানও এই মহাযান মতবাদে অনুপ্রবিষ্ট হতে লাগলো। নিয়ম বন্ধনের শিথিলতার জন্য একদিকে যেমন মহাযান ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে পড়েছিল তেমনি বিভিন্ন লৌকিক আচার অনুষ্ঠানের ক্রম প্রচলনে মহাযানের ধর্মমতের বিবর্তন অনিবার্য হয়ে উঠলো। এই অনিবার্যতার ফলস্বরূপ মুল মহাযান ভেঙে মন্ত্রযান, বজ্রযান, সহজযান ইত্যাদি রূপে আত্মপ্রকাশ করলো। কিন্তু ডক্টর শশিভূষণ দাসগুপ্তের মতে সহজযান নামে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের উল্লেখ বৌদ্ধ তন্ত্রাদিতে নেই।

তিনি বলেন বজ্রযান-পন্থী একদল সাধকের কতকগুলি মত-বৈশিষ্ট্য ও সাধন বৈশিষ্ট্য দিয়ে এই নামটি পরবর্তীকালে গড়ে উঠে। বজ্রযান মতবাদের পত্তন হয় 'মন্ত্র', 'মুদ্রা' ও 'মণ্ডল' ইত্যাদি নিয়ে তান্ত্রিকাশ্রয়ী রূপে। এছাড়াও বজ্রযানে ছিল বিবিধ দেবদেবীর পুজা অর্চ্চনা এবং তান্ত্রিক পদ্ধতির কতকগুলি গুহ্য যোগ-সাধনা।

সহজযান মূল মহাযান থেকেই উৎপন্ন হোক কিংবা বজ্রযান থেকেই আসুক এখন সহজযানের সাধনপদ্ধতি ও ক্রিয়া কলাপের দিকে আমাদের বিশেষ ভাবে লক্ষ্য দিতে হবে। চর্যাপদের প্রতিটি চর্যা এই সহজিয়াদের ধ্যান-ধারণার অনুলিখন।

সহজযানের মতবাদ নিয়ে আলোচনাব প্রারম্ভেই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে এই সহজযান নামের অন্তরালে এই মতবাদের কোন প্রচ্ছন্ন ইংগিত আছে কি না। শ্রদ্ধেয় শশিভূষণ দাসগুপ্তেব মতে "এই সম্প্রদায়ের সাধকগণকে সহজিয়া বলিবাব দুইদিক্ হইতে সার্থকতা রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। প্রথমতঃ ইহাদের 'সাধ্য'-ও ছিল সহজ আবার 'সাধনা'ও ছিল সহজ, প্রত্যেক জীবনের প্রত্যেক বস্তুরই একটি সহজ স্বরূপ আছে—ইহাই তাহার সকল পরিবর্ত্তনশীলতাব ভিতরে অপবিবর্ত্তিত স্বরূপ। এই সহজ স্বরূপকে উপলব্ধি করিয়া মহাসুখে মগ্ন হইতে হইবে—ইহাই হইল এই পন্থী সাধকগণেব মূল আদর্শ—এই জন্যই ইঁহারা হইলেন সহজিয়া। দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা সাধনার জন্য কোনও বক্রপথ অবলম্বন করিতেন না—গ্রহণ করিতেন সরল সোজা পথ এই জন্যও তাঁহারা সহজিয়া।" সহজিয়াগণ সর্বদা আপন সাধন-পদ্ধতিকে সোজা পথ বলেছেন। সিদ্ধাচার্যেব একটি চর্যায় আছে ঃ

উজুরে উজু ছাড়ি মা জাহুরে বঙ্ক।
নিয়ড়ি বোহি মা জাহুরে লঙ্ক॥

'এপথ সোজা (ঋজু), সোজা পথ ছেড়ে বাঁকা পথে যেওনা ; বোধি নিকটেই আছে (দূর) লঙ্কায় যাওয়ার (প্রয়োজন) নেই।'

সহজিয়াগণ যে বার বার বাঁকা পথ ছেড়ে সোজা পথে যেতে বলেছেন

সেই বাঁকা পথ কী এবং সেটা ছাড়ারই বা প্রয়োজন কেন? উত্তর চর্যাকারগণই দিয়েছেন। তাঁদের মতে 'শাস্ত্র-তর্ক-পাণ্ডিত্যের পথ, ধ্যান ধারণা সমাধির পথ বিবিধ তন্ত্র-মন্ত্র আচার পদ্ধতির পথই হলো বাঁধা পথ।' এবং পাণ্ডিত্যের অভিমান নিয়ে পথ চল্‌লে মুক্তি বা সহজানন্দ পাওয়া সম্ভব নয় বলে তা ত্যাজ্য। পাকা বেলের গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে অলি যেমন কেবল তার চার পাশে ঘুরে সারা হয়—ভিতরে প্রবেশ করে সার গ্রহণ করতে পারে না তেমনি পাণ্ডিত্য-গর্বী মানুষেরা 'মহাসুখ'-এর চার পাশে পাণ্ডিত্যের অভিমানে মত্ত হয়ে ঘুরে মরেন—মুক্তির স্বাদ পাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। 'সহজানন্দ' বা মহাসুখ বুদ্ধি গ্রাহ্য নয়—পুরোপুরি অনুভূতি সাপেক্ষ। সুতরাং বুদ্ধি-শাসিত পাণ্ডিত্যে তাকে পাওয়া অসম্ভব। বাক্য-মনের অগোচর যে সহাজানন্দ, যাকে বোঝা যায় না—কেবল আভাস-ইংগিতে একটুখানি অনুভব করা যায় মাত্র বাহ্যাড়ম্বরযুক্ত ক্রিয়াকাণ্ড বা বুদ্ধি-দীপ্ত পাণ্ডিত্যের দ্বারা তাকে কোন মতেই পাওয়া যায় না—তাকে পেতে হলে গুরুর উপদেশ গ্রহণ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। চর্যাকারগণ বার বার তাই গুরুর উপদেশ গ্রহণ করতে উপদেশ দিয়েছেন। গুরুর নির্দ্দেশিত পথে পদচারণা করলে নির্বাণ তথা সহজানন্দ তথা মহাসুখলাভ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

নির্বাণ, অদ্বয়, সহজানন্দ, মহাসুখ ইত্যাদি শব্দগুলির মধ্যে একটি গভীর যোগসূত্র আছে—আসলে সবই এক। 'হৃদয়ের মধ্যে রয়েছে যে রাগের আগুন, যে দ্বেষের আগুন, যে মোহের আগুন—সেই আগুন নির্বাপিত হলে আসে যথার্থ নির্বাণ।' এবং এই নির্বাণই হলো পরম সুখের বা মহাসুখের। ধর্মপদের বহুস্থানে উল্লিখিত হয়েছে নির্ব্বাণং পরমং সুখং। অদ্বয় হল আমাদের দেহাভ্যন্তরালবর্ত্তী আদি-অন্ত-রহিত শাশ্বত সহজ সত্তা। এই সহজ সত্তার সাথে মিলনেই হয় সহজানন্দ এবং সহজানন্দেই নির্বাণ এবং নির্বাণেই মহাসুখ। 'এই সহজানন্দ বা স্বরূপানুভূতির ক্ষেত্রে কোন 'জ্ঞাতৃত্ব-জ্ঞেয়ত্ব' বা 'গ্রাহকত্ব-গ্রাহ্যত্ব' থাকে না। গ্রাহ্যত্ব-গ্রাহকত্ব রহিত যে স্বরূপ তা-ই হলো অদ্বয় স্বরূপ,

অদ্বয়ই হলো সহজ, সহজই হলো মহাসুখ। সুতরাং সহজিয়াগণের নিকট অদ্বয় লাভ, মহাসুখ প্রাপ্তি, সহজে প্রতিষ্ঠা কিংবা বোধিচিত্ত লাভ এ সকল একই কথা। আমরা পুর্বেই লক্ষ্য করেছি সহজিয়াগণের নিকট বোধিচিত্ত লাভই পরম লক্ষ্য, এই বোধিচিত্ত লাভ হয় শূন্যতা ও করুণার অভিন্নতার দ্বারা। এখন এই শূন্যতা ও করুণার অভিন্নতার অর্থ কী? এই উভয়ের মধ্যকার তাৎপর্যের দিকে গভীরভাবে লক্ষ্য বাখলে সহজিয়াগণেব দার্শনিক তত্ত্ব ধর্মতত্ত্ব বা সাধনতত্ত্ব সকল কিছুই আমাদের নিকট সুপরিস্ফুট হয়ে উঠ্‌বে। সুতরাং সকল জটিল তত্ত্ব কথা বুঝতে হলে এই শূন্যতা ও করুণার প্রতি আমাদের বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ বাখতে হবে। এখন আমবা শূন্যতা ও করুণাব অভিন্নতাব মূলে যে বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য নিহিত আছে সেগুলি পবিস্ফুট কবাব চেষ্টা কববো। ধর্মমতেব পক্ষ অবলম্বন কবে বলা যায় যে শূন্যতাব দ্বাবা নির্বাণ অর্থাৎ বৃহত্তব সমাজ হতে বিচ্যুত হয়ে কেবল মাত্র একক ভাবে মুক্তিব চেষ্টা না কবে করুণাব সংমিশ্রণে বিশ্বমানবেব মঙ্গলেব জন্য বৃহত্তব পথে পদচাবণার সাধনাই হলো বোধিচিত্ত লাভেব সাধনা। এই শূন্যতাকে বলা হয় প্রজ্ঞা বা জ্ঞাত বা গ্রাহক বা Principle ot subjectivity এবং করুণাকে বলা হয় উপায় বা জ্ঞেয় বা গ্রাহ্য বা Principle of objectivity। এই গ্রাহক-গ্রাহকত্ব বা জ্ঞেয় জ্ঞাতৃত্বের দুই প্রবহমান ধাবা সম্মিলিত হযে যে অদ্বযতত্ত্ব লাভ হয তাই বোধিচিত্ত, তাই সহজানন্দ, তাই মহানন্দ, তাই নির্বাণ, তাই সব। ধর্মমতেব দিক হতে শূন্যতা ও করুণাব সম্মিলনেব তাৎপর্য ব্যাখ্যা কবা হলো এবার আমরা যোগ সাধনার দিক হতে এর মধ্যকার তাৎপর্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবো।

॥ পাঁচ ॥

॥ চর্যার যোগ-সাধন-তত্ত্ব ॥

যোগ সাধনাব দিক হতে সহজিয়াগণ আমাদের দেহের মধ্যে প্রধান তিনটি নাড়ীর কথা বলেছেন। একটি বাম নাসারন্ধ্র হতে নির্গত হয়েছে নাম বামগা। দ্বিতীয়টি দক্ষিণ নাসারন্ধ্র হতে নির্গত হয়েছে নাম দক্ষিণগা। এই বামগা এবং দক্ষিণগা নাড়ী দুটি ছাড়া আরো একটি নাড়ী আছে যার নাম মধ্যগা। এখন বৌদ্ধ তন্ত্র শাস্ত্রে এবং চর্যায় এই নাড়ীগুলির বহুবিধ নাম আছে—সকল সন্দেহ এড়াবার জন্যে আমবা সর্বপ্রথমে এই নাড়ীগুলির পৃথক নামগুলি উল্লেখ করছি—এই নাড়ীগুলির নাম স্মরণ বাখলে সকল জটিল তত্ত্ব করা সহজ হযে আসবে। বামগা এবং দক্ষিণগা নাড়ী দুটি দ্বৈতের প্রতীক—দ্বৈতত্ত্ব বোঝাবার জন্যে বামগা নাড়ীকে সাধারণতঃ বলা হয় শ্বাসবাহী নাড়ী, প্রাণবাহী নাড়ী, ভব (অস্তিত্ব), সৃষ্টি, ইতি, প্রজ্ঞা, বিন্দু, নিবৃত্তি ইড়া, কুলিশ, আলি, গঙ্গা, চন্দ্র, রাত্রি, লালন, চমন, ইত্যাদি এবং দক্ষিণগা নাড়ীকে বলা হয় প্রশ্বাসবাহী নাড়ী, অপানবাহী নাড়ী, নির্বাণ (অনস্তিত্ব), সংহার, নেতি, উপায়, নাদ, প্রবৃত্তি পিঙ্গলা, কমল, কালি, যমুনা, সূর্য, দিবা, রসনা, ধমন ইত্যাদি। বিপরীতার্থক এই নামগুলি একত্রিত করলে দাঁড়ায় বামগা-দক্ষিণগা, শ্বাসবাহী-প্রশ্বাসবাহী, প্রাণ-আপন, ভব-নির্বাণ, অস্তিত্ব-অনিস্তত্ব, সৃষ্টি-সংহার, ইতি-নেতি, প্রজ্ঞা-উপায়, বিন্দু-নাদ নিবৃত্তি-প্রবৃত্তি, ইড়া-পিঙ্গলা, কুলিশ-কমল, আলি-কালি, গঙ্গা-যমুনা, চন্দ্র-সূর্য, রাত্রি-দিবা, লালন-রসনা, চমন ধমন। মধ্যগা নাড়ীটির বিভিন্ন নামের মধ্যে অবধুতি, অবধূতিকা, ষুষুম্না ইত্যাদি প্রধান।

সহজিয়াগণের প্রধান এবং চরম লক্ষ্য সহজানন্দ বা মহসুখ বা বোধিচিত্ত লাভ। তাদের কাছে এ নাড়ীর কি প্রয়োজন? বামগা দক্ষিণগা এই নাড়ী-দ্বয়ের প্রবাহ সাধারণতঃ নিম্নাভিমুখী—এই নিম্নাভিমুখী প্রবাহে চলে সংসারের গতি। একটিতে 'ভব' (অস্তিত্ব) অপরটিতে 'নির্বাণ'

(অনস্তিত্ব)। একটি 'সৃষ্টি' অপরটি 'সংহার' একটি 'ইতি' অপরটি 'নেতি'। এই উভয় নাড়ীর নিম্নাভিমুখী ধারা মধ্যগা নাড়ী পথে উৰ্দ্ধগা করতে পারলেই মধ্যগার শীর্ষদেশে যে অদ্বয় বোধিচিত্ত বা সহজানন্দ বা মহাসুখ বিরাজমান তা' লাভ করা সম্ভব এবং এই অদ্বয় বোধিচিত্ত লাভই সহজিয়াগণের চরম লক্ষ্য। বামগা এবং দক্ষিণগা নাড়ীর প্রবাহ যে নিম্নমুখী এবং নিম্নমুখী ধারায় যে বহিঃসৃষ্টি সে কথা পুর্বেই বলেছি। এই নিম্নধারায় সৃষ্টি হয় জন্ম মৃত্যুর, জরা-ব্যাধির অর্থাৎ চলমান বাস্তব বিশ্ব সংসারের। নিবৃত্তি রূপিণী বামগা নাড়ীর মধ্যদিয়ে প্রবাহিত হয় একটি রস আর প্রবৃত্তি রূপিণী দক্ষিণগা নাড়ীর অভ্যন্তর দিয়ে প্রবাহিত হয় পৃথক গুণ সম্পন্ন আর একটি রস। বলা বাহুল্য এই উভয় রসের ধারা নিম্নগা। এই উভয় রস যদি মধ্যগায় মিলিত হয় তা হলে 'সমরসে'র সৃষ্টি হয়—এই সমরস যখন শীর্ষ দেশে উপনীত হয় তখন তা পরিশুদ্ধ 'সামরস্য' রূপলাভ করে। সহজানন্দ বা অদ্বয় বোধিচিত্ত এই সামরস্যের পূর্ণতমরূপ।

সহজিয়াগণের যে সাধনা তা তান্ত্রিক সাধনা কিন্তু পুরাপুরি নয়। তান্ত্রিক সাধনার অন্তরঙ্গ দিক ছাড়া বহিঃরঙ্গ দিকটাই অধিক। কিন্তু সহজিয়াগণ বহিঃরঙ্গকে একেবারেই এড়িয়ে গেছেন। চর্যার সাধকগণ তাই বার বার বাইরের সকল তপ-যপকে এড়িয়ে অন্তরের দিকেই মনোনিবেশ করতে বলেছেন। তন্ত্র সাধনার মূল কথা হল দেহসাধনা— অর্থাৎ দেহকেই যন্ত্র করে তার ভিতর দিয়েই পরম সত্যকে উপলব্ধি করার সাধনা। 'তন্ত্র মতে দেহ ভাণ্ডটিই হলো ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্ররূপ— সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে যা' কিছু সত্য নিহিত আছে, তার সবই নিহিত আছে এই দেহ ভাণ্ডের মধ্যে।' সহজিয়াগণ তাই দেহকে নিয়েই পড়েছেন। দেহের মধ্যে যে সহজ স্বরূপ তাই বুদ্ধ স্বরূপ। চর্যাকারগণ তাইতো বার বার ডাইনে বামে যেতে নিষেধ করেছেন। লঙ্কায় যেতে তাইতো তাদের ঘোর আপত্তি যে পতি ঘরে বাস করে প্রতিবেশীকে জিজ্ঞেস করে তার সংবাদ পাওয়া যাবে কেমন করে ঃ

ঘরে আচ্ছই বাহিরে পুচ্ছই।
পই দেক্‌খই পড়িবেশী পুচ্ছই॥

'ঘরে (দেহঘরে) আছে, বাইরে জিজ্ঞেস করছ, (ঘরে) পতি দেখেছ কিন্তু প্রতিবেশীকে তার (খোঁজ) জিজ্ঞেস করছ।'

অন্যত্র ঃ

অসরির কোই সরীরাই লুক্কো।
জো তাহি জানই সো তাই মুক্কো॥

'অশরীরী একজন দেহ লুকিয়ে আছে—তাকে যে জানে সে-ই মুক্ত হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে চর্যাকারগণ বার বার বলেছেন অদ্বয় বোধিচিত্ত লাভের জন্যে বাইরে যেতে হবে না—দেহের মধ্যেই সব। সাধনার ক্ষেত্রে তাঁরা দেহের মধ্যে চারটি চক্র বা চার পদ্ম কল্পনা করেছেন (হিন্দু মতে ষট্‌চক্র)। প্রথম চক্র নাভিতে—নাম 'নির্মাণ-চক্র,' দ্বিতীয় চক্র হৃদয়ে—'ধর্মচক্র,' তৃতীয় চক্র কণ্ঠে—'সম্ভোগ চক্র' এবং চতুর্থ বা শেষ চক্র হলো মস্তিষ্কের সর্বোচ্চ দেশে এবং এ চক্র উষ্ণীষ চক্র বা সহজ চক্র বা 'মহাসুখচক্র' নামে খ্যাত। বামগা বা দক্ষিণগা নাড়ীদ্বয়কে প্রথমে নিঃস্বভাবীকৃত করতে হবে—তাবপর এই নাড়ীদ্বয়ের যে স্বাভাবিক নিম্নগা গতি যোগের সাহায্যে বিশুদ্ধ করে সেই গতিকে রুদ্ধ করতে হবে—এর পরের সাধনা হলো দুই পৃথক রুদ্ধ ধারাকে সমন্বিত করার সাধনা, তারপর যোগবলে সেই সমন্বিত ধারাকে মধ্যগার বা অবধুতিকার ভিতর দিয়ে উর্দ্ধাগা করতে হবে—এই উর্দ্ধাগা ধারাই হলো পরম আনন্দ-প্রবাহের ধারা। অবশ্য এই ধারা যতই উর্দ্ধমুখী হবে আনন্দানুভবের ততই আসবে প্রবলতা। প্রথম স্তরের উর্দ্ধমুখী আনন্দ-স্পন্দনের নাম আনন্দ, দ্বিতীয়ানুভূতি পরমানন্দ, তৃতীয়ানুভূতি বিরামানন্দ এবং চতুর্থ বা শেষ আনন্দাভূতির নাম সহজানন্দ। এই সহজানন্দ লাভই হলো সহজিয়া সাধকগণের চরম লক্ষ্য।

বাঁকা-চোরা পথ নয়—সোজা পথেই সহজানন্দ সহজ-লভ্য। চর্যাকারগণ

তাই বার বার বাম দক্ষিণ কোন পথে না যেয়ে সোজা পথে যাওয়ার উপদেশ দিয়েছেন ঃ

বাম দাহিণ চাপী মিলি মিল মাঙ্গা।
বাটত মিলিন মহাসুহ সাঙ্গা॥

সরহপাদের ৩২ নং চর্যায় পাই ঃ

বাম দাহিণ জো খাল বিখলা।
সরহ ভণই বাপা উজুবাট ভাইলা॥

বাম দক্ষিণ নয় অর্থাৎ বাহ্যাড়ম্বর যুক্ত কোন পূজা-পার্বণ নয়, কোন ক্রিয়াকাণ্ড নয়—এ সকল পথ পবিত্যাগ কবে অন্তরঙ্গেব অর্থাৎ অবধূতিকার পথেই একমাত্র নির্বাণ লাভ সম্ভব। অদ্বয় বোধিচিত্ত, কিংবা সহজানন্দ কিংবা মহাসুখ একমাত্র সেখানেই।

॥ জয়দেব ও বাংলা সাহিত্য ॥

চর্যাপদে বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশের যে ক্ষীণ ধারার সাথে আমাদের পরিচয় হয়েছে সেই ধারাই কালিদাসোত্তর সংস্কৃত ভাষার শক্তিমান গীতি-কবি জয়দেবের কাব্যে অধিকতর স্পষ্ট ও বেগবান হয়ে উঠেছে। জয়দেব রাজভাষার কবি, তিনি কাব্য রচনা করেছেন সংস্কৃত ভাষায়। তাঁর বিখ্যাত কাব্য গীতগোবিন্দ সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়েছে। সুতরাং ভাষার দিক দিয়ে জয়দেবের কাব্যে বাংলা সাহিত্যের ক্ষীণ ধারার বলিষ্ঠতর রূপ প্রত্যাশা করা হয়তো ঠিক হবে না। কিন্তু ভাষা দিয়ে শুধু সাহিত্য গড়ে ওঠে না। সার্থক সাহিত্য সৃষ্টির জন্যে চাই "ভাবে"র রূপাল্পনা, "রূপের" বর্ণবিন্যাস এবং "পরিবেশের" বাস্তবানুগ উপস্থাপন। এ সকল দিক দিয়ে বিচার করলে আমরা দেখব গীতগোবিন্দের অন্তর্বীণা বাংলা সাহিত্যে নিজস্ব সুর মূর্চ্ছনায় স্পন্দিত হয়ে উঠেছে। এ সকল দিক থেকেই গীতগোবিন্দের নম্র-কোমল গীতি-কাব্যের বুকে বাংলা সাহিত্যের বলিষ্ঠতর রূপটীর অন্বেষণ করবো। বাংলা সাহিত্য সাধারণভাবে বাঙালীর চিন্তাধারা, ধ্যান-কল্পনা এবং আশা-আকাঙ্খার প্রতীক। এই সাহিত্যেই নিহিত আছে বাঙালী মনের আদিম সত্তা, বাংলার চিরন্তন ঐতিহ্য। বাংলার জলবায়ু এবং তার প্রাকৃতিক কোমল-মধুর পবিবেশ-প্রভাবে বাঙালীর ব্যক্তিমানসের এক বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করে। বাঙালীর সাহিত্যে বাঙালীর ব্যক্তিমানসের এই বিশেষ রূপটি বিধৃত হয়। বাংলা ভাষা যেদিন তিমির-গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেনি সেদিনও বাঙালীর ব্যক্তিমানসের এই বিবর্তন অনুবর্তন বিভিন্ন ভাষায় বাঙালীর রচিত সাহিত্যে সবার অলক্ষ্যে আপন স্থান করে নিয়েছে। তাই বাংলা সাহিত্যের বিকাশমান প্রারম্ভিক প্রস্তুতি-গুলি স্তব্ধ হয়ে আছে বাঙালী রচিত বিভিন্ন অবাংলা সাহিত্যের বুকে। বাঙালী কবি জয়দেবের "গীত-গোবিন্দ" এরূপ গ্রন্থগুলির মধ্যে একটি।

গ্রন্থটি রচিত হয়েছে সংস্কৃতে। বাইরের দিক থেকে এই সহজছেদ্য আবরণ, এই ভাষার বিভিন্নতার জন্যেই গ্রন্থটিকে সংস্কৃত গ্রন্থ বলে আমাদের ভ্রম হয় কিন্তু এই স্বচ্ছ আবরণের অন্তরালে বাঙালী ব্যক্তি মানসের এক চিরন্তন রূপ আত্মগোপন করে আছে। চরিত্রগুলির মুখে সংস্কৃত বাক্য মাত্র কিন্তু তারা যে বাংলার আদিম সন্তান। বাংলার পেলব কোমল মৃত্তিকার বুক হতে জন্মলাভ করে তারই বুকের সুধা পান করেই যে তারা বেড়ে উঠেছে তা বুঝতে মোটেই কষ্ট হয় না। তাই ডাঃ সুকুমার সেন বলেছেন 'কালিদাস পরবর্ত্তী সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গীতি কবি, বাংলা দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি জয়দেবের প্রসঙ্গই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের যথার্থ প্রস্তাবনা। অন্যত্র তাঁর ঘোষণা "গীত-গোবিন্দের পদাবলীর ভাষা সংস্কৃত, ছন্দ প্রাকৃত, ভাব বাংলা।" বস্তুতঃ কেবল ভাবেই নয় ভাষা এবং ছন্দেও বাঙালীত্বের ছাপ বর্তমান। নিম্নের আলোচনা হতে আমরা আমাদের মন্তব্যের সত্য-সার নিষ্কাসন করার চেস্টা করব।

বাঙালী জাতীয় চরিত্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো ভাবাতিরেক এবং এই জন্য বাংলা সাহিত্যে রচিত হয়েছে তানপ্রধান ছন্দে ভাবাবেগবহুল গীতাবলী। গীত-গোবিন্দ তো এই ভাবাবেগবহুল চিন্তাধারার ছন্দিত রূপায়ণ। জয়দেবের এই যুগান্তকারী কাব্য পড়তে গেলে চোখের সামনে, অপূর্ব স্পষ্টতায় ভেসে ওঠে গোকুল, সেখানে তমালতলে কৃষ্ণ নাচে বিভোর। পার্শ্বে পাগলিনী রাধা স্বর্গীয় সুষমায় কৃষ্ণদেহ সমুদ্ভাসিত, অপূর্ব সে রূপ! কৃষ্ণের বাঁশীর মোহনতানে যমুনাজলে যে হিন্দোল জাগতো, কোকিলের মধুর তানে রাধা ও গোপীগণ যেরূপ বিহ্বল হয়ে পড়তো গীতগোবিন্দের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় অপূর্ব রূপাল্পনায় তা সুঅঙ্কিত হয়েছে।

গীতগোবিন্দ আদি রসাত্মক। 'যদিও কবি 'হরিস্মরণে সরস মনের' কথা উল্লেখ করে সর্গে সর্গে ভক্তির প্রলেপ দিতে চেষ্টা করেছেন তথাপি 'পীন পয়োধার পরিসর মর্দ্দন চঞ্চল করযুগ শালী' ইত্যাদি সম্ভোগ চিত্রে সে প্রলেপ খসে পড়েছে।' পদাবলী সাহিত্যের

প্রধান উপকরণ এই আদিরস। রাগের সময় কৃষ্ণকে সখীগণের সাথে বিহার করতে দেখে রাধার অভিমান হয় এবং তিনি অন্য কুঞ্জে অবস্থান করেন। কৃষ্ণ যান সেখানে—সেই অভিমানিনী রাধিকার পার্শ্বে, অবশেষে অভিমানের পরিসমাপ্তি ঘটে। মান অভিমানের মাঝে এই যে মধুর বিরহ মিলন এতে গীত গোবিন্দের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। গীত গোবিন্দে প্রতিষ্ঠিত এই লৌকিক মান অভিমান, মিলন বিরহের ধারা বৈষ্ণব পদাবলীর বুকে স্বর্গীয় সুরভিতে সুন্দর রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গীতগোবিন্দই বৈষ্ণবপদাবলীর সূতিকাগার। বিশিষ্ট সমালোচক তাই যথার্থ ই বলেছেন "মেঘদূত যেমন অজস্র কবিকে 'দূত' কাব্যের প্রেরণা জোগাইয়াছে গীতগোবিন্দও তেমনি অসংখ্য কবিকে 'গীত' কাব্য-রচনায় প্রবৃত্ত করাইয়াছে।"

গীতগোবিন্দ যেন আদি-অন্তরহিত তুষারাবৃত বিশাল শৈলভূমি—পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন স্রোতধারা এই তুষার গলা জলে পরিপুষ্টি হ'য়ে বিপুল বেগে কূল প্লাবী বন্যায় দুর্নিবার হয়ে উঠেছে। তাই দেখি সুদূর অতীতে রচিত বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হ'তে আধুনিক কালে রচিত রবীন্দ্রনাথের "ভানুসিংহের পদাবলী"র সর্বত্রই গীত-গোবিন্দের 'মধুর-কোমলকাণ্ড পদাবলী'র সুকোমল সুরটী অপূর্ব সুর-মূর্চ্ছনায় গুঞ্জিত হয়ে উঠেছে। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের কাঠামোটি তো গড়ে উঠেছে গীত-গোবিন্দের ভাব-সম্পদকে কেন্দ্র করেই। কেবল ভাব নয়, মাঝে মাঝে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি বড়ু চণ্ডীদাস গীত-গোবিন্দের বিপুল অংশকে ভাষান্তরিত করে আপন কাব্যে সন্নিবেশিত করেছেন। যে পদাবলী-সাহিত্যে বাঙ্গালীর চিত্ত-ভূমিতে অনির্ব্বাণ দীপালোকের মত মনোরম আলোক সম্পাতে উজ্জ্বল করে তুলেছে—এই গীত-গোবিন্দই তার উৎস ভূমি।

জয়দেবের দশাবতার স্তোত্র আমাদের দেশে বহুল প্রচলিত। এমন কি, পল্লীগ্রামের নিতান্ত নিরক্ষর ভিক্ষুকের মুখেও এর আবৃত্তি শোনা যায়। মনের দিক থেকে একটি স্বাভাবিক আকর্ষণ না থাকলে এমন জনপ্রিয়তা লাভ করা কোন সাহিত্যের পক্ষেই সম্ভব নয়।

বাঙালী-চিত্তের সাথে গীত-গোবিন্দের সুর-ধারায় যে ঐকান্তিক যোগ আছে তার সব থেকে বড় প্রমাণ এই যে—একমাত্র গীত-গোবিন্দ প্রায় সহস্র শতাব্দী ব্যাপী বাংলা সাহিত্যকে এবং বাঙালী মানস-ভূমিকে রসের অফুরন্ত ফোয়ারায় সঞ্জীবিত এবং গীত-স্পন্দনে আন্দোলিত করে আসছে। এতদিন ধরে এত পাঠকের চিত্তকে প্রেম-রসে সঞ্জীবিত করে আজ পর্যন্ত তার রসের ভাণ্ডারে টান পড়েনি। আশ্চর্য!

গ্রন্থের মধ্যে প্রকৃতির যে বর্ণনা আছে তা এই শ্যামল বাংলারই, যে নদীর বিবরণ পাওয়া যায় তাও এই নদীমাতৃক বাংলা দেশেরই একটি। ভাব এবং বর্ণনার দিক থেকে গীতগোবিন্দ সামগ্রিকরূপে বাংলা সাহিত্যের সমগোত্রীয়।

গীতগোবিন্দ সংস্কৃত ভাষায় রচিত, কিন্তু সে সংস্কৃতের মধ্যে অনুস্বর বিসর্গ প্রভৃতির পরিমাণ এত কম যে মাঝে মাঝে দীর্ঘ সমাসবদ্ধ বাংলা পদ বলেই ভ্রম হয়। একটী উদাহরণই যথেষ্ট হবে ঃ

দিনমনি মণ্ডল-মণ্ডন ভব-খণ্ডন মুনিজন-মানহংস
কালীয় বিষধর গঞ্জন জন রঞ্জন ......ইত্যাদি।

সত্যই এগুলিকে বাংলার সমাসবদ্ধ পদ ছাড়া অন্য কিছু বলে চিন্তা করতে আমাদের মন কিছুতেই সায় দেয় না।

অন্য আর একটি পদ।

"ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং
ত্বমসি মম ভবজলধি রত্নং
ভবতু ভবতীহ ময়ি সতত মনুরোধিনী
তত্র মম হৃদয়মতি যত্নং॥"

এখানে সংস্কৃত এবং বাংলা ভাষা অদ্বৈত সম্পর্ক-যুক্ত।

সংস্কৃত এবং বাংলার মধ্যবর্তী ব্যবধান-চিহ্ন যেন এখানে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

গীতগোবিন্দের ছন্দ বিশ্লেষণ করলেও দেখা যাবে এ ছন্দ সংস্কৃত ছন্দের অনুগামী নয়। এ কাব্যের ছন্দ পাদাকুলক—এই পাদাকুলক ছন্দ হতে পরবর্তীকালে বাংলা কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ছন্দ পয়ারের উৎপত্তি।

সংস্কৃতের অক্ষয়বৃত্ত ছন্দের পরিবর্তে লোকভাষার মাত্রাবৃত্ত ছন্দই জয়দেব গ্রহণ করেছেন তাঁর কাব্যে। পয়ার ছাড়া বাংলা কাব্যের আর একটি বলিষ্ঠ ছন্দ ত্রিপদী—এই ত্রিপদী ছন্দেরও পুর্বাভাস গীতগোবিন্দে সূচিত হয়েছে। এছাড়াও আর একটি বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় এই যে জয়দেবের কাব্যের প্রতি চরণে যে অন্তমিল দেখা যায় তা সংস্কৃতে পাওয়া যায় না—এই অন্ত্যানুপ্রাস বাংলা কাব্য-ছন্দের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদাবলী এবং রবীন্দ্রনাথেব ধ্বনিপ্রধান কবিতাগুলির সাথে জয়দেবের কবিতার একটি নিকট সম্পর্ক ও অদ্ভুত মিল লক্ষণীয়। একটি উদাহরণ ঃ

"বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি-কৌমুদি', —জয়দের।

"পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ একি সন্ন্যাসী।"—রবীন্দ্রনাথ

এখানে আর একটি বিষয় লক্ষণীয়—সংস্কৃত ছন্দের দীর্ঘস্বর দ্বিমাত্রিক হয় না—কিন্তু প্রাকৃতে এবং বাংলায় তা হয়। সংস্কৃতে রচিত গীতগোবিন্দের বহুস্থানেই এই দ্বিমাত্রিক স্বরের প্রকাশ ঘটেছে।

কেবল ছন্দের দিক হ'তেই নয় অর্থবোধের দিক হ'তেও যে গীতগোবিন্দের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের বিশেষ রূপটী সুপ্ত রয়েছে, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায 'কবি জয়দেবও গীতগোবিন্দে'র ভূমিকায় সে কথা সুন্দররূপে তুলে ধরেছেন: "সংস্কৃত কবিতা সাধারণতঃ পাদ-চতুষ্টয় সমন্বিত একটি Stanza-য় পর্য্যবসিত; এবং এইরূপ শ্লোকের সমষ্টি লইয়াই কাব্য। এই শ্লোকগুলি কখনো সম্বন্ধ, কখনো অসম্বন্ধ, কিন্তু এক একটি শ্লোক প্রায়ই সম্পূর্ণ ভাবের জ্ঞাপক। পদাবলীর প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এগুলিকে ব্যষ্টিভাবে লইলে সম্পূর্ণ অর্থ গ্রহণ করা যায় না। গানের মত পৃথকরূপে বিভিন্ন ভাবের প্রকাশক হইলেও এগুলিকে সমষ্টিভাবেই ধরিতে হইবে এবং অন্তে

নিবিষ্ট refrain বা ধ্রুবপদই ইহার ভাবপরম্পরার যোগসূত্র। পদাবলীর এই ধরণটি দেশীয় গানের প্রথাই অবলম্বন করেছে।"

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ভাব, ভাষা, ছন্দ, সকল দিক দিয়েই গীতগোবিন্দ উত্তর-যুগের বাংলা কাব্যের সুদৃঢ় বুনিয়াদ গঠন করেছে। এদিক দিয়ে বিচার করলে গীতগোবিন্দ যথার্থই বাংলা কাব্যের সূতিকাগার। এছাড়াও গীতগোবিন্দে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে যেগুলি একান্তভাবেই প্রাচীন বাংলা কাব্যের লক্ষণাক্রান্ত। প্রাচীন বাংলার গীতিকাব্য পালাগান এবং মঙ্গলকাব্যের সমন্বয়। কিছু গান, কিছু বর্ণনা কিছু কথোপকথন এই ত্রিবিধ আঙ্গিক-বৈচিত্র্যের সমন্বয়ে গীতগোবিন্দে যে পালাগানের রূপ ফুটে উঠেছে তা সংস্কৃত সাহিত্যে বিরল-দৃষ্ট। পরবর্তীকালে বাংলার লোকজীবনে যে পালাগানের ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল গীতগোবিন্দ হতেই তার সূত্রপাত। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য মানবীকৃত দৈববাদের চিত্রে সমুজ্জ্বল। দেবদেবীর এই মানবায়িত রূপ-করণের বীজ গীতগোবিন্দের বুকেই নিহিত। এছাড়াও মধ্য-যুগের বাংলা কাব্যে লৌকিক-অলৌকিকতার যে নিরন্তর সংমিশ্রণ দেখা যায় জয়দেবের গীতগোবিন্দেই রচিত হয়েছে তার প্রথম সূত্রপাত। এখন প্রশ্ন হওয়া স্বাভাবিক: ভাব ভাষা ছন্দ ইত্যাদি সকল দিক থেকেই গীতগোবিন্দ বাংলা কাব্যের সীমারেখা স্পর্শ করে গেলেও সংস্কৃতে রচিত হলো কেন। উত্তরে প্রথমতঃ বলা যায় যখন গীতগোবিন্দ রচিত হয় তখন বাংলা ভাষা অপভ্রংশের বক্ষ হতে জন্মলাভ করলেও তা ছিল নিতান্ত অপরিণত এবং মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বাংলা ভাষায় সাহিত্যের কোন আদর্শই তখন গড়ে ওঠেনি। ফলে গীতগোবিন্দ বাংলায় রচিত হওয়ার পক্ষে বেশ কিছুটা বাধা ছিল। দ্বিতীয়তঃ বাংলা ভাষা অপেক্ষা সংস্কৃতে জয়দেব ছিলেন বিশেষ পারদর্শী সুতরাং কাব্য রচনায় তিনি সংস্কৃতের দ্বারস্থ হয়ে ছিলেন। তৃতীয়তঃ, তখনকার দিনে বাংলা অপেক্ষা সংস্কৃতে রচনা বেশী দিন স্থায়ী এবং ব্যাপক প্রচারিত হতো। তার উপরেও জয়দেব ছিলেন লক্ষণসেনের সভাকবি। ফলে প্রতিভা-প্রতিষ্ঠার

॥ মঙ্গল কাব্য ॥

॥ এক ॥

॥ সূচনা ও নামকরণ ॥

বাংলা কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে মঙ্গলকাব্যসমূহ এক পরমাশ্চর্য সংযোজনা। আদিম বাংলা কাব্যের অন্ধকারাচ্ছন্ন বন্ধুর গলি পথে মঙ্গল সাহিত্যের কাব্য-দ্যুতি প্রতিফলিত হ'য়ে গলির কালিমাকে বহুদূর পর্যন্ত ঝলকিত করে দিয়েছে। গলীর গণ্ডীকে ভেঙে বাংলা কাব্যের অযুত সম্ভাবনাকে বিপুল বর্ণচ্ছটায় দিগন্ত বিথারী করে দিয়েছে, তার বুকেই শোনা গিয়েছে অবরুদ্ধ গর্জনোন্মুখ সমুদ্রের বিপুল জলকল্লোল। মঙ্গলকাব্যের সাথে 'মঙ্গল' নামটি যুক্ত থাকায় আমাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক এই নামকরণের পিছনে কোন প্রচ্ছন্ন ইংগিত আছে কিনা। মঙ্গলকাব্যের ঐতিহাসিক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় রাগিণীর দিক হ'তে আলোচনা করে মঙ্গলকাব্যের সাথে 'মঙ্গল' শব্দটির যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে তা' দেখিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য তাঁর ভাষাতেই বলি, "দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রাচীন ভারতীয় সংগীতের রাগ-রাগিণীর মধ্যে 'মঙ্গল রাগ' অন্যতম।........প্রাচীন ও মধ্যযুগের পদ্য-সাহিত্য মাত্রই গানের উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছিল, মঙ্গল সাহিত্যও ইহার ব্যতিক্রম ছিল না। এই জন্যই মনে হইতে পারে, আদ্যোপান্ত মঙ্গলরাগে কিংবা প্রধানতঃ মঙ্গলরাগে যাহা গীত হইত, তাহাই সাধারণভাবে মঙ্গলগান বলিয়া অভিহিত হইত।" একটু লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাব মন্তব্যের মধ্যে নিশ্চিত রূপে, নিঃসংশয় হ'য়ে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মহাশয় কিছু বলেন নি—'সম্ভাবতঃ'-এর রেশ রয়ে গেছে। স্থির নিশ্চয় ভিত্তিভূমির উপর দণ্ডায়মান হ'য়ে এই মন্তব্য ঘোষণার পিছনে যে দুর্বলতা রয়েছে সে বিষয়ে শ্রদ্ধেয় আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় পুর্ণমাত্রায় অভিহিত ছিলেন। মঙ্গলকাব্য কেবলমাত্র মঙ্গলসুরেই গীত হ'তো—এর মাঝে

প্রচুর পরিমাণে পাঁচালীর সুরও মিশে থাক্‌তো। কিন্তু "ক্রমে পাঁচালীর উপর মঙ্গলরাগের ক্রমবর্ধমান প্রভাব বশতঃই সম্ভবতঃ ইহা মঙ্গল নামে পরিচিত থাকে।"

'মঙ্গল' নামের উৎপত্তি সম্পর্কে মঙ্গলকাব্যের ঐতিহাসিক শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক আর একটি সুন্দর বিচারসহ মন্তব্য করেছেন—"কোনও অপ্রিয় বিষয় বা নামকে অনেক সময় সম্পূর্ণ বিপরীতার্থক শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এই প্রবৃত্তিকে ইংরেজিতে euphemism বলে। মঙ্গল-কাব্যের দেবতার চরিত্র মাত্রই অমঙ্গলকারী (malignat)। অতএব ইহাদের অমঙ্গলকারিণী শক্তিকে প্রশমিত (pacify) করিবার কিংবা মনোমধ্যে ইহার বিষয় স্থান না দিবার প্রবৃত্তি হইতেও তাহাদিগকে মাহাত্ম্যসূচক গীতিতে মঙ্গলগান বলিয়া উল্লেখ করা হইতে পারে। বসন্ত রোগের নিদারুণ অন্তর্দাহের জ্বালার মধ্যেও মানসিক শান্তি লাভ করিবার জন্য এই রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে এই কারণেই 'শীতলা' বলিয়া উল্লেখ করা হয়। কালক্রমে সকল শ্রেণীর দেবতার মাহাত্ম্যকীর্তনই মঙ্গল নামে পরিচয় লাভ করে।"

মঙ্গলনামের উৎপত্তি সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় ভট্টাচার্যের বলিষ্ঠ মন্তব্যের সাথে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমতও বিশেষরূপে স্মরণ যোগ্য। চণ্ডী-মঙ্গল-বোধিনী' গ্রন্থে তিনি বলেছেন, 'যে গানে মঙ্গলকারী দেবতার মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়, যে গান মঙ্গল সুরে গাওয়া হয়, যে গান যাত্রা বা মেলায় গাওয়া হয় [হিন্দীতে মঙ্গল শব্দের অর্থ "মেলা, যাত্রা বা গমন"] তাকেই মঙ্গলকাব্য বলা হ'য়ে থাকে।' এই মন্তব্যের উপর ভিত্তি করেই আধুনিক সমালোচক শ্রীযুক্ত ভূদেব চৌধুরী মহাশয় ঘোষণা করেছেন "মঙ্গল কাব্যসমূহের আভ্যন্তরিক প্রমাণ অনুসরণ করে বলা চলে, যে দেবতার আরাধনা, মাহাত্ম্য-কীর্তন এমন কি শ্রবনেও মঙ্গল হয়, এবং বিপরীতটিতে অমঙ্গল হয়, যে কাব্য মঙ্গলাধার,—এমন কি, যে কাব্য ঘরে রাখিলেও মঙ্গল হয়, —তাই মঙ্গল কাব্য।" অন্ধ বিশ্বাস প্রাচীন কালের ধর্মান্ধতার সুযোগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যা' হোক এ পর্যন্ত যা' আলোচনা

করা গেল তা'তে 'মঙ্গল' নামের উৎপত্তির উৎসভূমি সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা পাওয়া যাবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

॥ দুই ॥

॥ মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব যুগ ও উৎস-ভূমি ॥

কোন্ শুভলগ্নে মঙ্গল কাব্যের প্রথম উন্মেষ ঘটেছিল তা' আজ নিশ্চিন্ত করে বলা সম্ভব নয়—তবে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যে এই কাব্য একটি বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করে, গণমানসের হৃদয়ানন্দের উৎস-ভূমি হ'য়ে উঠেছিল সে বিষয়ে অনেকেই একমত। বহুপূর্ব হতে এই লৌকিক দেব-দেবীগণের মহিমা পাঁচালীর আকারে— অপূর্ণ কাব্যে এবং অপূর্ণ ভাষায় লেখা হতো। কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীর 'যুগ প্লাবী প্রয়োজন-প্রভাবে' এই অপূর্ণ পাঁচালী গাথাই সুসম্পূর্ণ মঙ্গল কাব্যের রূপ পরিগ্রহ ক'রে অনন্যসুন্দর দীপ্তিতে ভাস্বর হ'য়ে ওঠে। এই পাঁচালা হ'তে মঙ্গল কাব্যের রূপান্তরের পিছনে প্রধানত দু'টি কারণ তীব্র বেগ সঞ্চার করেছে। প্রথম এবং প্রধান কারণ হ'লো রাজ-নৈতিক বিপর্যয়। দীর্ঘদিন ধরে অনায়াস-লভ্য সুখ সম্ভোগে মত্ত থেকে আপামর বাঙালীর শক্তিমত্তায় ঘুণ ধরেছিল, তারা হ'য়ে পড়েছিল পঙ্গু এবং ক্লীব। তা ছাড়া অভিজাত এবং অনভিজাত বাঙালীর মধ্যে এক দুরতিক্রমী ধ্বংসোদ্দীপক ব্যবধান রচিত হওয়ায় বাঙালীর জমাট শক্তির ধ্বংস সাধনের পথ অধিকতর প্রসস্থ হ'য়েছিল। পলায়নী মনোবৃত্তির এবং নৈতিক ব্যাভিচারে ক্ষীয়মান বাঙালীর ধ্বংসমুখীনতার ওপর এল তুর্কী আক্রমণের প্রচণ্ড আঘাত। দুর্বল বাঙালীর পক্ষে বীর্যবান তুর্কীদের এই সুতীব্র আক্রমণ রোধ করা কোনক্রমেই সম্ভব ছিল না। সুতরাং এই ধ্বংস যজ্ঞকে নিবীর্য বাঙালী মাথা পেতে গ্রহণ করলো। রাজনৈতিক জীবন হ'তে তার হ'লো নির্বাসন। আঘাতের পর আঘাতে বাঙালীর চলমান জীবন আতঙ্কগ্রস্ত হ'য়ে উঠ্‌লো। আত্মরক্ষার সুস্পষ্ট প্রয়োজনবোধে পলায়নপর

মনোবৃত্তিকে দূরে সরিয়ে শিথিল জাতীয়-চেতনাকে সুদৃঢ় ভিত্তিভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করবার সচেতন প্রয়াস বাঙালীর মধ্যে এই প্রথম দেখা দিল। রাজনৈতিক জীবন হ'তে অপসারিত হ'য়ে ধর্মীয় জীবনের নব জাগতিতে সে তার সমুদয় চেষ্টাকে নিয়োজিত করলো। ফলে অপূর্ণ পাঁচালী গাথাগুলি সম্পূর্ণ কাব্যে রূপান্তরিত হ'লো। তা ছাড়া দুর্বলের সহায়ক হিসেবে একজন শক্তি-দেবতার প্রয়োজন এই সময় সুতীব্ররূপে অনুভূত হ'লো। বিভীষিকাগ্রস্ত হীনসর্বস্ব বাঙালীর চেতনা-দ্বারে মঙ্গল দেব-দেবীগণ তাঁদের সর্বপ্রকার প্রচণ্ড শক্তি-যজ্ঞের বিপুল আয়োজন নিয়ে দেখা দিল। ফলে এই লৌকিক দেব-দেবীগণের কাহিনী যা পূর্বে পাঁচালী আকারে লিখিত হ'তো তাই পরম শ্রদ্ধায় বহুজনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা মঙ্গল কাব্যের বিপুল সম্ভাবনায় আত্মপ্রকাশ করলো। দ্বিতীয় কারণ নিহিত রয়েছে তুর্কী আক্রমনের ধ্বংসস্তূপের ওপর উচ্চ-নীচ, অভিজাত অনভিজাতের মিলন-সাধনের মধ্যে। ব্রাহ্মণ্যধর্মের পরিচালকগণ রাজশক্তির আনুকূল্যে অভিজাত-অনভিজাতের মধ্যে বিপুল ভেদরেখা বজায় রেখে এতদিন ব্রাহ্মণ্যধর্মকে পরিচালনা করতেন কিন্তু আক্রমণোত্তর যুগে রাজশক্তির আনুকূল্য হারিয়ে তাঁরা বিশেষভাবে অনুভব করলেন যে এবারে গণশক্তির সহযোগিতা না পেলে এই ধর্মকে বহাল তবিয়তে বাঁচিয়ে রাখা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাই তাঁরা গণ-জীবনের লৌকিক সংস্কার, তাদের ধর্মবিশ্বাস এমন কী তাদের দেব-দেবীগণকেও আপন অভিজাত্যের অন্তর্ভুক্ত করতে সম্মত হ'লেন। এই যে ভেদরেখা এতদিন অভিজাত-অনভিজাতের মধ্যে শত যোজন ব্যবধান রচনা করেছিল তা ভেঙ্গে গেল। এই প্রথম আর্য-অনার্য উভয় সম্প্রদায় মিলন-ভূমির শ্রীক্ষেত্রে সম্মিলিত হ'লো। আর্যীকরণের মধ্যে যে সব লৌকিক দেবদেবীগণ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিল তাদের মধ্যে মনসা, চণ্ডী এবং ধর্ম ঠাকুর প্রধান। এইবার হীনবীর্য দুর্বলগণ সম্মিলিত সম্প্রদায়গত ভাবে যে যার শক্তি দেবতার কাছে জানাল তাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা: "রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি।" এরপর এক এক দেব-

দেবীকে নিয়ে এক এক সম্প্রদায় প্রচণ্ড-শক্তি উদ্দীপক কাহিনী রচনায় উন্মাদ হ'য়ে উঠ্‌লো—মঙ্গলকাব্য সমূহ দেখা দিল প্রদীপ্ত মহিমায়।

॥ তিন ॥

॥মঙ্গল কাব্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ॥

মঙ্গলকাব্যের কাহিনী বিন্যাস পূর্ব সংস্কারাগত (conventional)। পূর্বে যে রূপায়ণ পদ্ধতি গড়ে উঠেছিল পববর্তী সকল কবিগণই সেই বাঁধাধবা পথে আপন কাহিনীকে বিন্যস্ত কবেছে—কোন দ্বিতীয় পথে পদচারণা কবেন নি। পূর্বসংস্কাবগত এই রূপাযণ-পদ্ধতি অনুযায়ী সকল মঙ্গল কাব্যকে প্রধান চাবভাগে বিভক্ত কবা চলেঃ বন্দনা, গ্রন্থোৎপত্তির কারণ, দেবখণ্ড এবং নবখণ্ড।

'বন্দনা' খণ্ডে কেবল বিশেষ কোন শক্তিদেবতারই বন্দনা-গান কবা হয়নি উপরন্তু সকল দেবদেবীর মহিমা কীর্তন কবা হয়েছে। মঙ্গলকাব্যগুলির যদিও সাম্প্রদায়িক উৎস হতে জন্মলাভ কবেছে তথাপি এই বন্দনা অংশে এক অসাম্প্রদাযিক উদার মনোভাব বর্তমান।

'গ্রন্থোৎপত্তিব কারণ' খণ্ডে সকল মঙ্গল কবিগণই বিশেষ দেবতা বা দেবীব স্বপ্নাদেশকেই বিশেষ মঙ্গল-গ্রন্থ রচনার হেতুনির্দেশ কবেছেন। গ্রন্থরচনার অন্তরালে দেবদেবীর স্বপ্নাদেশেব অবতারণা দেব-নির্ভর ধর্মান্ধ গণমানসকে জয় করার বিশেষ সুবিধাজনক পন্থা। এই খণ্ডের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য কবির আত্মপরিচয। 'গ্রন্থোৎপত্তির কারণ' নির্দেশ করতে গিয়ে সকল কবিই আপনাব জন্ম-সন, আপন পরিচয় বাসস্থান, বংশ ইত্যাদি বিষযে পরিপূর্ণ বিবরণ প্রদান করেছেন। পববর্তীকালে ঐতিহাসিকদের পক্ষে এই অংশটি বিশেষ উপকারে এসেছে।

গ্রন্থেব তৃতীয়াংশ "দেবখণ্ড" নামে পরিচিত। এই খণ্ডে সাধারণতঃ যা বর্ণীত হয় তার মধ্যে প্রধান হ'লো ঃ 'সৃষ্টি-রহস্য কথন, দক্ষপ্রজাপতির

শিবহীন যজ্ঞ, সতীর-দেহত্যাগ, হিমালয়-গৃহে নবরূপে জন্মলাভ, মদন ভস্ম, উমার তপস্যা, গৌরীর বিবাহ, কৈলাসে হর-গৌরীর কোন্দল শিবের ভিক্ষা যাত্রা ইত্যাদি। এই অংশে শিবের একচ্ছত্র প্রাধান্যটি বিশেষরূপে লক্ষণীয়। শিব আদি অন্তহীন এক অদ্ভুত পরমাশ্চর্য দেবতা —যেন গ্রামের প্রান্ত-সীমায় এক সুবিশাল বটবৃক্ষ, 'কত কালের কেউ না তাহা জানে' কিন্তু যুগ যুগ ধরে বংশ পরাম্পরায় সকলেই তার ছায়া তলে সান্ত্বনা ও শান্তি লাভ করে আসছে। সৃষ্টির আদিমতম যুগ হ'তে এই আপনভোলা মানুষটি আপনার অলক্ষ্যে সকলের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছেন। স্বর্গের সকল দেবতার উপরে তাই শিবের স্থান। শিবের এই অভিনব প্রভাব মানুষের ওপরেও বর্তমান। মানুষ যখন আর্য-অনার্য বিভাগে সকল দেবদেবীগণকে ভাগ বাঁটোয়ারা করে আর্য-অনার্য রূপ দান করেছে তখন শিবকে গুপ্ত গণ্ডীর মধ্যে সীমিত করবার দুঃসাহস তাদের হয়নি। শিব সকল সমাজের ওপর আপন প্রভাবটি বজায় রেখেছেন। তাই আর্যপুরাণে তাঁর যেমন প্রতিষ্ঠা বাংলার লোকজীবনেও তার অনুরূপ প্রভাব বর্তমান। শিব যেন উভয় সমাজের সর্বসাধারণের সমাজ সম্পত্তি। মঙ্গল কাব্যের শিবের এই আত্যন্তিক প্রভাব সমাজের ঘনিষ্টতাকে অধিকতর নিবিড় করে দিয়েছে। অনার্য দেবতাদের আর্য ঐতিহ্য প্রদানের জন্যে সকল মঙ্গল কাব্যের পৌরাণিক খণ্ডে শিবদেবতার অবতারণা। পৌরাণিক সংস্কৃতির সাথে লোক সংস্কৃতির মিলন-পটভূমি রচনায় মঙ্গল কাব্যে শিবের মহান প্রতিষ্ঠা।

সর্বশেষাংশের নাম 'নরখণ্ড'। এই খণ্ডই মঙ্গলকাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ। কোন স্বর্গলোকবাসী এবং বাসিনী কোন বিশেষ মঙ্গল দেবতা কর্তৃক শাপ গ্রস্ত হ'য়ে মর্তে অবতীর্ণ হন এবং উক্ত দেবীর পুজা প্রচার এবং প্রতিষ্ঠা করে স-শরীরে স্বর্গারোহন করেন। এই অংশেই তৎকালীন সমাজ জীবনের ছবি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বারমাস্যা'—নায়ক কিংবা নায়িকা কর্তৃক বার মাসের দুঃখ বর্ণনা—এবং চৌতিশা—বিপদ-গ্রস্ত নায়ক কিংবা নায়িকা কর্তৃক চৌত্রিশ অক্ষরে আলোচ্য দেবতার

স্তবগান—এই অংশের একঅমূল্য সম্পদ। এছাড়াও নায়ক দর্শনে নারীগণের পতিনিন্দা, রন্ধন প্রণালী, কাঁচুলী বা কারুকলা সমৃদ্ধ বক্ষা-বরণ নির্মাণ এই অংশের অপরিহার্য অঙ্গ।

॥ চার ॥

॥ প্রাক্ চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর মঙ্গল কাব্য ॥

বাঙালীর জীবন মরণ সন্ধিক্ষণে বাংলার কোমল বুকে অমৃত বাণী বাহক মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব এক পরমাশ্চর্য ব্যাপার। তিনি বহন করে এনে ছিলেন অসীম মানব-প্রেম আর দ্বেষ বিনির্মুক্ত অভিনব জীবনায়ন। নির্বীর্য, শ্রীহীন, মরণোন্মুখ বাঙালীকে এই প্রেম-সুধা পান করিয়ে তিনি তাদের করে তুলে ছিলেন চিরজীবী। এক বিপুল প্রেমোন্মাদনায় এবং সর্বাত্মক মিলনাকাঙ্ক্ষায় বাঙালীর চিত্ত সেদিন প্রেমের অনির্বান দীপালোকে বহ্নিমান হ'য়ে উঠেছিল। বাঙালী জাতীয় জীবনের ধ্বংসস্তূপের ওপর তাই সেদিন সুরু হয়েছিল মহান সৃষ্টি যজ্ঞের গঠন পরিকল্পনা। জীবনের সর্বদিক দিয়ে এই গঠন ক্রিয়া দুর্বার হ'য়ে উঠেছিল—সাহিত্য, ধর্ম, শিল্প, সমাজ সর্বত্রই ধ্বনিত হয়েছিল এই গঠমান সৃষ্টি যজ্ঞের পদ সঞ্চার। মহাপ্রভুর অবির্ভাবের পূর্বে যে সমাজ কাঠামো চূর্ণপ্রায় হয়ে উঠেছিল—তা, আবার নতুনতর বলিষ্ঠতায় সুদৃঢ় হলো, যে ধর্ম গোঁড়ামীর অতলান্ত অন্ধতায় অধর্ম হয়ে উঠেছিল তা' সর্ব কালিমা বিনির্মুক্ত হয়ে নবীনা লোকে ভাস্বর হ'য়ে উঠ্লো, যে সাহিত্য ছিল অসম্পূর্ণ এবং অশ্লীল তাতে এল মহত্তর সৃষ্টি মহিমার অযুত সম্ভাবনা। মহাপ্রভুর প্রভাবে মঙ্গলকাব্যের সৃষ্টি ধারায় এল অভূতপূর্ব পরিবর্তন। ভাবে প্রকাশ ভংগীতে এমন কী দেব-দেবীর রূপ কল্পনায় এই পরিবর্তন সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো।

ক ॥ মঙ্গল কাব্য সমূহের প্রাচীনতম উদ্ভব হয়েছিল পাঁচালী কাব্যের আকারে। বলাবাহুল্য এ কাব্য ছিল অসম্পূর্ণ। অবশ্য মহা মহাপ্রভুর পূর্বে এ কাব্য

পুর্ণাঙ্গের পথে অগ্রসর হয়েছিল—কিন্তু এ কাব্যের যথার্থ সাহিত্যিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হ'লো চৈতন্যোত্তর যুগে মহাকবি মুকুন্দরামের হাতে। মঙ্গল কাব্যের প্রথম সার্থক শিল্পী মুকুন্দরাম। এই মুকুন্দরামের কবি মানসের ওপর মহাপ্রভুর সুগভীর প্রভাব পড়েছিল এবং একখানি সার্থক শিল্পসমৃদ্ধ মঙ্গল কাব্য লেখার পিছনে এই প্রভাবের মুল্য সুগভীর।

খ॥ মঙ্গল কাব্যের উদ্ভব যুগে (age of orision) এই শ্রেণীর কাব্যের কোন শৈল্পিক রসমণ্ডিত হয়নি। কেননা "রস-সৃষ্টি অপেক্ষা সাম্প্রদায়িক দেবতার সর্বজনীন প্রতিষ্ঠা প্রতিপাদনই এখনো এই শ্রেণীর কাব্য-প্রবাহের প্রধান উদ্দেশ্য ;—আর এই উদ্দেশ্য সাধনের সাহায্যক-রূপে লোক-চিত্তে ভীতি-সৃষ্টি তথা, রুষ্টদেবতার বিভিন্ন রূপ চিত্রনই প্রধান উপায় বলে পরিকল্পিত হয়েছিল। ফলে দেবমূর্তি যেমন সর্বপ্রকাব মহিমা-বর্জিত ভয়াবহ দানবীয়-রূপে প্রতিভাত হয়েছে, মানব-চরিত্রগুলিও হয় মানবতা-বর্জিত দানবীয রূপে (চাঁদ সওদাগর) প্রকাশ লাভ করেছে—নয়ত বা চিত্রিত হয়েছে মেরুদণ্ডহীন যুপকাষ্ঠের সম্মুখীন পশুর আকারে।" চৈতন্যোত্তর যুগের মঙ্গল কাব্য সমূহ এই পটভূমি ও ভাবধারা হ'তে নবীন সঞ্জীবতায় অনবদ্য হয়ে উঠলো। প্রথমে সাম্প্রদায়িকতার কুটিল-জঞ্জাল মঙ্গলকাব্যের গতিপথ হতে মহাপ্রভুর দুকূলপ্লাবী প্রেম-বন্যার দূরপথে ভেসে গেল। নবীন যুগ-চেতনার স্বর্ণ-দ্বারে সাম্প্রদায়িক আর বিশেষ কোন প্রবেশাধিকার রইলো না। ফলে তীব্র- সাম্প্রদায়িক দ্বেষ-সঞ্চারী মঙ্গল-দেব দেবীগণ আপনার সাম্প্রদায়িক গুরুত্ব হারিয়ে কাঙাল হয়ে পড়লো, তাদের গতিবিধি সীমিত হলো কাহিনীর অপ্রধান ভূমিকায়। এই সব দেবদেবীগণকে নেপথ্যালোকে রেখে নাট্য-মঞ্চের পাদ- প্রদীপের তীব্রোজ্বল দৃশ্যাবলীতে, অবতীর্ণ হলো রক্তমাংসের মানুষ—মানুষের বিজয়-গানে মুখর হলো মঙ্গলকাব্য। চৈতন্যোত্তর যুগের কাব্য সমূহ তাই শক্তিমান মানুষের বিজয় অভিযানের চরম আলেখ্য।

॥ গ ॥ প্রধান ভূমিকায় মানবের পদ সঞ্চারে মঙ্গল কাব্যে এল মানব-জীবনের আশা-আকাঙ্খার প্রতিচ্ছবি হ'ল সমাজ-জীবনের রূপায়ণ। এই যুগের মঙ্গল কাব্য-প্রবাহ একধারে জীবন-রস-সমৃদ্ধ এবং আঙ্গিক সু-সম হ'য়ে উঠেছিল; বস্তুতঃ এই যুগের প্রচেষ্টার মধ্যেই মঙ্গল কাব্য-সমুহের সাহিত্যিক সৌন্দর্য সর্বাপেক্ষা বিকশিত হ'য়েছিল। তাই মঙ্গল কাব্যের ঐতিহাসিক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য এই যুগটিকে এই শ্রেণীর কাব্যের 'সৃজন যুগ' (age of creation) নামে অবিহিত করেছেন।

॥ ঘ ॥ চৈতন্যোত্তব যুগের মঙ্গল কাব্যে মানুষের বিজয়-গাথা সূচিত হলেও মনুষ্য চরিত্রগুলি দেব-দেবী বিদ্বেষী নয়। যদিও তারা প্রধান ভূমিকায় আত্ম-প্রকাশ করেছে তথাপি দেব-দেবীর সাথে তাদের এক মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। দেব-দেবীগণ তাদের রুদ্র-ভয়ঙ্কর মূর্তি ত্যাগ করে অনেকখানি মানব-নির্ভব এবং মানবায়িত হয়েছে আর মানব সমাজেও তেমনি আত্ম বিশ্বাসের সুদৃঢ় ভিত্তি ভূমিতে দাঁড়িয়ে দোষ-গুণের সম্মিলনে দেবতায়িত হ'য়ে উঠেছে। দেবতা-মানবে, মানব দেবতায় একাকার হয়ে পরম প্রীতির সম্পর্কে যেন মহাসম্মিলনে এক হয়ে মিশেছে। বস্তুতঃ চৈতন্যোত্তর মঙ্গল-কাব্য-সমূহ মহাপ্রভুর জীবন সাধনা 'দেববাদ নির্ভর মানবতার'ই বাঙ্ময় প্রকাশ।

॥ ঙ ॥ বৈষ্ণব শাস্ত্রে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের দ্বিবিধ মূর্ত্তির উল্লেখ আছে— ঐশ্বর্য মণ্ডিত মূর্তি এবং মাধুর্য-সিক্ত প্রেমাধার। শ্রীচৈতন্য আজীবন ব্যাপী ঐশ্বর্য বিবর্জিত, মাধুর্যের আধার শ্রীকৃষ্ণকেই আরাধনা করবার উপদেশ দিয়েছেন। তাই দ্বিজমাধব মুকুন্দরামের চণ্ডী রণাঙ্গিনী মূর্তি পরিত্যাগ করে অনেকখানি শান্ত এবং স্ব-স্থ হ'য়ে উঠেছেন।

॥ চ ॥ চৈতন্যোত্তর মঙ্গলকাব্য সমূহের ভাষা এবং ছন্দ আশ্চর্য রকম উন্নত। অশ্লীলতা-মুক্ত নমনীয় ভাষায় কাব্য-সমূহের অন্তর্নিহিত ভাবধারা অনবদ্য হ'য়ে উঠেছে।

॥ ছ ॥ প্রাক-চৈতন্য যুগের মঙ্গল কাব্যগুলি সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধির তীব্রতার জন্যে Communal Poetry-র অন্তর্গত আর এই সাম্প্রদায়িক ভেদ-বিভেদের তীরভূমি হতে সরে এসে চৈতন্যোত্তর যুগের মঙ্গলকাব্যগুলি উদার মানবিকতার পটভূমিতে হয়ে উঠেছে সার্থক জাতীয় কাব্য—National Poetry.

॥ পাঁচ ॥

॥ মঙ্গল কাব্যের যুগ-বিভাগ এবং পতনের কারণ ॥

মঙ্গল কাব্যের কাল সীমা এবং পরিচয় প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় বলেছেন: "খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী" হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে কবি ভারতচন্দ্রের কাল পর্যন্ত বঙ্গসাহিত্যে যে বিশেষ একপ্রকার সাম্প্রদয়িক (Sectarian) সাহিত্য প্রচলিত ছিল,—তাহাই বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাসে মঙ্গল কাব্য নামে পরিচিত।" অবশ্য এই কাল-পরিধির পূর্বে ও পরে যে মঙ্গল কাব্য রচিত হয়নি তা' নয়—তথাপি এই যুগটাই হ'ল প্রকৃত মঙ্গল কাব্যের যুগ। এই যুগের মধ্যেই মঙ্গল কাব্যের উৎপত্তি, বিকাশ এবং পূর্ণ পরিণতি। মঙ্গল কাব্যের ক্রম বিকাশের ধারাটি গভীর ভাবে অনুধাবন করে শ্রদ্ধেয় আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় এই যুগটিকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন:

১ ॥ উদ্ভব যুগ—Age of Origin—কাল-সীমা খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী।

২ ॥ সৃজন-যুগ—Age of Creation—কাল-সীমা পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দী।

৩ ॥ ঐশ্বর্য-যুগ—Age of glory—কাল-সীমা অষ্টাদশ শতাব্দী।

এখন প্রতিটি যুগ সম্পর্কে মোটামুটি একটা আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথমেই উদ্ভব যুগের আলোচনা। এ প্রসঙ্গে একটি কথা স্পষ্ট করে

স্বীকার করে নেওয়া প্রয়োজন—কয়েকটি বিক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি এবং বিচ্ছিন্ন পদ ছাড়া এই যুগের সাহিত্য প্রচেষ্টার কোন সম্পূর্ণ গ্রন্থ-নিদর্শন পাওয়া যায় না। সুতরাং উদ্ভবেই যে পরিণতির সম্ভাবনা কতটা ছিল তা' নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। মঙ্গল কাব্যের যে তিনটি শাখা বিশেষ রূপে বলিষ্ঠ এবং প্রাণস্বরূপ সেই তিনটি শাখা-কাব্যেরই—অর্থাৎ মনসা-মঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল এবং ধর্মমঙ্গল—বিপুল সম্ভাবনার বীজ এই যুগেই রোপিত হ'য়েছিল। মনসা-মঙ্গল কাব্যের সূচনা যে এই যুগেই হ'য়েছিল তার প্রমাণ পাই পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পাদে মনসা-মঙ্গলের বলিষ্ঠ কবি বিজয়গুপ্তের কাব্যে। তিনি তাঁর কাব্যে মনসা-মঙ্গলের আদি কবি কানা হরি দত্ত সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন ঃ

> মূর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য।
> প্রথমে রচিল গীত কানা হরি দত্ত॥
> হরিদত্তের যত গীত লুপ্ত হইল কালে।
> যোড়া গাঁথা নাহি কিছু ভাবে মোরে ছলে॥

এই রূঢ় মন্তব্যে বিজয়গুপ্তের আত্মম্ভরিতা প্রকাশ পেয়েছে। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় সম্পাদিত "বাইশা"-য় কানা হরি দত্তের যে পদ দুটি সংকলিত হ'য়েছে তা'তে কবির যে কাব্য-শক্তি এবং বিশেষরূপে পাণ্ডিত্য প্রকাশ পেয়েছে তা' স্মরণ করে কবিকে কোনক্রমেই মূর্খ বলা চলে না। তা' ছাড়াও কবির কাব্য যে বিজয় গুপ্তের সময় লুপ্ত হয়নি তা' বেশ বোঝা যায় কেননা স্বয়ং বিজয় গুপ্তই কানা হরি দত্তের বহুপদ আত্মসাৎ করেছেন। সে যাই হোক বিজয় গুপ্তের এই আত্ম-প্রচার-ধর্মী মন্তব্যে আমরা যতই ক্ষুব্ধ হই না কেন লাভবান হ'য়েছি তার থেকে অনেক বেশী। এই পদ থেকেই আমরা জানতে পেরেছি যে বিজয় গুপ্তের পুর্বেই হ'য়েছিল মনসা-মঙ্গল কাব্যের উদ্ভব এবং তার রচয়িতা ছিলেন মূর্খ (?) কানা হরি দত্ত।

অনুরূপে আমরা চণ্ডী মঙ্গলের আদি কবি (?) মানিক দত্তের সন্ধান পাই মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর কাব্যে। ষোড়শ শতকের শেষ পাদে চণ্ডী-

মঙ্গল কাব্য রচনায় ব্যাপৃত হ'য়ে তিনি তাঁর পূর্ববর্তী কবি মানিক দত্তের প্রতি মুগ্ধ-মনের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন ঃ

মানিক দত্তেরে বন্দোঁ করিয়া বিনয়।
যাহা হইতে হইল গীত-পথ-পরিচয়॥

কবি ঘনরাম চক্রবর্তীকেও ধন্যবাদ। তাঁর কৃতজ্ঞতা নিবেদনের মাঝেই আমরা জান্‌তে পেরেছি ধর্মমঙ্গলের আদি কবি ময়ুর ভট্টের নাম। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনায় নিমগ্ন হ'য়ে তিনিও শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তাঁর পূর্ববর্তী কবিকে ঃ

ময়ুর ভট্টেরে বন্দি সঙ্গীত আদ্য কবি।

এখানে একটি বিষয় বিশেষ রূপে লক্ষণীয়। বিজয় গুপ্ত, মুকুন্দরাম এবং ঘনরাম সকলেই তাঁদের পূর্ববর্তী কবিকে স্মরণ করেছেন কিন্তু এই স্মরণ করার মধ্যে সুরের পার্থক্য সহজেই ধরা পড়ে। বংশী দাসের স্মরণে প্রকাশ পেয়েছে আত্মম্ভরিতা, মুকুন্দরাম-ঘনরামের স্মরণে প্রকাশিত হ'য়েছে শ্রদ্ধা যেন আত্ম-নিবেদন। কবি-মনের এই পরিবর্তন সম্ভব হ'য়েছে মহাপ্রভুর কূলপ্লাবী প্রেম-ধর্ম প্রচারের প্রেম-বন্যায়। প্রাক্-চৈতন্যযুগের কবি বিজয় গুপ্ত যেখানে রূঢ়, চৈতন্যোত্তর যুগের কবিদ্বয় সেখানে বিনয়-নম্র।

আমরা পুর্বেই বলেছি উদ্ভব-যুগের কাব্যের কোন সুস্পষ্ট এবং সুসম্পূর্ণ নিদর্শন পাওয়া যায় না। মনসা-মঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, এবং ধর্মমঙ্গল কাব্যের সূচনা এ যুগে হ'লেও এর সাহিত্য-মূল্য নির্ণয় করা সম্ভব নয়।

উদ্ভব যুগের পর সৃজন-যুগের আলোচনা। প্রকৃত পক্ষে এই যুগেই হ'য়েছে মঙ্গল কাব্য সমূহে বলিষ্ঠ যৌবন-সঞ্চার। মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন শাখার বিভিন্ন আখ্যায়িকাগুলি এই যুগেই একটি নির্দিষ্ট গতিধারায় এবং স্বরূপ-স্বাতন্ত্র্যে বিকশিত। উদ্ভব-যুগের বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন ঘটনা এবং প্রচলিত আখ্যায়িকাগুলি এই যুগেই একটা নির্দিষ্ট কাহিনী ধারায় গ্রথিত হ'য়ে

বলিষ্ঠ রূপ লাভ করেছে। শুধু কাহিনীর পূর্ণ স্বরূপ বিকাশের জন্য নয়, উপরন্তু মঙ্গল কাব্যের বিভিন্ন শাখার সকল বলিষ্ঠ কবিগণই এই যুগে আবির্ভূত হ'য়ে মঙ্গল কাব্যের পরিমাণ এবং প্রসারকে সুদূর বিস্তারিত করে দিয়েছেন। মনসা-মঙ্গলের কীর্তি-খ্যাত কবি বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব এবং দ্বিজ বংশীদাস এই যুগেই কাব্য-সাধনায় ব্যাপৃত ছিলেন। দ্বিজমাধব, মুকুন্দরাম ইত্যাদি চণ্ডীমঙ্গলের তথা মঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ শিল্পীগণ এই যুগেই আবির্ভূত হন। মাণিক গাঙ্গুলী, খেলারাম ইত্যাদি কবি-শিল্পীগণ এই যুগেই বাণী-বন্দনায় মনোনিবেশ করে ধর্ম-মঙ্গল কাব্যের বলিষ্ঠ বুনিয়াদ গঠন করেন। এমনি ভাবে প্রতিভা-দীপ্ত কবিকুলের পদসঞ্চারে মঙ্গল-কাব্যের সকল ধারাই বিকাশের উচ্চ-গ্রাম স্পর্শ করে। তা' ছাড়া এই যুগেই মঙ্গলকাব্য সমূহের মধ্য দিয়ে উচ্চতর সমাজের সাথে লৌকিক গণজীবনের মধ্যে সমন্বয়-সেতু গঠিত হয়। পূর্বে উচ্চতর সমাজের অধিবাসী লৌকিক দেব-দেবীর কীর্তি-আলেখ্য মঙ্গল-কাব্য সমূহকে বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখ্‌তে পারতেন না, পুরাণের দেব-দেবী, আখ্যায়িকা এবং কাহিনীতেই ছিল তাঁদের অবিচল নিষ্ঠা। তাই এই যুগের বিভিন্ন মঙ্গল-কাব্যের কবিগণ আশ্চর্য্য-কৌশলে লৌকিক কাহিনীর অন্তরালে পৌরাণিক দেবদেবীর মহিমা প্রচার করে মঙ্গল-কাব্য সমূহকে আভিজাত্য দান করেন। পৌরাণিক আখ্যায়িকা-ধর্মী হ'য়ে মঙ্গলকাব্য তখন সর্বশ্রেণীর উপযুক্ত হ'য়ে ওঠে। সৃজন-যুগে মঙ্গলকাব্য সমূহের এই বলিষ্ঠ রূপায়ণের মধ্যেও ছিল দুর্বলতা। মঙ্গলকাব্যের মধ্যে তখন প্রাণ ছিল ভংগী ছিল না, রস ছিল—রূপ ছিল না। অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য্যের ভাষায় "তখনও ইহারা ভাষায় এবং কল্পনায় সম্পূর্ণ গ্রাম্যতা মুক্ত হইয়া সাহিত্যিক সমুন্নতি লাভ করিতে পারে নাই।" এই সাহিত্যিক সমুন্নতি লাভের জন্য, ভংগী এবং রূপের জন্য মঙ্গল-কাব্যকে আরো কিছুকাল অপেক্ষা করতে হ'য়েছিল। অবশেষে মঙ্গল-কাব্য কাঠামোর ওপর বিপুল বর্ণালীর অপূর্ব দীপ্তি ঝলকিত হ'য়ে উঠেছিল ঐশ্বর্যমান কবি ভারতচন্দ্রের হাতে।

ঐশ্বর্যযুগের শক্তিমান কবি ঘনরাম চক্রবর্তী এবং ভারতচন্দ্র। এঁদের মধ্যে আবার বিন্যাস-ভংগীতে এবং অলংকার-নিপুণতায় ভারতচন্দ্র সর্বশ্রেষ্ঠ। বস্তুতঃ সুচিক্কণ বাণী-বিন্যাসে এবং উপমা-উৎপ্রেক্ষার যথাযথ প্রয়োগে ভারতচন্দ্রের মত শিল্পী বিরল-দৃষ্ট। এজন্যেই বুঝি ভারতচন্দ্রের কাব্যকে 'রূপের তাজমহল বলা হ'য়েছে। "এই যুগে সেই একই বিষয়-বস্তুর উপরই শব্দ-ঝংকার ও রচনা-পরিপাট্য মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে এক কৃত্রিম বাহ্য সৌন্দর্যের সৃষ্টি করিল।....এই যুগেই সর্বপ্রথম বঙ্গ-সাহিত্য কি ভাষায়, কি ভাবে গ্রাম্যতা মুক্ত হইল। ঘনরাম চক্রবর্তী, ভারতচন্দ্র রায় এই যুগের স্রষ্টা। বিষয়-বস্তুর দিক দিয়া এই যুগের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিবার প্রয়াস হয় নাই, কিন্তু চরিত্রগুলিকে অভিনব রূপদান করিয়া কাব্যদেহের অলংকার সজ্জার যে নিপুণ ব্যবস্থা হইল, তাহা সমগ্র মধ্য-যুগের সাহিত্যের এক অতি মূল্যবান সম্পদ হইয়া রহিল।" ঐশ্বর্য যুগের এতসব ঐশ্বর্যের কথা স্বীকার করে নিয়েও এযুগ সম্পর্কে কিছু বলার আছে। প্রথম এবং সর্বপ্রথম কথা হ'ল এ যুগের কাব্য 'প্রাণ' হ'তে সরে এসেছিল। কেবল ভংগীর বিন্যাসেই আদর্শ কাব্য হয় না। আদর্শ কাব্য-সৃষ্টির জন্যে চাই প্রাণ এবং ভংগীর সুন্দর-সমন্বয়। কিন্তু এ যুগের কাব্য ভাব হ'তে সরে এসে কেবল বাক্-সর্বস্ব হ'য়ে উঠেছিল। রূপ আছে কিন্তু লাবণ্য নেই। নয়ন ধাঁধায় কিন্তু মন ভেজে না। শব্দাড়ম্বর এবং অলংকার-প্রবণতায় কেবল একটা নিরস রূঢ় কাঠিন্যই চোখে পড়ে। পুর্বকার কবিদের আত্মবিভোরতা এযুগের কবিদের নেই। সেই সরল সহজ ভংগীর রেখা-বিন্যাসে যে কাব্য আমাদের হৃদয় স্পর্শ করতো এ যুগের কাব্যে তার অভাব একান্ত ভাবে পরিলক্ষিত হয়। রাজকীয় পরিবেশে ঝাড় লণ্ঠনের সুতীব্র আলোকচ্ছটায় নিভৃত পল্লীর দেউলের নির্মল দীপালোকের সম্ভ্রম বিনষ্ট হয়েছে। তা' ছাড়া এযুগের বড় দোষ অশ্লীলতা। ভারতচন্দ্র তাঁর বিদ্যাসুন্দরে (কিছুটা অন্নদামঙ্গলেও) যে উন্মুক্ত কেলি-বিলাস-চিত্র অঙ্কন করেছেন তার সমকক্ষ অশ্লীলতা কেবল মধ্যযুগে কেন সমগ্র বঙ্গসাহিত্যে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ছাড়া

আর কোথায়ও নেই। তথাপি এ যুগের কাব্য অলংকার-সর্বস্ব হ'য়ে যে বাংলা সাহিত্যের বড় একটা অভাব পুরণ করেছে সে বিষয়ে সন্দেহ আরোপ করা যায় না।

অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় মঙ্গলকাব্যের যে তিনটি বিভাগ করেছেন তার সাথে আমরা আ⁻ একটি যুগ জুড়ে দিতে চাই—পতন যুগ বা age of downfall. বস্তুতঃ ঐশ্বর্য যুগটিকেই পতন যুগ বলা চলে। ঐশ্বর্য যুগের মধ্যেই পতনের সকল কিছু চিহ্নিত হ'য়ে আছে। সংক্ষিপ্তাকারে এখন আমরা মঙ্গল কাব্যের বিলুপ্তির কারণগুলি আলোচনা করব। পূর্বের আলোচনায় আমরা দেখেছি ঐশ্বর্য-যুগের কবিদের হাতে মঙ্গল কাব্যের প্রাণ শুকিয়ে গেছে। প্রাণের বদলে এসেছে তার বহিরাবরণে অলংকার সুষম দীপ্তি। প্রাণ হ'তে সরে এসে কোন কাব্য কেবল চাকচিক্য নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে না। তাই দেখি এই যুগে দুর্গামঙ্গল, কালিকামঙ্গল, শিবমঙ্গল ইত্যাদি নামে যে সকল মঙ্গলকাব্য রচিত হ'য়েছে তাদের একটিকেও সঠিক মঙ্গলকাব্যের এলাকা-ভুক্ত করা যায় না—না রচনা-রীতির দিক দিয়ে, না কাহিনী-বিন্যাসের দিক দিয়ে। অধিকাংশই পূরাণের ভাষানুবাদ মাত্র। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ঐশ্বর্য-যুগের কবিদের হাতে মঙ্গল কাব্যের উৎসমূল এবং প্রাণাবেগ শুকিয়ে এসেছিল। এ ছাড়াও আছে রাজনৈতিক অভিসম্পাত। ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর তিন বছর পুর্বে ইংরেজরা পলাশীর যুদ্ধে জয়ী হ'য়ে এদেশে নিজেদের অধিকার পাকা করে নিয়েছে। তাদের প্রতিষ্ঠায় বাঙালীর জাতীয় জীবনে এসেছে নবজাগরণ। পাশ্চাত্য নাগর-সভ্যতার উজ্জ্বল আলোক এদেশের সামাজিক কাঠামোয় ভাঙন ধরিয়েছে। গোষ্ঠী-চেতনার বদলে এসেছে ব্যষ্টি-চেতনা। মঙ্গলকাব্য একান্তভাবে গোষ্ঠী-চেতন-সম্ভূত কাব্য—ব্যষ্টি-সর্বস্ব মন নিয়ে তার সৃষ্টি অসম্ভব। সুতরাং সামাজিক এই পরিবর্তন মঙ্গলকাব্যের পতনের আর একটি উল্লেখযোগ্য কারণ। তা'ছাড়া পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাবে আমাদের মন আবেগ-বহুল অন্ধ ভক্তি-বিশ্বাসের পথ পরিত্যাগ করে বুদ্ধি-বিবেচনার পথে

অগ্রসর হ'য়েছিল। এবং বিজ্ঞান সম্মত দৃষ্টি দিয়ে দেখ্‌লে বিবিধ মঙ্গলকাব্যের কাল্পনিক দেবদেবীগণের মূর্তির ভিত্তিমূল অনেকখানি শিথিল হ'য়ে পড়ে, কেবল শিথিল নয় বুদ্ধির পথ অগ্রসর হ'য়ে কোন সুস্থ মানুষের পক্ষে মঙ্গল দেব-দেবীগণের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব হ'যে পড়ে। পাশ্চাত্য সভ্যতাব আলোকে এইভাবে আমাদেব মত-বিশ্বাস আমূল পরিবর্তিত হওয়ায অন্ধ আবেগের উপর প্রতিষ্ঠিত মঙ্গল কাব্য সমূহেব ধ্বংস অনিবার্য হ'য়ে ওঠে। এ ছাড়াও এই সংকট-মুহূর্তে ভারতচন্দ্রেব মৃত্যুর পব কোন উল্লেখযোগ্য কবি প্রতিভারও আবির্ভাব ঘটেনি। শ্রদ্ধেয় আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় তাই যথার্থই মন্তব্য কবেছেন, সে "যুগে মঙ্গলকাব্য-বচনার শিল্পগুণ বৃদ্ধি পাইলেও অন্তরের দিক দিয়া ইহার দৈন্য দেখা দিযাছিল—ইহাব বহিরঙ্গের রসপুষ্টি ইহাব ইহার অন্তরগত ভাব-দৈন্য কিছুতেই ঘুচাইতে পারে নাই। অতএব, রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থাব পবিবর্তন সাধিত না হইলেও মঙ্গল-কাব্য অধিক অগ্রসব হইবাব প্রাণশক্তি ইতি মধ্যেই হারাইযা ফেলিয়াছিল সুতরাং ইহাব বিনাশ সকল দিক হইতেই অনিবার্য হইযা উঠিয়াছিল।"

॥ ছয় ॥

॥ নারায়ণ দেবের চাঁদ-চরিত্র ॥

বাংলা সাহিত্যে কোন বিরাটকায় পৌরুষোজ্জ্বল ধীবোদ্ধত চবিত্র নেই বলে একটা আক্ষেপ চিরদিন সমালোচক-কণ্ঠে ধ্বনিত হ'যেছে। প্রথম দিকে সমালোচকগণেব কণ্ঠের সাথে আমরাও কণ্ঠ মিলিয়ে দিয়েছিলাম—কেননা বাংলা সাহিত্যে যে ক'টি বীব চরিত্রের সাথে তখন পরিচয় ছিলাম তাঁদের একটিও সার্থক নয়। মেঘনাদে বীরত্ব-সৃষ্টির যথেষ্ট আয়োজন আছে কিন্তু তা' অনেকাংশে ব্যর্থ, শৌর্য-দীপ্ত রাবণও শেষ পর্যন্ত অক্ষমতার গ্লানিতে ম্লান, গোরা আদর্শবাদী—ফলে পঙ্গু—এরপর নিখিল

বাংলা সাহিত্যের আর কোথাও বীর্য-দীপ্ত পৌরুষের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ মেলে না। কিন্তু যে দিন সর্বপ্রথম 'প্রাগৈতিহাসিকে'র ভিখুর সাথে পরিচিত হলাম সেদিন এই বিশ্বাসের ভিত্তিমূল অনেকখানি শিথিল হয়ে গেল। ভিখুর মধ্যে যে আদিম শক্তির বহিস্ফুরণ ঘটেছে তা' কেবল অনবদ্য নয়—অভিনব। চাঁদ সওদাগরে এই অভিনবত্বের চরম প্রকাশ। বাংলার বিদ্রোহী দুলাল "শির নেহারি আমারি নত শির ঐ শিখর হিমাদ্রীর" ব'লে পৌরুষ চরিত্রের যে দীপ্ত ঘোষণা করেছেন চাঁদ সওদাগরের অটল চরিত্র সেই নির্ভিকতারই পরিচয়-বাহী। চাঁদ সওদাগরের মত শৌর্য-মণ্ডিত অনবদ্য চরিত্র বাংলা কাব্যে নেই—মার্লোর টেম্বারলন এবং গ্যেটের ফাউষ্ট চাঁদের একমাত্র তুল্য প্রতিযোগী।

সেই আদিম যুগে যখন দেবদেবীর চরণ-প্রান্তে যূপকাষ্ঠের সম্মুখে মেরু-দণ্ডহীন পশুর মত মানবের দিতে হ'তো আত্মাহুতি সেই যুগে চাঁদের মত একজন grand fellow—সাবাস পুরুষের কল্পনা করাও আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য। চাঁদ কোন দিন কোন ঘটনাতেও পরাজয় স্বীকার করে নি। দেবী মনসার সকল চক্রান্ত, সকল প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে, সকল বিপদ-ঝঞ্ঝা অতিক্রম করে চাঁদ আপনার মস্তক উর্দ্ধোত্থিত করেছেন। এখানে চাঁদ নির্বিচার এবং যথেচ্ছ দৈবী-লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে নিপীড়িত মানবী-শক্তির গৌরবোজ্জ্বল প্রতীক।

চাঁদ সওদাগর শিবের পরম ভক্ত। মনসা স্বীয় পূজা প্রচারের জন্যে যখন বার বার চাঁদের নিকট হ'তে প্রত্যাখ্যাত হ'লেন তখন তীব্র প্রতিশোধ গ্রহণে তিনি হ'লেন বদ্ধ পরিকর। নীচ প্রতিহিংসার বশবর্তী হ'য়ে দেবী মনসা ঘৃণ্য আচরণে নন্দন-কানন-তুল্য চাঁদের গুয়াবাড়ী ধ্বংস করলেন। এরপর সামান্য মানুষকে বশীভূত করতে গিয়ে দেবী মনসা বুঝি নীচতা ও হীনতার শেষ স্তর অতিক্রম করে গেলেন। সর্পাঘাতে রাজ্যের নরনারী প্রাণ হারাতে লাগ্‌লো কিন্তু চাঁদের বন্ধু শঙ্কর গারড়ী সর্পদংশনে মৃত ব্যক্তিদিগকে পুনরায় জীবন দান করলেন। ফলে মনসার সকল নীচ প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হ'লো।

এরপর মনসা প্রতিহংসায় জান্তব-রূপ ধারণ করলেন। কৌশলে শঙ্কর গারড়ীর স্ত্রীর নিকট হ'তে গারড়ীরি মৃত্যুর উপায় জেনে তিনি তাকে হত্যা করলেন। চাঁদের দক্ষিণ হস্ত কাটা গেল। প্রতিহিংসা পরায়ণা দেবী এখানেও থাম্‌লেন না। চাঁদকে ছলনা করে তিনি তাঁর মহাজ্ঞান হরণ করলেন। এরপর চাঁদের ওপর এল প্রচণ্ডতম আঘাত। খাদ্যে বিষ মিশ্রিত করে চাঁদের ছয় পুত্রকে হত্যা কবতেও নির্লজ্য দেবীর নীচতায় বাধলনা। কিন্তু তবুও চাঁদ আপন পৌরুষের, আপন আত্মবিশ্বাসের সুদৃঢ় ভিত্তিভূমি হ'তে বিচ্যুত হলেন না। স্বপ্নে মনসা চাঁদকে তাঁর পুজা করতে আহ্বান করলেন, স্ত্রী সনকা অশ্রুসজল চোখে স্বামীকে দেবীর পুজা করতে অনুরোধ জানালেন—কিন্তু পুজা তো দূরেব কথা, লাঠির আঘাতে চাঁদ দেবীর কাঁকলী ভেঙে দিলেন। অত্যাচাবীর পদ-প্রান্তে মস্তক অবনত কবা চাঁদ-স্বভাবেব বিরুদ্ধ, এখানেই সে বিক্ষুব্ধ, লাঞ্ছিত, জাতীয মনুষ্যত্বেব প্রথম উদ্বোধক।

এরপব নতুন করে পট উন্মোচিত হয—দেবীব নীচ মনোবৃত্তিব মাঝে চাঁদের হিমাদ্রী-বিশাল রূপ অধিকতব ঔজ্জ্বল্যে ভাস্বব হ'য়ে উঠে। তাঁব চৌদ্দ ডিঙা সমুদ্রের অতলে তলিয়ে গেছে, লখীনদর মারা গেছে, মৃত পতীকে নিয়ে পুত্রবধূ বেহুলা চলে গেছে কোন অজানা দেশে। চাদেব অন্তর্লোক ঘিবে দুঃখ-শোক, ব্যাথা-বেদনাব প্রচণ্ড ঘুর্ণিবাতা বয়ে চলেছে অবিরাম। এক দিকে পুত্র-শোকের প্রচণ্ড আঘাত অপব দিকে ধৈর্যের চরম পরীক্ষা। লখীন্দরকে জলে ভাসিয়ে দিয়ে চাঁদেব মনোরাজ্যে যে একটা প্রচণ্ড সংগ্রাম চলেছে তা নারায়ণ দেব নিপুণ তুলিকায় ফুটিযে তুলেছেন।

অসংখ্য ঘটনা প্রবাহের পর চাঁদ কর্তৃক মনসা-পুজা সুসম্পন্ন করাবাব অঙ্গীকারে বেহুলা একক মানবী শক্তি দ্বারা জয় করে ফিরিয়ে এনেছে মৃত স্বামী লখীন্দর, ছয় ভাসুর চৌদ্দ ডিঙা। চাঁদ যদি একটি বারের জন্যে মনসার পুজা করেন তা হ'লে সব কিছুই ফিরে পান। কিন্তু তবু ও প্রজাবর্গ, জ্ঞাতি, বন্ধু-বান্ধব, স্ত্রী-পুত্রবধূ সকলের মিলিত অনুরোধ,

সকলের অশ্রু সজল প্রার্থনা তিনি উপেক্ষা করেন। তাঁর উচ্চশির কখনো মনসার পদতলে লুণ্ঠিত হ'বে না। তিনি দীপ্ত-কণ্ঠে ঘোষণা করেন ঃ

শিবলিঙ্গ আমি পূজি যেই হাতে।
সেই হাতে তোমারে পূজিতে না লয় চিতে॥

এখানে চাঁদ যেন সমসাময়িক নিপীড়িত যুগ-চেতনার বহিঃপ্রকাশ। কোন কিছুই তাঁকে অটল সংকল্প হ'তে বিচ্যুত করতে পারে না। নব-জীবন-বোধের 'তোরণ দ্বারে তিনি যেন বন্ধনমুক্ত প্রমিথিউস ঃ যে অগ্নি-শিখার আলোকে প্রোজ্জ্বল হ'বে নব জীবনের তিমিরাভিসার তিনি যেন তাঁর প্রথম অগ্নি হোত্রী।' তাঁর পদতলে দেবীর সকল নীচ প্রতিহিংসা প্রবণতা, সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হ'য়ে গেছে। দেবী এখানে মানুষের কাছে পরাজিতা—কাঙাল। চাঁদের মানবিক-বোধ তাঁর মহান নিষ্ঠা দেবীর অভিমান ও প্রতিজ্ঞার মর্ম্মমূলে আঘাত হেনেছে। মানবিকতার বিজয়-পতাকা উড্ডীন করে চাঁদ তার আপন সংকল্পে নিশ্চল।

নতুন করে আবার সকলে চাঁদকে বোঝান। কেবল একটি বার মাত্র পূজা করলেই তিনি সব কিছুই ফিরে পাবেন। নতুন করে চিন্তা করেন চাঁদ—"সহসা তাঁহার চোখের সম্মুখে অসহায়া বেহুলার সেই দিনকার মুখখানি জাগিয়া ওঠে—তাঁহার নিকট বেহুলা তখন আর তাঁহার পুত্রবধূ নহেন, ব্যথিত মানবাত্মার প্রতীক মাত্র।" মানব-শক্তি-পুজারী মানবাত্মার এই করুণ ক্রন্দনকে উপেক্ষা ক'রতে পারলেন না। বন্ধু-বান্ধবের অশ্রুসজল সরব আহ্বানে যা হয়নি—ব্যথিত মানবাত্মার নীরব ক্রন্দনে তাই হ'লো। অবশেষে চাঁদ সহজাত শক্তির উদ্দাম প্রবাহে শির উঁচু রেখে বাম হস্তে মনসার পুজার জন্য একটি ফুল দিতে স্বীকৃত হ'লেন ঃ
'পিছ দিআ বাম হাতে তোমারে পুজিব।'

একটি ফুলের পুজায় যদি একটি অসহায়াবালিকার অন্তর ব্যাপী বেদনার লাঘব হয়—সে পুজা কখনো চাঁদের কাছে উপেক্ষণীয় নয়। কেননা এ তো দেবীর পুজা নয়—এ যে মুক্তিকামী মানবাত্মার পূজা। পিছন

ফেরা বাম হস্তের এই অবহেলা ও ঘৃণার পূজাতেই কাঙাল দেবী কৃতার্থ। এ যেন দেবী কর্তৃক চাঁদের অটল পৌরুষের মশাল উত্তোলন। কেবল বাম হস্তের পূজা নয়—চাঁদ দেবীর প্রতি নির্দেশ-প্রদান স্বরে ঘোষণা করেন ঃ 'আমার নাম চাঁদোয়ায় তোমার মাথার উপরে টাঙিয়ে রাখ্‌লে তবে পুজো পাবে।' ভিক্ষারিণী দেবীর কাছে এই তো সহস্র-কোটী মুক্তা। অতএব সানন্দে স্বীকৃতি দান করলেন। চাঁদের পৌরুষ-দীপ্ত সুমহান মানবিক বোধের কাছে দেবীত্ব খণ্ডিত ও ম্লান। দেবীর শত আঘাতেও চাঁদের বল-দীপ্ত আদিম পৌরুষের কণামাত্র ছিন্ন হয়নি।

মৃত-পতিসহ দেবপুর গমনার্থিনী বেহুলার জন্যে কলার ভেলা রচনার প্রস্তাব মাত্রেই চাঁদ ক্রোধান্ধ হন। কিসের জন্যে এই ভেলা রচনা, পুত্র গিয়েছে যাক, তা'হলে কলার ভেলায় করে গিয়ে দেবীর পায়ে ধরে পুত্রের জীবন ভিক্ষাতে তাঁর মানসিক অতৃপ্তি বেড়েই যাবে। তিনি পরাজিত হ'তে পারেন না, উর্দ্ধোত্থিত মস্তক অবনমিত করা তার স্বভাব নয়। ভেলা তৈরীর জন্যে কলাগাছ কাট্‌লে যে আর্থিক ক্ষতি হ'বে তার জন্যে তিনি বলেন ঃ

> ....এক দুঃখ মৈল সাত বেটা।
> তাহা হইতে অধিক দুঃখ কলা জাইব কাটা॥

এই তো আদিম মানুষের চরিত্র! অবশ্য আধুনিক কালে শোকার্ত-পিতৃত্বের এই প্রকাশ অমানুষিক এমন কী বর্বর বলেও প্রতিভাত হতে পারে "তবুও স্মরণরাখা উচিত, ব্যক্তি চরিত্রের নিরাবরণ, নিরাভরণ প্রকাশজাত এই বর্বরতা আদিম মনুষ্যত্বের সাধারণ লক্ষণ,—আর এই সাধারণ পরিচয়কেই কবি নারায়ণ দেব অসাধারণ নিষ্ঠার সঙ্গে উদ্ধার করেছেন।" তাই চাঁদ চরিত্রের এই বজ্রকঠোর ব্যক্তিত্বকে শ্রদ্ধাচিত্তেই প্রণতি জানাতে হয়। "শোকে উন্মাদ, প্রতিহিংসায় অসুর-বলধারী, স্বার্থে সংকীর্ণ-চিত্ত—কিন্তু সর্বত্রই স্ব-প্রকাশ-মানবতার মহিমায় ভাস্বর; —সার্থক মহাকাব্যিক নায়ক [Epic Hero]।"

নারায়ণ দেবের পরিকল্পনায় যে চাঁদকে আমরা পেলাম—বাস্তবিক কেবল প্রাচীন কেন আধুনিক যুগেও অমন ধীরোদাত্ত মনুষ্যত্বের মহিমায় সমুদ্ভাসিত, পরম-পৌরুষ-প্রদীপ্ত চরিত্রের সাথে আমাদের বড় একটা সাক্ষাৎ হয় না। চাঁদ সওদাগর যেন দেববাদ বিনির্মুক্ত মানবতা জাগরণ-যজ্ঞশালার বিদ্রোহী বিশ্বামিত্র—দেবীর সকল চক্রান্তকে ভেদ করে তিনি করেছেন মানবী শক্তির চিরন্তন প্রতিষ্ঠা

॥ সাত ॥

॥ চণ্ডীমঙ্গলের সামাজিক চিত্র ॥

সাহিত্য মানব-জীবনের রূপালেখ্য। সমাজকে ঘিরেই মানব-জীবনের হয় ক্রমবিকাশ তাই মানব-জীবনের বর্ণনায় অনিবার্য কারণে সামাজিক-জীবন-প্রতিচ্ছবির ছায়াপাত ঘটে। তা ছাড়া যিনি সাহিত্য রচনা করেন তিনিও একজন সামাজিক ব্যক্তি তাই সাহিত্যের মধ্যে জ্ঞাতে অজ্ঞাতে নানা ভাবে সমাজের কথা অনুপ্রবিষ্ঠ হয়। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থ দ্বিজমাধবের "মঙ্গলচণ্ডীর গীতে"ও পাই সমাজ-চিত্রের এক অত্যুজ্জ্বল রূপায়ণ। অতীত-যুগের বাংলাদেশের সমাজ-জীবনের এক বিরাট অধ্যায় আপন মহিমায় আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

"মঙ্গলচণ্ডীর গীত" এ দুটি পৃথক কাহিনী স্থান পেয়েছে—একটি ব্যাধ কালকেতুর কাহিনী অপরটি সওদাগর ধনপতির কথা। প্রথম কাহিনীতে ব্যাধ-জীবনের যে চিত্র পাই তা' তৎকালীন সমাজের নিম্নস্তরের অনার্য লোক-জীবনের একাংশের একটি অখণ্ড রূপ—বলাবাহুল্য এ রূপসমাজের একাংশের কিন্তু সমাজের পূর্ণতর রূপ পাই ধনপতির গল্পাংশে। এখানে উচ্চ স্তরের তথা অভিজাত শ্রেণীর জীবন-যাত্রার কথা সুন্দররূপে তুলে ধরা হ'য়েছে।

ব্যাধ জীবনের যে রূপ পাই তা' নিঃসন্দেহে দুঃখজনক। ব্যাধগণ পিতাপুত্রে একসাথে শীকারে যেত এবং যে পশুপাখী শীকার করতো তার মাংস

হাটেবাজারে বিক্রি করে তবে উদরন্নের ব্যবস্থা হ'তো। অধিকাংশ সময়ে ব্যাধ-রমণীরা এই মাংস হাটে বিক্রয় করতো—ফুলরা তার প্রমান। শীকার না পেলে অনাহারে থাকতে হ'তো শীকারীদের। ব্যাধরাও যে বহু বিবাহ করতো এবং স্ত্রীদের মনে যে এ সন্দেহ সর্বদা জাগরূক থাকতো পূর্ণ-যৌবনা দেবীর প্রতি ফুলরার উক্তিতে তার পরিচয় নিহিত রয়েছে। ফুলরার বারমাসী দুঃখ বর্ণনায় যে অপরিসীম অভাব-অনটন এবং বেদন-দাহন নিহিত রয়েছে তা' তৎকালীন সমাজ-জীবনের অর্থ নৈতিক দুর্দশার চরম আলেখ্য।

সহরাঞ্চলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত অসংখ্য নরনারী একসঙ্গে বসবাস করতো। তাদেব ভিতর মিলন ছিল আন্তরিক। একে অপরের সাহায্যের জন্য আস্‌তো এগিয়ে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব বিভেদ-বিরোধ-বিহীন যে জাতীয়-মুক্তির পথ-প্রদর্শন এবং প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন মধ্যযুগের সামাজিক জীবনে তার প্রভাব দুর্নিবাব হ'য়ে উঠেছিল এবং এই সর্বাত্মক মিলন-চিত্র মঙ্গল-চণ্ডীর গীতে অনবত্ব হ'য়ে ফুটেছে। পূর্বে ব্রাহ্মণ-শূদ্র, হিন্দু-মুস্‌লিমের মধ্যে যে বিরোধ দুরতিক্রমী হ'য়ে উঠেছিল—মহাপ্রভুর আগমনে তা হ'য়েছিল তিরোহিত—তাই বিভিন্ন বৃত্তি নিয়ে একস্থানে বসবাস করতে তাদের কোন্‌ আপত্তি ছিল না। কালকেতু গুজরাটে যে নগর তৈরী করেছিল সেই নগরে তাই নিজ নিজ বৃত্তি নিয়ে একীভূত হতে পেরেছিল ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, কায়স্থ, বণিক, মালী, কুমার, ব্যাধ, চণ্ডাল, তামলী, ধীবর, ডোম, মুসলমান ইত্যাদি বিভিন্ন সম্প্রদায়। তাম্বুলী বিক্রি করে গুয়া পান, মালী রচনা করে পুষ্পমালার পসার, 'মহেরা' সজ্জিত করে মিষ্টান্নের ভাণ্ডার, তাঁতি-নাপিত আপন আপন কাজে ব্যস্ত এমন কি ঘাটে খেয়া দেওয়ার জন্যে পাটনীও প্রস্তুত। মলঙ্গীমুচীও নগরের বিভিন্ন স্থানে উপবেশন ক'রে আপন আপন বৃত্তি অনুযায়ী কাজ-করে। আর মুসলমান ঃ

বৈসয়ে মুসলমান গ্রন্থে কিতাপ কোরান
নমায়াজ পঢ়ে পাঁচবার

সোলেমানী মালা করে খোদার নামে জিগির কাঢ়ে
সৈদ কাজী বোসিল অপার ॥

এখানে সার্বিক মিলনাকাঙ্খার পটভূমিতে "স্মার্ত-পৌরাণিক জাতিভেদ-প্রথার মধ্যে গুণ-কর্মানুযায়ী বিভক্ত সামগ্রিক গোষ্ঠী-চেতনার" যে অসাম্প্রদায়িক রূপ বিমূর্ত হ'য়েছে তা' বাংলার মধ্যযুগীয় সমাজ-ব্যবস্থার এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। তৎকালীন নিখিল বাংলা ব্যাপী স্বয়ং সম্পূর্ণ যে যৌথ-সমাজের সমাজ-ব্যবস্থা ছিল, ব্যক্তি হিসাবে উচ্চ-নীচ সকলেই সেই যৌথ-সমাজের শক্তি-সংগঠনে এক একটি সক্রিয় অনু (Active Unit). কেউ উপেক্ষিত নয়, কেউ অবহেলিত নয়—সকলের সম্মিলিত শক্তি-যজ্ঞে সমাজ-সমুদ্র কল্লোল গানে মুখর হ'য়ে উঠেছিল। এই উদার সমাজ-ব্যবস্থার পিছনে যে চৈতন্য ঐতিহ্য নিরন্তর বেগ সঞ্চার করেছে সে সম্পর্কে আচার্য যদুনাথের সার্থকতম মন্তব্য স্মরণ যোগ্য :

'The new creed (Bengal Vaisnavism propunded by Chaitanya), ...has opened a new life of knowledge and spirituality to the lower castes, and under its life-giving touch they have produced many Vaishnav saints and poets, scholars and leaders of thought. This was not possible in the old days of orthodox Brahmanic domination over society. Thus Vaishnavism has proved the saviour of the poor ; it has proclaimed the dignity of every man as possessing within himself particle of a divine soul (Jivatma),

উদার সামাজিক পটভূমিকায় সব মানুষই যে মনের দিক থেকে উদার হয়ে উঠেছিল সে কথা চলে না। দুষ্ট এবং খল স্বভাব লোকেরও অভাব ছিল না। ভাঁড়ু দত্তের মাধ্যমে তৎকালীন সমাজের শঠতাপ্রবণ চরিত্র-হীন মানুষের এক বিরাট কলঙ্কময় দিক উন্মুক্ত হয়েছে। ভাঁড়ু দত্তকে

নিয়ে আমরা পরে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করেছি বলে এখানে এ সম্পর্কে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

ধনপতি সওদাগারের কাহিনীতে আমরা পাই বৃহত্তর সমাজ-জীবনেব আর একরূপ। ঘর মুখো বাঙালী যে কেবল ঘরের মধ্যেই পড়ে থাক্‌তো তা নয়—বাইরের বিপুল সওদাগরী জীবন যে তাদের আকর্ষণ করতো তার পরিচয় পাই ধনপতি এবং শ্রীমন্তের চরিত্রে। দূব দেশে ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদির মাধ্যমে বাংলার সাথে অন্যান্য দেশের যে একটি সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল এই গ্রন্থেব বহু পৃষ্ঠা ব্যাপী তাব পরিচয বয়েছে। এই সময় বাণিজ্য চলতো তা' বিনিময় (Barter) প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল—এবং এ বাণিজ্য ছিল উপকূল বাণিজ্য costal trade। সে সময় বিশুদ্ধ আমোদ-প্রমোদের জন্যে যে পাশা খেলাব প্রচলন ছিল তাও আমবা ধনপতির কাহিনী হতে অবগত হই। উচ্চ শ্রেণীর ধনিক সম্প্রদাযেব মধ্যে পারাবত উড়ানোএ ছিল আমোদ-প্রমোদেব আব একটি প্রধান অংগ। এই সমস্ত ঘটনা সমগ্রভাবে উচ্চশ্রেণীর বিলাসিতাব দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তৎকালীন সমাজে প্রচলিত এই গ্রন্থে সামাজিক চিত্রের আর একটি বিশেষ দিক বহু বিবাহ-সঞ্জাত কুফলেব নারী হৃদয়ের নিদারুণ হাঁহাকার। খুলনাব সমগ্র জীবন যেন ট্রাজেডির এক অখণ্ড প্রবাহ। এক দিকে আছে সতীন লহনার দুঃসহ যন্ত্রণা—অন্যদিকে স্বামীর বিরহ—এই উভয় সংঘাতে খুলনার সমগ্র জীবন যেন অকাল বৈধব্যের তীক্ষ্ণ যন্ত্রণায় পাণ্ডুর হয়ে গেছে। স্বামীর অনুপস্থিতিতে সতীন সতীনের ওপব যে কি ভীষণ বজ্র শেল নিক্ষেপ করতে পারে—লহনা তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। খুলনাকে কেবল ঢেকি-শালে শয়নেব ব্যবস্থাতেই লহনা তৃপ্ত নয়, তাকে মাঠে মাঠে ছাগল চরাবার নির্দেশ দেয় খুলনাকে সেই নির্দেশ নিরুপায় হয়ে মাথা পেতে নিতে হয়। দুঃসহ পরিশ্রমের পর সে খেতে পায় পোড়া ছাইমাখা দুর্গন্ধযুক্ত তণ্ডুল—জল পায় ভাঙা নারিকেলের মালায়। এবং এই অন্ন-ব্যঞ্জন তাকে খেতে হয় ঢেকি-শালে বসে 'মানের পাতায়'। কোন দিন জ্বরে উত্থান-শক্তি রহিত হলেও

ছাগল চরানোর হাত হতে খুলনার নিস্তার নেই। করুণ মিনতিতে অক্ষমতার অজুহাত জানায় খুলনা ঃ

খুলনা বোলে দিদি গায়ে মোর জ্বর।
হস্ত দিয়া চাহ দিদি ললাট উপর॥

এই করুণ প্রার্থনায় প্রতিহিংসা-পরায়ণা নারীর উল্লাষ বেড়ে ওঠে। সজল প্রার্থনার সব কিছু অনুরোধ-উপরোধ উপেক্ষা করে লহনা ঘোষণা করে তার অলঙ্ঘনীয় তীব্র-তীক্ষ্ণ নির্দেশ বাণী ঃ

লহনারে বোলে বেটী লজ্‌জা নাহি গা।
আপনা গৌরব রাখি ছেলি লইয়া যা॥

এ যেন প্রতিহিংসা পরায়ণা আদিম রিপুর বহ্নিমান প্রকাশ। এখানে দ্বিজমাধব প্রত্যক্ষ রূপদর্শীর মত বাঙালী গার্হস্থের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন্ত ছবিকে তুলির টানে অনবদ্য করে তুলেছেন। এ চিত্র তৎকালীন বাঙালী সমাজের এক কলঙ্ককাহিনীর চরমালেখ্য।

খুলনার পুজায় দেবী সন্তুষ্ট হয়ে যখন বর প্রার্থনা করতে বলে তখন খুলনার মুখ দিয়ে বার হয়ে আসে ঃ

খুলনারে বোলে দেবী এই বর চাই।
হাজিছে ছাগল পাইলে মরণ এড়াই

অন্য কোন বর নয়, ধন-দৌলত প্রার্থনা নয়, প্রবাসী স্বামীকে নিকটে পাওয়ার তীব্র বাসনাও নয়— কেবল হারান ছাগল পাওয়ার ঐকান্তিক আকাঙ্খা। সতীনের অত্যাচার কী ভীষণ হয়ে উঠেছিল দেবীর কাছে খুলনার এ প্রার্থনা তার উজ্জ্বলতম প্রমাণ। তৎকালীন সমাজে যে শিক্ষার প্রচলন ছিল তার প্রমাণ পাই ব্রাহ্মণী কর্তৃক লহনার হ'য়ে খুলনার নিকট পত্র রচনায়। শিক্ষার জন্যে পাঠশালার ব্যবস্থা ছিল, তার প্রমাণ নিহিত রয়েছে শ্রীমন্ত কর্তৃক জনার্দন পণ্ডিতের পাঠশালার বিদ্যাশিক্ষার মধ্যে।

সেকালে বহু বিবাহ ফলে পুরুষ বহুক্ষেত্রেই নারীর যৌবন-কামনাকে মেটাতে পারতো না। নারীর দেহান্তরালে যখন যৌবনের নিদ্রোত্থিত কুম্ভকর্ণ জাগ্রত হ'য়ে উঠ্তো—সেই জাগ্রত যৌবন-কামনা বিফল বিরহের আকার ধারণ করতো। ধনপতিকে বিদেশে নির্বাসন দিয়ে দ্বিজমাধব খুলনার এই যৌবনোম্মাদনাকে বিরহের মাধ্যমে সুন্দর প্রকাশ করেছেন ঃ

আর দূর দেশে তুবা না পাঠাব পিউ।
বিরহ-পয়োধি মধ্যে যদি রহে জীউ॥
কেবা বোলে এ হারে জগতে সুখময়ে।
না জানি কি ভালমন্দ বিপদ সময়ে॥

এমনি ভাবেই সমগ্র মঙ্গল চণ্ডীর মধ্যে তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থার সুন্দব ছবি ফুটেছে। রূপ-দর্শী কবি তুলিব টানে টানে সে চিত্র আমাদের নিকট একেবারে জীবন্ত ও প্রত্যক্ষ কবে তুলেছেন।

॥ আট ॥

॥ ভাঁড়ু দত্তের চরিত্র ॥

ভাঁড়ু দত্ত বাংলা সাহিত্যে দ্বিতীয়রহিত। ইংরাজী সাহিত্যেও ঠিক এই ধরনের চরিত্র আছে কি না সন্দেহ। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের ভাষায় "ভাঁড়ু শকুনীশ্রেণীর ব্যক্তি,—ধূর্ত্ততার জীবন্ত প্রতিমূর্তি।" ভাঁড়ু সম্পর্কে এইটাই বোধ হয় সার কথা। দারিদ্র্যনিপীড়িত, শঠতাপ্রবণ বাঙালীর জীবন্ত বিগ্রহ এই ভাঁড়ু দত্ত। কেবল তৎকালীন সমাজে কেন অদ্যাবধিও সমাজ-জীবনে দত্তের মত লোকের অভাব নেই।
গুজরাটের নিকটে ভাঁড়ু দত্তের বাড়ী—অকর্মণ্য ভাঁড়ুর বাড়ীতে লক্ষ্মীর পদসঞ্চার হয় না—ফলে অধিকাংশ দিন উপবাসে যায়। একদিন উপবাসে কাটিয়ে প্রাতঃকালে তপন দত্তের মায়ের কাছে অন্নের খোঁজ

নিলে তার পত্নী উত্তর দেয় ঃ কালি গেল উপবাস আজ কোথা চাউল।"
অতএব চাউলের সন্ধানে বার হয় ভাঁড়ু দত্ত। 'ছাওয়ালের মাথে' 'ছয় বুড়ি' অচল ভাঙী কড়ি গামছা বেঁধে দিয়ে বাজারের পথে পা' বাড়ায় ভাঁড়ু দত্ত—সুরু হয় তার মিথ্যার বেসাতি।

বাজারে প্রথমে ধানপসারীর নিকট উপনীত হ'য়ে সের কয়েক চাউল চায় এবং পয়সা সম্পর্কে বলেঃ তঙ্কা ভাঙ্গাইয়া কড়ি দিয়া যাব তোরে।' কিন্তু ধনা ভাড়ুকে পুর্ব হ'তে জানে ফলে ধারে চাউল দিতে অস্বীকার করে! এইবার ভাঁড়ু আপনরূপে প্রকাশমান হ'য়ে ওঠে। তার অন্তর্নিহিত শঠতা-প্রবণ তীক্ষ্ণধার-বুদ্ধি দীপ্তোজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। সে ধনাকে জানায় রাজার পাইকদের সাথে তার একান্ত জানাশোনা— তাদের দিয়া সে ধনাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবে। ধনা ভয় পায় এবং চাউল দিতে পথ পায় না। এইভাবে সে ভয় দেখিয়ে শাক এবং লবণ সংগ্রহ করে। এরপর 'তেলী'র কাছে এসেই ঃ

কি তৈল কি তৈল বলি হাত জাবড়ায়ে।
আপনার গোপে দিল ছাবালের মাথায়॥

বাঙালী চরিত্রের কী উজ্জ্বল প্রকাশ! তেল পরীক্ষাব ছলে কি তেল বলে হাত ডুবিয়ে গোঁফে এবং মাথায় দেওয়ার ধূর্ত-প্রথা আজো বাংলার পল্লীতে পল্লীতে দৃষ্ট হয়। এভাবে ভাঁড়ু তৈল, গুবাক, চিড়া, মিঠাই, সন্দেশ এবং দধি সংগ্রহ করলো। সহজে যে দিতে অস্বীকার করে তাকে রাজার পাইক পিয়াদার সাথে এমন কি স্বয়ং রাজার সাথে বন্ধুত্বের কথা তোলে এবং তাদের দিয়ে উপযুক্ত শাসনের ভয় দেখায় ঃ

প্রাতঃকালে প্যাদা পাঠাইব ঘরে ঘরে।
পতাকা তুলিয়া দিব গাছের উপরে।

ঘোষের মা দধি দিতে অস্বীকার করায় তা'কে জানায় ঃ

চোরা গরু লয়ে বুড়ি তোমার বসতি।
বাদী হইয়াছে যত গ্রামের রায়তি॥

দুর্বলতা প্রকাশ পাওয়ায় সে দধি দেওয়ার জন্যে ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই ভাঁড়ু যেমন ধূর্ত তেমনি অপরের দোষক্রুটি তার নখাগ্রে। সকলকে জব্দ করে বাজার সংগ্রহ করলেও 'মাছোনি'র কাছে ভাড়ু ভীষণ জব্দ হয়। মাছ নিতেই ডোমনী বলে: 'কড়ি না দিয়া মৈছ্য লইয়া যাও কেনি।' ভাঁড়ু তার স্বভাবসুলভ ধূর্ততায় করের ভয় দেখিয়ে ডোমিণীকে বলে: "এথকাল মৎস্য বেচ কর দেয় কারে।" কিন্তু ডোমণী সাধারণ মেয়ে নয়—সে ভাঁড়ুর বাড়া। কণ্ঠ ছেড়ে সেও উত্তর দেয়:

ভাঁড়ু তুই তার কে।
করের লাগি ধরিবেক জোয়াতি হয় যে॥

কর আদায়ের যে যোগ্য ব্যক্তি সেই কর নেবে—সুতরাং এখন নগদ কড়ির প্রয়োজন! অতএব ডোমণীর সাথে ভাঁড়ু দত্তের 'বহুল হুড়াহুড়ি, সুরু হয় এবং এর ফলে 'কচ্ছ হোতে ভাঁড়ু দত্তের পড়ে ভাঙা কড়ি।' ভাঙা কড়ি পড়ায় যেন হাটের মাঝে হাঁড়ি ভাঙে। ফলে লজ্জায় 'মৎস্য এড়িয়া ভাঁড়ু উঠিয়া পলায়ে।' এখানে লজ্জা পাওয়াটা ভাঁড়ুর মত লোকের পক্ষে কলঙ্ক বলেই মনে হয়। বাজারের পালা এখানে শেষ এরপর রাজদরবারে ভাঁড়ুর অশোভন আচরণের সুদীর্ঘ বর্ণনা আছে। সেখানে চন্দনের ফোঁটা প্রথমে 'মণ্ডল বুঢ়ন, পাওয়ায় ভাঁড়ু ক্রোধান্ধ হ'য়ে কালকেতুকে বলে:

দত্তকুল অল্প জাতি তোমার জেয়ান।
ভাঁড়ু থাকিতে চন্দন পায় অন্য জন॥

এবং রাজার প্রতি এই অশিষ্ট আচরণের অনিবার্য ফলরূপে চড় কিল লাথি অবিশ্রাম বৃষ্টিধারার মত পড়ে ভাঁড়ুর পিঠে। অবশেষে ধূলাবালি ঝেড়ে বাড়ীর পথে পা বাড়ায় স্ত্রী ধুলির কথা জিজ্ঞাসা করে ভাঁড়ু বলে যে রাজার সাথে আজ পাশা খেলার প্রতিযোগিতা হয় এবং খেলায় রাজা ছ'বার পরাজিত হয়। ফলে রাজা 'রসে অবশ হইয়া করে হুড়াহুড়ি।'

সেই জন্যেই গায় ধূলাবালির প্রলেপ পড়েছে। বলা বাহুল্য এখানে ভাঁড়ু আপন স্বভাব-সুলভ ধূর্ততার উচ্চ গ্রামে (cliamx) পৌঁছে গেছে। উপস্থিত বুদ্ধিতে নতুন কথা উদ্ভাবনের অভিনব কৌশল ভাঁড়ুর অদ্ভুত ভাবে আয়ত্ত।

কিন্তু মিথ্যা কথা বলে স্ত্রীর নিকট প্রশংসা পেলেও মনে মনে প্রতিহিংসার আগুন তীব্রতর হ'য়ে ওঠে। সে কৌশলে কলিঙ্গ রাজকে কালকেতুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রায় প্ররোচিত করে এবং যুদ্ধও হয়। কিন্তু উভয় রাজার মধ্যে যখন সন্ধি হয় এবং ভাঁড়ুর দোষ ধরা পড়ে তখন অশ্বমূত্রে মস্তক ভিজিয়ে বাম পদতলে মাঝে মাঝে ক্ষুর ঘষে নিয়ে ভাঁড়ুর মস্তক মুণ্ডনের ভার নাপিতের উপর অর্পিত হয়। মস্তক মুণ্ডনের পর তাতে ঘোল ঢেলে দিয়ে তাকে গঙ্গা পার করে দেওয়া হয়। কিন্তু গঙ্গাপারে গিয়েও ভাঁড়ু আপন স্বভাব ভুলতে পারে না—বরং এই পরপারে এসেই বুঝি তার স্বভাব অধিকতর উজ্জ্বল হ'য়ে ফুটেছে। 'মাথা-মুড়া' কেন জিজ্ঞাসা করলে জনসমক্ষে সে উত্তর করে, "গঙ্গা সাগরেতে গিয়া মুড়ায়েছি মাথা।" এখানকার ভাঁড়ুই ভাঁড়ু—বিদ্যুৎ-তীক্ষ্ণ মিথ্যা-উদ্ভাবনী শক্তির কী তীব্র-প্রকাশ! কোন কিছুই ভাঁড়ুকে স্পর্শ করতে পারে না—বিপদ-সঙ্কুল ঘূর্ণাবর্তেও ভাঁড়ুর মস্তক চির-উন্নত। লাঞ্ছনা-গঞ্জনা তাঁর অঙ্গ—ভূষণ। অপমান তার রাজ-মুকুট। আপন স্বভাব-সুলভ সহণীয়তার দ্বারা সে সব কিছুই অবলীলাক্রামে উপেক্ষা করে। একা ভাঁড়ুই দূর-অতীতের বাঙালী-সমাজের এক বিশেষ শঠতাপ্রবণ মানুষ-গোষ্ঠীর ছবি অত্যুজ্জ্বল রূপে আমাদের সম্মুখে তুলে ধরেছে। এই শ্রেণীর ধূর্ত মানুষের যথার্থ প্রতিনিধি ভাঁড়ু ভাঁড় নয়—মধ্যযুগীয় যৌথ-বাঙালী সমাজ চিত্রের কলঙ্ক-প্রলেপ।

॥ নয় ॥

॥ জাতীয় কাব্য হিসাবে মঙ্গলকাব্যের অবদান ॥

মঙ্গলকাব্যগুলির জাতীয় কাব্য কিনা সে সম্পর্কে আলোচনা করার

পুর্বেই জাতীয় কাব্য বল্‌তে আমারা কি বুঝি সে সম্পর্কে আমাদের ধারনা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। জাতীয় কাব্যে থাক্‌বে একটা জাতীর জীবন-যাত্রা' সভ্যতা-সংস্কৃতির চিরন্তন পরিচয়। জাতির হিয়া হ'তে অমিয় মন্থন এবং পান করে এই জাতীয় কাব্যের বর্ধন এবং পুরিপুষ্টি। জাতীয় কাব্য যেন বিশাল বৃক্ষ। এর পত্র-পল্লব যেন অসংখ্য নরনারী, এর ডালপালা যেন বহু সম্প্রদায়ের প্রতীক, সমগ্র বৃক্ষটি যেন বহু বিভক্ত সম্প্রদায়ের আত্মলীন অভিব্যক্তি। জাতীয় কাব্য তাই জাতীর প্রতিবিম্ব জাতীয় সংস্কৃতির ধারক বাহক এবং সংগঠক। জাতীর রস পান করে যেমন এদের বর্ধন তেমনি এর মধ্যেই প্রতিবিম্বত হ'য়ে ওঠে জাতীর আশ-আকাঙ্খার প্রতিচ্ছায়া।

জাতীয় কাব্যের এই রূপের পটভূমিতে অদিযুগের মঙ্গলকাব্যগুলিকে কোন ক্রমেই জাতীয় কাব্যের দিগন্তে ফেলা যায় না। কেননা প্রথম দিকের কাব্যগুলিতে সমগ্রিক জাতীয় চেতনার অভিব্যক্তি অপেক্ষা প্রধান হয়ে উঠেছে সম্প্রদায়িক রূপালেখ্য। বাঙালীর জাতিয়-জীবনের উদ্‌ঘাটনের এবং "রস সৃষ্টি অপেক্ষা সাম্প্রদায়িক দেবতার সার্বজনীন প্রতিষ্ঠান" তখন এই শ্রেণীর কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। ফলে প্রথম দিকের মঙ্গল কাব্যগুলি একান্ত ভাবেই Communal poetry-র অন্তর্ভূক্ত। Communal poetry-র যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য 'of the people by the people and for the people' এর সবগুলিই আদি যুগের মঙ্গলকাব্য সমূহের মধ্যে নিহিত—ফলে একাব্য-গুলির আবেদন তখন সম্প্রদায় বিশেষের সীমাবদ্ধগণ্ডীতে সীমিত ছিল। কিন্তু এই সাম্প্রদায়িক তীব্র ভেদবুদ্ধি দীর্ঘদিন মঙ্গল কাব্যগুলিকে শাসন করতে পারে নি। "কারণ, এই দেশের এই সকল সংকীর্ণতামূলক সাম্প্রদায়িক সাহিত্যের উপর দিয়া বৈষ্ণব সাহিত্যের কূলপ্লাবনী বন্যা প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। তাহার ফলে এই সমাজের প্রায় সমগ্র সাম্প্রদায়িক সাহিত্যের বৈষম্যের মূল শিথিল হইয়া গিয়াছে।" বস্তুতঃ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আজীবন—আচরিত প্রেম-বন্যার বিপুল উর্মিমুখর

জোয়ার-তরঙ্গে সমাজ-জীবনের সমুদয় ভেদবুদ্ধি ও সম্প্রদায়িক দ্বেষ দূরীভূত হ'য়েছিল। মঙ্গল কাব্যগুলির সম্প্রদায়িকতার সংকীর্ণ ভেদ-ভূমি এই উদার আসম্প্রদায়িক পটভূমিতে করেছিল পদসঞ্চার। যেদিন মঙ্গলকাব্যের অন্ধকারাচ্ছন্ন সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণ গলিপথগুলি অসাম্প্রদায়িক পবিত্র আলোকমালায় প্রোজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছিল সে দিন এ কাব্যগুলি হ'যেছিল জাতীয় কাব্যের দুর্লভ মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত। Communal peotry সে দিন Natoinal peotry-র উদার আসনে হয়েছেল উন্নত। জাতীয় জীবনের আশা আকাঙ্খার বাণীতে তাই চৈতন্যোত্তর যুগের মঙ্গলকাব্যগুলির পৃষ্ঠা সমুজ্জল হ'য়ে উঠেছে। ধর্মমঙ্গল এবং বিশেষ করে চণ্ডীমঙ্গল তার সার্থক উদাহরণ।

বহুসম্প্রদায় বিশিষ্ট বহুধা জাতীয়-জীবনে এই মঙ্গলকাব্যগুলি মিলন এবং ঐক্যের বাণী বহন করে এনেছেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিন্নমুখী অসংখ্য চিন্তাধারা সমন্বয়-সূত্রে গ্রথিত করে বিশৃঙ্খলসমাজ-জীবনে একটি সংহত রূপ দেওয়ার চেষ্টা এ কাব্যগুলির মধ্যে দেখা যায়। এবং এই সমন্বয়-আশঙ্কার ফলেই 'উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ কবি তাঁর কাব্যের নায়ক করেছেন অস্পৃশ্য ব্যাধ-সন্তান কালকেতুকে। ডোম পুজিত ধর্মঠাকুর তাই অভিন্ন রূপে কল্পিত হয়েছেন কবির আরাধ্য দেবতা বিষ্ণুর সাথে।' এখানে বর্ণ-শ্রেষ্ঠত্বের ছুঁত-মার্গ রোগ এসে কবির উদার কল্পনাকে সার্থক করে তুল্‌তে পারে নি। জাতীকে ধ্বংসের হাত হ'ত বাঁচাবার জন্যে কবি এখানে দলাদলির প্রাচীরটিকে সমূলে ধ্বংস করেছেন।

জাতীয় কাব্যে যে চরিত্রগুলি স্থান পায় তারা যে কেবল সমসাময়িক সংস্কৃতি এবং জাতীয় ঐতিহ্যের সাথে আমাদের চিত্তের সংযোগ ঘটায় তা' নয়—জাতীয় জীবনে চিরন্তন-সত্য এবং ঐতিহ্যগুলি এই সমস্ত চরিত্রগুলিকে কেন্দ্র করে শাশ্বত-কালীন রূপ লাভ করে। জাতীয় চরিত্রের যা' নিত্য-কালীন বৈশিষ্ট্য তা' এই চরিত্রগুলিতে বাঙ্ময় হ'য়ে ওঠে। মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে আমরা এমনি কতকগুলি চরিত্রের সন্ধান পাই। এমন কতকগুলি 'চরিত্র এই সকল কাব্যসমূহে স্থান পেয়েছে

যারা চিরকালীন বাঙালী ঐতিহ্যের মূর্তিমান প্রতীক। "চণ্ডী মঙ্গলের ফুল্লরা, ভাঁড়ু দত্ত, মুরারী শীল; ধর্মমঙ্গলের কর্পূরসেন; মনসা-মঙ্গলের বেহুলা-সনকা বাঙালী গৃহের নিত্যকালের চিত্র। এই সমস্ত চরিত্র-চিত্রনে কবিরা শুধু দেবলোকের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই, বাঙালীর নিত্য-পরিচিত গৃহাঙ্গণ হইতে ইহাদিগকে তুলিয়া লইয়া সাহিত্যে অমরতা দান করিয়াছেন। এই চরিত্রগুলির সহিত পরিচিত হইয়া আমরা প্রাচীন কালের সাহিত্যে আধুনিক কালের যোগসূত্র রচনা করিতে পারি এবং সেই সুদূর অতীতেও পরিচিত পদধ্বনি শুনিয়া চমৎকৃত হই।....মনসামঙ্গল চণ্ডীমঙ্গল, শিবায়ণ প্রভৃতি মঙ্গল কাব্যগুলিতে এইভাবে বাঙালীর জাতীয় জীবনের একটা নিত্যকালের চিত্রের সহিত আমরা সহসা মুখোমুখি হইয়া পড়ি। জামাতা শিবের দারিদ্র-কল্পনা বাঙালী পিতা চিরদিনই নিজের কন্যারই দুর্ভাগ্যের বিভীষিকা কল্পনা করিয়াছে, সদ্য-বিধবা পুত্রবধূ-বেষ্টিতা শোকাতুরা সনকার মাতৃহৃদয়ের হাহাকার অকাল বৈধব্য-পীড়িত এই সমাজে ধ্বনিত হইতেছে।" এই চরিত্রগুলির অন্তর্ভেদী করুণ ক্রন্দনে আমাদের চিত্ত ক্রন্দনাকুল হ'য়ে ওঠে, এদের হাস্য-মুখর জীবন-যাত্রায় আমাদের চিত্ত আনন্দোদ্বেল হ'যে ওঠে। চণ্ডীমঙ্গলের শিব-পার্বতী তো দরিদ্র-নিপীড়িত বাঙালী-দম্পতী। গৃহিনী উমার গঞ্জনায় শিব গৃহত্যাগ করেন এবং দেশে দেশে ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করেন। গৃহিনীর প্রতি তখনো তাঁর ক্ষোভ যায় নাই:

দেশে দেশে ফিরি কত ভিক্ষা করি
ক্ষুধার অন্ন নাহি মিলে।
গৃহিনী দুর্জন, ঘর হৈল বন
বাস করি তরুমূলে।

শিব গৃহ ত্যাগ করায় অভিমান শোনা যায় গৌরীর কণ্ঠে:

ময়ূরে মুষিকে হয় সদাই কোন্দল।
এই হেতু দুই ভাইয়ে দ্বন্দ্ব মোর কর্মফল।

বাপের সাপ পোয়ের ময়ূর সদাই কলকলি।
গণার মুষা ঝুলি কাটে আমি খাই গালি ॥

এই অংশে "শাশ্বত বাঙালী-দাম্পত্যজীবনের যথার্থ-চিত্রণ পূর্ণতার সর্বোচ্চ-গ্রামে (climax) সুপ্রতিষ্ঠ হ'য়েছে।....গৃহিনী দুজন ইত্যাদি বলে শিব যখন অনুযোগ করেন কিংবা 'বাপের সাপ পোয়ের ময়ূর........ ইত্যাদি বলে গৌরী যখন সেই তিরস্কারের প্রত্যুত্তরে খেদ প্রকাশ করেন, তখন মনে হয় না কি,—কবি-মুকুন্দরাম নিত্যদিনের বাঙালী-দম্পতির কণ্ঠ হতে ভাষা কেড়ে নিয়ে শিল্পের রূপান্তর সংগঠন সংযোজন করেছেন।" মোটকথা এই গ্রন্থের প্রত্যেকটি চরিত্র বাঙালী জীবনের চরম রূপালেখ্য। ছরিত্রগুলির মধ্যে বাঙালী জীবনের শাশ্বতকালীন আশা-আকাঙ্খার, ব্যথা-বেদনার ছবি ফুটে উঠেছে বলেই এই কাব্য-গুলিকে জাতীয় কাব্য বল্‌তে আমাদের কোনই কুণ্ঠা থাকে না।

॥ মৈমনসিংহ গীতিকা ॥

॥ এক ॥

॥ গীতিকার সংগা ও বৈশিষ্ট্য ॥

মধ্যযুগে পাশ্চাত্য সাহিত্যের উপর মধুর রস-সিঞ্চন করে এক শ্রেণীর আখ্যানমূলক লোক-গীতি—Narrative_folk-song—আপামর জনসাধারণের চিত্ত ব্যাপক হরণ করেছিল—এই লোক-গীতিরই ইংরেজী প্রতিশব্দ Ballad এই Ballad শব্দটি বাংলায় 'গীতিকা' রূপে কায়া বদল করেছে। আসলে Ballad এবং গীতিকার আন্তরাত্মা এক, উভয়ের মর্মমূলে একই রাগিনী শত ভাব-ব্যঞ্জনায় ঝংকৃত হয়েছে।

'বাংলার লোক-সাহিত্য' গ্রন্থে শ্রদ্ধেয় আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় সাধারণ বৈশিষ্ট্য-প্রদান-প্রসঙ্গে গীতিকার যে মূল্যবান সংগা দিয়েছেন তা' বিশেষ রূপে স্মরণ যোগ্য ঃ 'ইহা আখ্যানমূলক হয়, ইহা আবৃত্তি করার পরিবর্ত্তে গীত হয় ও প্রকাশ-ভঙ্গির দিক দিয়া ইহার লৌকিক বৈশিষ্ট্য Folk character অক্ষুণ্ণ থাকে, অর্থাৎ আখ্যায়িকা বর্ণনা করিতে যে একটি বিশিষ্ট লৌকিক ছন্দ ব্যবহার করা হইয়া থাকে তাহার ব্যতিক্রম করিয়া গীতিকা রচিত হয় না এবং জনশ্রুতিমূলক traditional বিষয়ই ইহার ভিত্তি। ইহার মধ্যে রচয়িতার একটি আত্মনির্লিপ্ত ভাব প্রকাশ পায়। এক মাত্র ঘটনাই ইহার লক্ষ্য, গীতি-সংলাপ ও ঘটনা-প্রবাহের ভিতর দিয়া ইহার কাহিনী শেষ পর্যন্ত দ্রুত সঞ্চারিত হইয়া যায়।"

গীতিকা একটি কাহিনীর দৃঢ়বদ্ধ রূপায়ণ। এই কাহিনীর বিন্যাস এলায়িত কিংবা শিথিল নয় জমাট এবং দৃঢ়-পিনদ্ধ। কাহিনীর যে তিনটি মূল এবং অংগীভূত বৈশিষ্ট্য ক্রিয়া (action), পরিবেশ ও বিষয়-বস্তু এবং চরিত্র গীতিকার মধ্যেও তাদের অস্তিত্ব বিদ্যমান! কিন্তু ক্রিয়া, পরিবেশ এবং চরিত্র এই তিনটির মধ্যে আবার সমগ্র কাহিনীর উপর

ক্রিয়ার প্রাধান্য গভীর এবং সুদূর প্রসারী। এমন কি ক্রিয়ার সর্বগ্রাসী ব্যাপকতায় সমগ্র কাহিনীটির মধ্যে পরিবেশ এবং চরিত্রের প্রভাব গৌণ ও ম্লান হ'য়ে যায়। "ক্রিয়াই বা action-ই গীতিকার মূল আকর্ষণ। অনেক সময় এই ক্রিয়া উচ্চাঙ্গ নাটকীয় গুণের অধিকারী হয়, ঘটনার উত্থান-পতন চমকপ্রদ ও বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হয়, ইহার ঘন-সন্নিবিষ্ট ঘটনাজালের মধ্য দিয়া কোন ফাঁক দেখা যায় না, অনাবশ্যক ঘটনা ও অপ্রাসঙ্গিক বর্ণনা ইহার মধ্যে পরিত্যক্ত হয়।" সকল প্রকার আবর্জনা এবং উপকাহিনীর অনাবশ্যক উপদ্রব পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র মূল কাহিনীটি বিদ্যুৎ-তীক্ষ্ণ নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি করতে করতে অন্তর্ভেদী পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়।

॥ দুই ॥

॥ মঙ্গলকাব্য ও গীতিকা ॥

মঙ্গলকাব্যের সাথে গীতিকার প্রধান পার্থক্যও এখানে। মঙ্গলকাব্যেও একটি মাত্র দেবদেবী মাহাত্ম্য-প্রচারক কাহিনী অবলম্বনে রচিত কিন্তু সে কাহিনী গীতিকার কাহিনীর মত দ্রুত-সঞ্চারী নয়—নানা শাখা এবং উপ-কাহিনীর ভারে তা' মন্থরগামী। এপিক বা মঙ্গলকাব্যের কাহিনী যেন সমতল ক্ষেত্রবাহী শিথিল-স্রোতা বিশাল নদী—গতিপথের সমুদয় আবর্জনা মাথায় নিয়ে, উপকূলবর্তী বৃক্ষলতায় প্রাণ-স্পন্দন জাগিয়ে দিগন্ত-লীন প্রান্তর-ভাগ শ্যামাঙ্গ-শস্যে উজ্জ্বল করে ধীর প্রবাহে সম্মুখের দিকে এগিয়ে যায় পক্ষান্তরে গীতিকা যেন বন্ধুর পাহাড়ী পথে নৃত্যচপল ঝর্ণা—আবর্জনার বন্ধন সে মানে না, বাধাবিঘ্ন সে জানে না, সকল বিপদজাল অতিক্রম করে কেবল-মাত্র বিপুল সমুদ্রের সাথে মিলনের জন্যেই দূর মোহনার পথে সে ক্রমাগ্রসর। দ্রুত পরিণতিতেই গীতিকার চরম সার্থকতা।

এ ছাড়াও আর একটি পার্থক্য উভয়ের মধ্যে প্রধান হ'য়ে উঠেছে। মঙ্গলকাব্য সমূহের উৎপত্তি সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির উৎসমূল থেকে।

কোন বিশেষ সাম্প্রদায়িক দেব, দেবীর মাহাত্ম্য-প্রচার করাই তার লক্ষ্য, সম্প্রদায়গত ধর্মের বিজয়-পতাকা উড্ডীন করাই তার বৈশিষ্ট্য। কিন্তু গীতিকার মধ্যে কোন দেব-দেবীর গুণ-কীর্তন নেই, সাম্প্রদায়িক কলুষিত আবহাওয়ার মধ্যেও তার জন্ম নয়, কোন ধর্মের ছোঁয়াচ গীতিকাগুলিতে নেই। তবুও গীতিকার মধ্য হ'তে একান্তভাবেই যদি কোন ধর্মের নাম করতে হয় তা' হলো শাশ্বতকালীন মানব ধর্ম। জাত-কুলের অতীত, দেশ-কালের অতিবিক্ত পরম পবিত্র চিরন্তন মানবিকতাই গীতিকাব অন্তর্মূলে বেগ সঞ্চার করেছে।

মঙ্গলকাব্য এবং গীতিকার পার্থক্য নির্ণয়ে আব একটি বিষয় উল্লেখ-যোগ্য। মঙ্গলকাব্যগুলি সর্বদাই লিখিত হ'তো এবং লেখা-পৃষ্ঠাতেই তাবা আত্মরক্ষা করেছে কিন্তু গীতিকাগুলি সর্বত্রই মৌখিকভাবে বচিত হ'য়েছে এবং মানুষের স্মৃতিই তাদের আত্মবক্ষাব একমাত্র আশ্রযস্থল। মঙ্গল-কাব্যের কবিগণের অধিকাংশ শিক্ষিত এবং পণ্ডিত। কিন্তু গীতিকার কবিগণ পল্লবাসী, নিরক্ষর। অবশ্য এখানে স্মবণ বাখা দরকার এই কবিকুল নিরক্ষর হ'লেও মূর্খ নয—যে শাশ্বত শিক্ষা মানুষকে আত্ম-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে সেই মানব-প্রেমের পবিত্র অনির্বান দীপশিখা এই সকল কবিগণের অন্তরপ্রদেশ ঝলকিত করেছিল। মঙ্গলকাব্যে লাচাড়ী, পয়ার, ত্রিপদি, ইত্যাদি বিভিন্ন ছন্দ পরিলক্ষিত হয় কিন্তু গীতিকা একটি মাত্র শ্বাসাঘাত প্রধান পযার ছন্দেই বিরচিত। সর্বোপরি মঙ্গলকাব্যগুলি অপেক্ষা গীতিকাগুলিতে পল্লী-প্রাণের সরল কলগুঞ্জন নিবিড় হ'য়ে ধরা দিয়েছে। মাটিব স্পর্শে এগুলি জীবন্ত, পল্লীর সরল মানুষের সহজ-জীবন কথায় এগুলি স্পন্দিত হ'য়ে উঠেছে।

॥ তিন ॥

॥ গীতি ও গীতিকা ॥

স্থূলভাবে গীতি এবং গীতিকার মধ্যে বিশেষ কোন দুবতিক্রমী ব্যবধান নেই কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টি দিয়ে দেখলে উভয়ের মধ্যে কয়েকটি পার্থক্য বিশেষ রূপে অনুভব করা যায় প্রথমতঃ আয়তনের দিক দিয়ে গীতি বা লোক-

সংগীত—folk song—গীতিকা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর। গীতিকায় একটি দৃঢ়-পিনদ্ধ কাহিনী আছে কিন্তু গীতিতে কোন কাহিনী নেই। বস্তুতঃ কাহিনী যুক্ত গীতি-ই গীতিকা। গীতিকায় সুর অপেক্ষা কাহিনীই প্রধান—কাহিনীর অধীন হয়ে সুর গুঞ্জিত হয়েছে, এখানে সুরের স্বাধীনতা বিশেষরূপে ক্ষুণ্ণ। সুরের কোন টানা পোড়েন এবং বৈচিত্র্য না থাকলেও শ্রোতাগণ বিশেষ ধৈর্য্য সহকারে গীতিকা শ্রবণ করতো—কেননা গীতিকার তীব্র নাটকীয় গুণসম্পন্ন কাহিনী শ্রোতাদের মনে অপরিসীম প্রভাব বিস্তাব করতো। কাহিনীর এই সঞ্জীবনী সুধা সমগ্র পরিবেশের ওপর ছাপিয়ে ওঠায় সুবের দৈন্য ও বৈচিত্রহীনতাব দিকে শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হ'তো না। কিন্তু গীতিতে সুরেরই প্রাধান্য। গীতিতে কাহিনীর কোন তীব্র আকর্ষণ না থাকায় সুর এবং ভাব আপন দেহ-সঞ্জাত পেলব স্পর্শ দিয়ে কাহিনীর সেই অপূর্ণ স্থানকে পূরণ করেছে। তাই "সুর ব্যতীত গীতির প্রকৃত রসোপলব্ধি সম্ভব হইতে পারে না।.... গীতির সঙ্গে সুর 'বাগর্থবিব সম্পৃক্ত', অর্থাৎ বাক্যের সঙ্গে অর্থের যে সম্পর্ক ইহারও কথার সঙ্গে সুরের সেই সম্পর্ক। সেইজন্য সুর ব্যতীত কেবলমাত্র কথা দ্বারা গীতি প্রকাশ করা যায় না।" গীতিতে তাই সুরের অধীন কথা, ভাবের অধীন অঙ্গ। সুর এবং ভাব উভয়ের প্রবল অধীনে কথা নিতান্ত গৌণ হ'য়ে পড়েছে। গীতিতে কাহিনী না থাকায় যেমন সুরের প্রাধান্য দেওয়া হ'য়েছে—তেমনি সুরের বৈচিত্র্যও সম্পাদিত হ'য়েছে। কেননা একই সুরে গীত হ'লে একঘেয়েমি আসবেই—গীতির এই একঘেয়েমি দূর করার জন্যে তাই বিভিন্ন পল্লী-বাদ্যযন্ত্রের সহায়তায় সুরের বৈচিত্র্য সম্পাদন আনিবার্য হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু পূর্বেই উল্লেখ করেছি গীতিকাতে শোনা গিয়েছে একটি মাত্র সুরের রেশ। গীতিকার একতারা দিয়ে ধ্বনিত হ'য়েছে বৈচিত্র্যহীন একই সুর-ঝংকার।

॥ চার ॥

॥ বৈষ্ণব সাহিত্য ও মৈমনসিংহ গীতিকা ॥

বৈষ্ণব সাহিত্য ও মৈমনসিংহ গীতিকা এই দুই পরমাশ্চর্য সৃষ্টি-প্রেমের অপূর্ব ব্যঞ্জনায় রোমাঞ্চ-রঙীন। প্রেমিক প্রেমিকার চিত্তোল্লাস, হৃদয়ার্তির রূপাল্পনায় উভয় গ্রন্থের প্রতিটি পৃষ্ঠা উজ্জ্বল। তাই এই সৃষ্টি প্রেম-পরিচিতির নতুন 'কাম সংহিতা'। পটভূমি এক হলেও শিল্পী-মানসের বিভিন্নতার জন্যে উভয় কাব্যের আঙ্গিকে এবং নায়ক-নায়িকার চরিত্র-বিকাশে এক সুদূরপ্রসারী ব্যবধান রচিত হয়েছে। বৈষ্ণবকাব্য খণ্ড গীতির সমষ্টী—গীতিকার মত আনুপূর্বিক কোন কাহিনী তাতে স্থান লাভ করেনি। ছন্দের দিক দিয়েও বৈষ্ণবকাব্য মৈমনসিংহ গীতিকা অপেক্ষা অধিকতর আঙ্গিক-সুষম এবং কলা-নিপুণ। ছন্দ-বৈচিত্র্য এবং অনুপ্রাসের বিচিত্র ঝংকার বৈষ্ণব কাব্যকে এক বিবল-বৈশিষ্ট্য দান করেছে। এই বিরল বৈশিষ্ট্য সংগীত-সুষমাব মোহাঞ্জন-স্পর্শে অভিনব ও প্রাণবন্ত। কিন্তু পূর্বেই উল্লেখ করেছি, মৈমনসিংহ গীতিকায় একমাত্র কাহিনী ছাড়া অন্য কোন বিষয়েব বৈচিত্র লক্ষণীয হ'য়ে ওঠেনি। এর ছন্দ শিল্প-সুষমি নয়—সুরও এর সঙ্গে কোন লাবণ্য-শ্রীদান করেনি। যদি করেও থাকে তা' একান্ত গৌণ।

বৈষ্ণবকাব্যের নায়ক-নায়িকা রাধা এবং কৃষ্ণ—কোন উপনায়ক নেই। আয়ন ঘোষের কথা উল্লেখ থাকলেও কাব্যের মধ্যে তার কোন স্থান নেই, যবনিকার অন্তরালে সে এক নির্বাক ছায়া মাত্র। রাধা-কৃষ্ণের কূল প্লাবনী প্রেম-বন্যায় সে সামান্যতম তৃণের মত কোন দিগন্ত হারা পথে অবলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু মৈমনসিংহ গীতিকার প্রেম-ত্রিভুজ সর্বদাই নায়ক-নায়িকা এবং আর এক বা বহু উপনায়ক-নায়িকার পদভারে কম্পমান হ'য়ে উঠেছে। এই উপনায়ক-নায়িকার আগমনে

গীতিকার কাহিনীর নাটকীয়তা অধিকতর জটিল এবং ঘনীভূত হয়ে উঠেছে।

প্রেম উভয় কাব্যের উপজীব্য হ'লেও—প্রেমের রূপায়ণ উভয় কাব্যে এক নয়। বৈষ্ণব-সাহিত্যের প্রেম আধ্যাত্মিক রাজ্যের। স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের ভাষায় "বৈষ্ণবপদাবলীর কেন্দ্রীভূত এক স্বর্গীয় উপাদান আছে, উহা মানবীয় প্রেমগীতি গাহিতে গাহিতে যেন সহসা স্বর চড়াইয়া কি এক অজ্ঞাত সুন্দর রাগিনী ধরিয়াছে, তাহা ভক্ত ও সাধকের কর্ণে পৌঁছিতে সমর্থ হইয়াছে।" রাধা-কৃষ্ণ যেন স্বর্গ হ'তে দু'দিনের জন্যে মর্তে এসে মর্তের কুঞ্জবনে স্বর্গের লীলা করে আবার স্বর্গের সোনালী পথ বেয়ে অনন্তলোকে চলে গেছেন। প্রেমমোন্মাদিনী রাধার কাছে তাই সমাজের বন্ধন নেই গুরুজনের অবরোধ নেই, গৃহের গণ্ডীও বিচ্ছিন্ন। সকল দুরতিক্রমী বন্ধন তিনি ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছেন কিন্তু মৈমনসিংহ গীতিকার নায়িকাগণ দুর্বার প্রেমোন্মাদনায় মত্ত হয়েও লজ্জার অবগুণ্ঠনে অবনত, সমাজে শ্রদ্ধাবান, গৃহের কুলবধূ। মৈমনসিংহ গীতিকার সম্পাদক কী অপূর্ব ভাবেই না এই উভয় নায়িকার প্রেম পার্থক্য নিরূপণ করেছেন, "এই ভালবাসার (মৈমনসিংহ গীতিকার নায়িকাগণের) পুরস্কার—দুঃসহ অত্যাচার উৎকট বিপদ মৃত্যুও বিষ-পান। এই পুরস্কার পাইয়া বন্ধুর দুরারোহ দুর্গম পথে অনুরাগের খর প্রবাহ চলিয়াছে ; স্বীয় গতির আনন্দে ঝংকৃত হইয়া সমস্ত বাধা উপেক্ষা-পূর্বক এই আত্মতৃপ্ত, সংসার-বিমুখ, উর্দ্ধমুখী মন্দাকিনী স্বীয় মানস-কল্পলোকের সন্ধানে ছুটিয়াছে। বৈষ্ণব কবিতা বঙ্গরমণী সমাজ-দ্রোহী পরিজনের প্রতি উপেক্ষাময়ী, দুর্জয় দর্পশীলা। কিন্তু এই সকল কথায়, তিনি গৃহের-গৃহলক্ষী, সমাজের নিকট নতশিরা, তাঁহার দর্প-অভিমান নাই, লজ্জা অবগুণ্ঠন তিনি টানিয়া ফেলিয়া রাজপথে বাহির হয়েন নাই, কিন্তু তথাপি অনুরোগের ক্ষেত্রে তিনি জগজ্জয়ী,—কুটীরে থাকিয়াও তিনি স্বর্গের বৈভব দেখাইয়াছেন। সমাজের অনুশাসনে ধরা দিয়াও, তিনি চিরমুক্ত, আত্মার অটল বল প্রকাশ করিতেছেন, সমাজের ভ্রূকুটিতে

তিনি মর্মপীড়া পাইতেছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার অনুরাগ সেই বাধায় আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।"

বৈষ্ণবপদাবলীর প্রেমে আধ্যাত্মিকতার সুর প্রধান কিন্তু মৈমনসিংহ গীতিকার প্রেম বঙ্গ-বালার প্রাণ সম্পদ। প্রেমের মলয়-সমীরণে প্রকৃতিগতভাবে বঙ্গ-কুমারীর হৃদয়ে যে প্রেম-শতদল বিকশিত হ'য়ে ওঠে—গীতিকায় নিহিত রয়েছে সেই প্রেমের নিবিড়তম পরিচয়। নীতিবোধ ধর্মবোধ এবং সংস্কার বোধ এই ত্রিবিধ সঙ্গম-তীর্থে এই প্রেম অত্যুজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে।

॥ পাঁচ ॥

॥ মৈমনসিংহ গীতিকা ও বাংলা উপন্যাস ॥

আধুনিক বাংলা উপন্যাস বাস্তবানুগ এবং কর্ম-বহুল মানুষের জীবন-বেদ। এর প্রতিটি পৃষ্ঠা দেববাদ-নির্মুক্ত মানবতার বিজয়গানে মুখর। বাস্তবতার রূপালেখ্যে এবং কর্ম চঞ্চল মানুষের জীবন-বিন্যাসে এগুলি আমাদের হৃদয়ের গোপনতম স্থান সহজেই অধিকার করে নিয়েছে। সর্বোপরি এর ঘনসন্নিবিষ্ট ঘটনাজাল, নাটকীয় উপস্থাপনা, প্রেম-বৈচিত্রের সীমাহীন বিস্তার আমাদের কর্মক্লান্ত মনকে কী নিবিড় ভাবেই না আর্কষণ করে। আধুনিক উপন্যাসের এই সকল প্রধান লক্ষণগুলি বীজাকারে বাংলা মাটির প্রাণ-সম্পদ মৈমনসিংহ গীতিকার মধ্যে নিহিত রয়েছে। অঙ্গসৌষ্ঠবের কথা বাদ দিলে মৈমনসিংহ গীতিকা এবং আধুনিক উপন্যাসের প্রাণ স্পন্দন একই আবেগে কম্পিত হ'য়েছে। উভয়ই একই উৎসমূল হতে বেগ নিয়ে একই সমান্তরাল সরল রেখায় দিগন্ত পরিভ্রমণ করেছে। প্রকাশ-রীতি ছাড়া আবেগ উভয়ের একই ঝংকার উভয়ের এক, পটভূমিতে কোনই বিভিন্নতা নেই।

মধ্যযুগের আখ্যায়িক কাব্যের অন্যতম শাখা মঙ্গল-কাব্য সমূহের মধ্যে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষার কথা সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করে। এই সূত্রে অনেকেই মঙ্গলকাব্যকে আধুনিক উপন্যাসের পূর্ব-সূচনা বলে উল্লেখ করেন। শ্রদ্ধেয় আশুতোষ ভট্টাচার্য

মহাশয় তো স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণাই করেছেন: "যে সকল চারিত্রিক উপাদান অবলম্বন করিয়া আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সার্থক উপন্যাস রচিত হইয়াছে, বিজয় গুপ্ত এখানেও সেই উপকরণগুলিরই সন্ধান পাইয়াছেন এবং তাহাই তাঁহার কাব্য রচনার উপজীব্য করিয়াছেন। এই সূত্রে বিজয় গুপ্তের কাব্য আধুনিক বস্তুতান্ত্রিক কথা-সাহিত্যের অগ্রদূত।" মন্তব্যটি অস্বীকার করা যায় না—কিন্তু অতিভাষণ-দুষ্ট। মঙ্গলকাব্যেব চরিত্রগুলির লীলা-মাধুরীতে হয়তো আধুনিক উপন্যাসের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে, ঘটনা বিন্যাসেও হয়তো তার পরিচয় জড়িয়ে আছে কিন্তু আধুনিক উপন্যাসে দেববাদ-বিনির্মুক্ত মানবিকতার যে বলিষ্ঠ সরব উচ্চারণ-বাণী ঘোষিত হ'য়েছে মঙ্গলকাব্যে তার পরিচয় কোথায়? মঙ্গল-কাব্যে যে দেব-দেবীর ভয়াল পদভারে মানব-কুল ভগ্ন-মেরু! মানব-সমাজের নব জাগরনের নব উত্থাপন এ কাব্যে নেই এ কাব্য মর্তের মানবীয় শক্তি ধ্বংসস্তূপের ওপর দেবদেবীর নিষ্ঠুর-নিপীড়নেব বিজয়গাথা। এ কাব্যের সুবিশাল রাজ্যে একচ্ছত্র সদর্প-সম্রাট অলৌকিক দেবদেবী। সুতরাং আধুনিক ঔপন্যাসিক-ঘটনা বিন্যাস এবং মানবের সুখ-দুঃখের কিছু পরিচয় এসব কাব্যে বর্তমান থাকলেও আধুনিক উপন্যাসের পুর্ব-সূচনা বলা যায় না কোন মতেই। কিন্তু মৈমনসিংহ গীতিকায় দেবদেবীর এই অবাঞ্ছিত উপদ্রব নেই। এ কাব্যের জীবন স্রোত মানবীয় জীবন-রসে স্ফটিক-স্বচ্ছ, আকস্মীক কোন অলৌকিকত্ব এসে সেই স্রোতকে আবিল করে তুলতে পারেনি। অবজ্ঞাত পল্লীর অশিক্ষত নরনারী পৃথিবীর রঙ্গ-মঞ্চে জীবন নাট্যের যে প্রেম-লীলাঙ্ক অভিনয় করেছে এ গীতিকা সেই লীলাভিনয়ের অত্যুজ্জ্বল রূপায়ন। মানব-জীবনের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনার বর্ণবহুল বিন্যাসে গীতিকাগুলি যেন বর্তমান উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। মহুয়ার জীবনের যে দুঃসহ বেদনা, চন্দ্রাবতীর জীবনের যে অপরিসীম দুঃখ মদিনার জীবন-সায়হ্নে যে বিমলন ট্রাজেডী ঘনায়মান হ'য়ে উঠেছে তা আমাদের হৃদয়কে করুণ-রসে অভিসিক্ত করে তোলে। এদের দুঃখময় জীবন বর্ণনায় সর্বত্র বাস্তবতার অভিনব ছায়াপাত ঘটেছে। কোথাও

এরা এই তৃণ-শ্যামল ধূলি-মলিন পৃথিবীর উপরে উঠে যায় নি। আধুনিক উপন্যাসের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য নায়ক-নায়িকার জীবন-প্রবাহে আর এক উপনায়ক নায়িকা আনয়ন করে, প্রেম-ত্রিভুজ রচনা করা—বলাবাহুল্য মৈমনসিংহ গীতিকার সর্বত্রই উপনায়ক নায়িকার আবির্ভাবে জটিল আবর্তনের সৃষ্টি হয়েছে। এদের আগমনে আধুনিক উপন্যাসের মত মৈমনসিংহ গীতিকার কাহিনী-গ্রন্থি ক্রম-জটিল হ'য়ে উঠেছে। এই ক্রম জটিলতাকে আবার সুদৃঢ় ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে কুট্টিনী বুড়ি কবং চিকণ গোয়ালিনীর মত কয়েকটি উচ্ছিষ্ট জীব। আধুনিক উপন্যাসে এমন চরিত্র বিরল নয়। কোন দেবত্ববাদ নেই, কোন ধর্মপ্রচার নেই—উপন্যাসেব বস্তুনিষ্ঠ একান্ত বাস্তব কাহিনীই গীতিকার উপজীব্য। এখানেও গীতিকাগুলির সাথে আধুনিক উপন্যাসের ঘনিষ্ট যোগ বর্তমান।

আখ্যায়িকাগুলিতে তৎকালীন সমাজেব যে চিত্র ফুটেছে তা' সংক্ষিপ্ত হলেও বাস্তবতার দিক দিয়ে নিখুঁত। শরৎচন্দ্রের 'বামুনের মেয়ে' ইত্যাদিতে সমাজের যে দুষ্ট প্রকৃতির সমাজ পতির সন্ধান পাই—এই গীতিকার অনেকগুলি আখ্যানে তেমন চরিত্র ছড়িয়ে আছে। শাস্ত্রীয় অনুশাসনে এবং স্বেচ্ছাচারী বামুন ইত্যাদির অনুপীড়তে গীতিকাব অনেকগুলি চরিত্র ম্লান না হয়েও ধ্বংসের পথে পা বাড়াতে বাধ্য হয়েছেন —আধুনিক উপন্যাসের বহু স্থানেই এর নজির মিলবে। গাতিকার অনেকগুলি কাহিনীতে আরণ্যক-জীবনের বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃ-প্রকৃতির যে পরিচয় পাই 'কপালকুণ্ডলার' মত বহু উপন্যাসেই তার চিত্রণ ঘটেছে। কিন্তু এই সকল ছাড়াও আর একটি স্থানে বুঝি উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্টতম সম্পর্ক বিদ্যমান। শ্রদ্ধেয় শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়ের ভাষায় তা অনবদ্য হ'য়ে ফুটেছে: "....আভ্যন্তরীন সমাজপীড়নের কোন সুলভ সমাধান নাই। যে সামাজিক সংকীর্ণতা মানুষের সুখের পথে শেষ অন্তরায় হইয়াছে তাহার প্রতিবিধান দৈবেরও ক্ষমতাতীত। কাজীর শূলের ব্যবস্থা হইল কিন্তু দুর্বলচিত্ত চান্দবিনোদ বা তাহার আচার মূঢ় আত্মীয়-স্বজনের জন্য সেরূপ কোন আশু ফলপ্রদ প্রতিকারের ব্যবস্থা নাই। কারকুনকে

নরবলি দিয়া আখ্যায়িকা হইতে বিদায় দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু অর্থলোভী আত্মীয়াধম ভাটুক ঠাকুরের আসন সমাজবক্ষে স্থিরতর রহিয়াছে। অত্যাচারী কাজী, দেওয়ান প্রভৃতি প্রবল প্রতিক্রিয়ার বেগে জ্যা-নির্ম্মুক্ত ধনুকের ন্যায় দূরে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে কিন্তু নেতাই কুটনী, চিকন গোয়ালিনী, প্রভৃতি জীব, যাহারা অপরের লালসার বহ্নিতে ইন্ধন যোগাইয়া আসিতেছে ও পারিবারিক জীবনের সুখ-শান্তি পবিত্রতা নষ্ট করিতেছে, তাহারা চিকিৎসাতীত দুষ্ট ব্রণের ন্যায় সমাজ-দেহে অক্ষয় হইয়া বিরাজ করিতেছে। এই দিক দিয়া বর্তমান কালের সমাজ-জীবনের সহিত ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের একটা অক্ষুণ্ণ যোগসূত্র রহিয়া গিয়াছে।" এই গীতিকায় যে উপমা ব্যবহার করা হয়েছে তা একান্তভাবে প্রকৃতির নিজস্ব, সংস্কৃত-সাহিত্যের ঢক্কানিনাদের অবাঞ্ছিত প্রবেশ বাংলার পেলব মসৃণ সুরটি গীতিকা হ'তে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি, নায়িকাদের শোকোচ্ছ্বাস আমাদের হৃদয়ের স্পর্শ করে। এই গীতিকায় কাজী বা দেওয়ানদের যে অত্যাচারের কথা বলা হয়েছে তা সবল কর্তৃক দুর্বলের ওপর অত্যাচার, শাসক কর্তৃক শাসিতের ওপর নিপীড়ন—এই কাজী বা দেওয়ান শেতাঙ্গ ইংরেজ বেনিয়াদেরই প্রকারভেদ মাত্র। আধুনিক উপন্যাসের বহু পৃষ্ঠায় হয়েছে এই শ্বেতাঙ্গ অত্যাচারের চিত্রাঙ্কণ। সর্বোপরি "ভাব প্রকাশে কথ্য ভাষার প্রয়োগ ইহাদিগকে উপন্যাসের আরও নিকটবর্তী করিয়াছে।....উপন্যাস সাহিত্যের পুর্ব-সূচনার দিক্ দিয়া মৈমনসিংহ গীতিকার প্রয়োজনীয়তা সর্বদা স্বীকার্য্য।" কিন্তু মৈমনসিংহ গীতিকাকে আধুনিক উপন্যাসের পুর্ব-সূচনা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার পিছনে আমাদের এতসব প্রচেষ্টাকে শ্রদ্ধেয় আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় একটি কথায় উড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন আধুনিক উপন্যাসে মৈমনসিংহ গীতিকার কোন প্রভাব নেই—কেননা এই সব গীতিকা সমুহের আবিষ্কার এই মাত্র সেদিন সম্পন্ন হয়েছে। এতদিন তারা অনাবিস্কৃত অবস্থায় মৈমনসিংহের ঝোপে জঙ্গলে আর্তনাদ করে মরছে। সুতরাং শ্রদ্ধেয় ভট্টাচার্যের মতে "চণ্ডীমণ্ডপের কৃত্রিম

ধারাটিই ভারতচন্দ্র প্রমুখ কবিগণের সহায়তায় নব প্রতিষ্ঠিত নাগরিক দরবারের সিংহদ্বার পর্যন্ত পৌঁছিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল উন্মুক্ত মাঠের সহিত্য পল্লীর মাঠে মাঠেই বিকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে, কোন সুসংবদ্ধ রূপলাভ করিয়া আধুনিক সাহিত্য সংস্কৃতির অলংকার স্বরূপ হইতে পারে নাই। সেইজন্য বাংলার লোক কথাও গীতিকার মধ্যে বাংলা উপন্যাসের সূচনা দেখা গিয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহা দ্বারা আধুনিক উপন্যাস পুষ্টিলাভ করিতে পারে নাই।" শ্রদ্ধেয় ভট্টাচার্য মহাশয়ের মন্তব্যকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না কিন্তু বিপক্ষে কিছু বলা যায়। পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় রূপ কথা, লোক-গাথা এবং গীতিকাগুলিই আপন আপন সাহিত্যে আধুনিক উপন্যাসের জন্ম দিয়েছে। আমাদের বাংলা সাহিত্যেও ঐ একই বাপার সংঘটিত হয়েছে। গীতিকাগুলি আনাবিস্কৃত ছিল এবং পুস্তকাকারে পূর্বে প্রচারিত হয়নি বলেই যে তারা আধুনিক উপন্যাসে কোন বেগ সঞ্চার করেনি এ কথা সর্বাংশে সত্য নয়। এই গীতিকাগুলি অনাবিষ্কৃত বাংলার আপামর জনসাধারণের নিকট ছড়িয়ে পড়েছিল—ঠাকুর মা এবং প্রাচীন বয়বৃদ্ধ ব্যক্তিদের নিকট থেকে এমন গল্প আমরা বহু শুনেছি। ঠাকুর মা জাতীয় বয়বৃদ্ধারাই এসব .গীতিকাকে নিখিল বাংলায় ছড়িয়েছেন। সুতরাং গীতিকাগুলি যে আধুনিক উপন্যাসের সাথে একেবারেই সম্পর্ক শূন্য তা কোন মতেই স্বীকার করা চলে না। পুস্তকাকারে বহু পূর্বে প্রচারিত হ'লে যে প্রভাব গভীর এবং ব্যাপক হ'তো—অমুদ্রিত অবস্থায় মৌখিক প্রচারের মাধ্যম ব্যাপকতার পরিমাণ সংকুচিত হয়েছে মাত্র।

।। ছয় ।।

।। মৈমনসিংহ-গীতিকা বাংলা-মাটির সম্পদ ।।

স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় মৈমনসিংহ-গীতিকার অবিষ্কার-প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন: "এই পল্লিগাথার আবিষ্কার আমার চক্ষে খুব বড় রকমের একটা জাতীয় ঘটনা।" কেননা এই গীতিকাগুলির প্রত্যেকটি কাহিনীর মধ্যে হ'তে জাতীয় ঐতিহ্যের সুমহান সুরতরঙ্গ অভিনবরূপে

স্পন্দিত হয়ে উঠেছে। প্রতিটি কাহিনীর মধ্যে পাওয়া যায় বাংলার মাটির স্পর্শ, প্রতিটি আখ্যানের মধ্যে জড়িয়ে আছে পল্লী-প্রান্তরে ফুটে ওঠা কেতকী শেফালীর মধুর সুরভী' প্রতিটি গল্পের মধ্যে মিশে আছে নদীমাতৃক বাংলাদেশের পেলব-মসৃণ সায়াহ্ন-কোমলতা। এর ভাষা ভাস্কর্য-সুঠাম অলংকার দীপ্তিতে প্রোজ্জ্বল নয়—গ্রামীন গণচিত্তের সরল কথ্য রূপ। এর উপমা বিদেশী স্বপ্নরঙীন ডেফোডিল পুষ্প এবং শোয়ালো পাখী নয়—শ্যামাঙ্গ-উজ্বল বাংলাদেশের বিশাল বনানী' সদাহাস্য চাঁপা-কদম এবং পত্র-পল্লব অন্তরালবর্তী বৌ কথা কও পাখীর সুরেলা ডাক। এর পরিব্যাপ্তীর দিগন্তে নটারডেম, টেম্‌স নদীর সুড়ঙ্গ, রোমের ভ্যাটিকান নেই, আছে পূর্ব-মৈমনসিংহের ঝিল ও তড়াগ, সর্পব্যাঘ্র-সংকুল অরণ্যভূমি স্বর্ণপ্রসূ শালীধানের দিগন্ত বিথারী বিস্তার। এর চরিত্রাবলী মিসেলেণ্ডা, ডেসডেমনা, নোরা-র দীপ্তিরং-এ রঙীন নয়—মলুয়া মহুয়া, মদিনার শান্ত দ্যুতিতে শুভ্রময়। এই চরিত্রাবলীর আবাসভূমি তীব্রদ্যুতি-ঝলসিত রাজপ্রাসাদ নয়, অনির্বান দীপালোকে সমুজ্জ্বল মাটীর পর্ণকুটির। এই গীতিকাগুলির সর্বত্রই বাংলা মাটির কী অমোঘ আকর্ষণ, কী মহান সংযোগ! বাংলার মৃত্তিকার প্রবাহমান নদ-নদী, বাংলার মৃত্তকায় দোদুল্যমান তৃণলতা, বাংলার মৃত্তিকার জল-বায়ু-পশু-পাখীর কলরবে এই গীতিকাগুলির আভ্যন্তরীণ সকল নীরবতা মুখর হ'য়ে উঠেছে।

॥ ক ॥ ভাষার অকৃত্রিমতা ঃ

মৈমনসিংহ গীতিকায় আমরা যে ভাষা পেয়েছি তা' কৃত্রিমতার কালিমায় কলুষিত নয়—অকৃত্রিম ভাষার অনাবিল স্রোতধারায় অনন্য-সুন্দর। যে কালে এই গীতিকাগুলির সৃষ্টি-যজ্ঞ মৈমনসিংহের অখ্যাত অজ্ঞাত পল্লী-প্রান্তরে চল্‌ছিল সেকালে বাংলা ভাষা ক্রমান্বয়ে দেবভাষার অতিরঞ্জনে স্ফীত, অলংকার-অনুপ্রাসে মুখর এবং শব্দৈশ্বর্যে ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠছিল কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় এই গীতিকাগুলিতে সেই অতিরঞ্জনের এতটুকু স্পর্শ নেই—এগুলি আশ্চর্য ভাবে সেই দুরারোগ্য ছোঁয়াচ-ব্যাধি

হ'তে মুক্ত। এখানে আমরা চাষী-মুখের সেই অকৃত্রিম কথ্য ভাষাটিকেই পেয়েছি। গীতিকাগুলিতে বহুতর উদ্দু-ফারসী-আরবী ভাষা লক্ষ করা যায়—কিন্তু এগুলি বলপুর্বক উপর হ'তে চাপান হয়নি। সে সময় দেশের শাসনকর্ত্তা মুস্লিম সম্প্রদায়—এবং তারই প্রভাবে সুদীর্ঘ পাঁচ-ছয় শতাব্দী ধরে ক্রম-লেন-দেনের প্রভাবে বাংলা ভাষাটা হিন্দু মুস্লিমের যৌথ-সম্পত্তি হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। "এই মিশ্রভাষা আমাদের চাষার কুটিরে, এমন কী হিন্দুর অন্তঃপুরে পর্যন্ত ঢুকিয়াছে। বাংলার অভিধান হইতে এখন আর তাহা বাদ দেওয়া চলে না। কিন্তু হিন্দু লেখকগণ মুখে যেভাবে কথা কহিয়া থাকেন, সংস্কৃতের ঘোর প্রভাবের বশবর্ত্তী হইয়া লিখিবার সময় সেগুলি অন্যরূপ করিয়া ফেলেন। শতবার কথিত ও শ্রুত 'খাজ্না' তাঁহাদের লেখনীতে 'রাজস্ব' রূপে পরিণত হয় —চিরপরিচিত 'ইজ্জৎ' 'সম্মান' হইয়া দাঁড়ায়। এইভাবে 'জবরদস্তি' 'বলপ্রয়োগ,' 'দুস্তি' 'বান্ধবতায়,' 'জমি' মৃত্তিকায়,' 'আসমান' 'আকাশে' এবং আরও শত শত নিত্যকথিত বিদেশী শব্দ যাহাদের অস্থি মজ্জা বাংলার জলবায়ুতে দেশীয় রূপ ধারণ করিয়াছে, তাহারা লিখিত সাহিত্যে সংস্কৃত আগন্তুকের নিকট নিজেদের স্থান ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়া থাকে।" হিন্দু লেখকগণ যেমন বাংলাকে আরবী-ফারসী-ঘেঁসা করে একপ্রকার জগাখিচুড়ী 'মুসলমানী বাংলা' করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এই উগ্র হিন্দু-মুস্লিম সম্প্রদায় ভুলে গিয়েছিলেন যে "ভাষা জিনিষটা পণ্ডিত বা মোল্লার হাতের মোরব্বা নহে। দেশের জলবায়ু ও আলোকে ইহা পুষ্ট হইয়া থাকে। ইহা স্বীয় জীবন্ত গতির পথে, ইচ্ছাক্রমে বর্জন ও গ্রহণ করিয়া চলিয়া যায়, স্বীয় ললাট-লিপিতে কোন শিক্ষকের ছাপ মারিতে চায় না।" মৈমনসিংহ গীতিকায় আমরা যে ভাষা পেয়েছি তা' বাংলা মাটির একান্ত আপন সম্পদ। কৃত্রিমতার কোন কালিমা এতে স্থান পায়নি। এ গ্রন্থের ভাষা যেন পথ-প্রান্তে তৃণ-শয্যায় আপনি বিকশিত হ'য়ে ওঠে যূথিকা পুষ্প—এর অঙ্গের ধূলি-মালিন্য এ আপনিই ঝেড়ে ফেলে। কিন্তু এই পুষ্প যখন বহুমূল্য গজ দন্তের টেবিলোপরি

কারুকার্য সমন্বিত পুষ্পাধারে স্থান পায় এবং তখনই যত গোলযোগ। কিন্তু মৈমনসিংহ গীতিকায় এই বনফুলই রক্ষিত হয়েছে। তাই "এই সকল গাথায় 'হস্তী' (হাতী) শব্দ 'আত্তি' 'বর্ষা' শব্দ 'বাস্যা, 'শ্রাবণ' শব্দ 'শাওন', 'মিষ্ট' শব্দ 'মিডা' 'শিকার' শব্দ 'শিগার' প্রভৃতি প্রাকৃত ভাবেই সর্বদা ব্যবহৃত হয়েছে। এখনও চাষারা এই ভাষায় পাড়াগাঁয়ে কথা কহিয়া থাকে। পণ্ডিত মহাশয়ের টোলে ঘুরিয়া আমাদের মাথা ঘোলাইয়া গিয়াছে, আমরা অভিধানের সাহায্যে প্রকৃত শব্দ সংশোধনপূর্বক সেই সংশোধিত ভাষাটাকেই বাঙ্গালা ভাষা বলিয়া পরিচয় দিতেছি।"—দীনেশচন্দ্র সেন। ভাষার এই অকৃত্রিমতা রক্ষিত হয়েছে বলেই মহুয়া কৃত্রিম রোষে নদ্যার ঠাকুরকে বল্‌তে পেরেছে:

"লজ্‌জা নাই নির্লজ্‌জ ঠাকুর লজ্‌জা নাইরে তর
গলায় কলসী বাইন্ধ্যা জলে ডুব্যা মর॥"

এবং এই ভাষাতে নদ্যের ঠাকুর আপন অন্তরের অসীম আকূতির সবটুকু উজাড় করে উত্তর দিয়েছে:

"কোথায় পাইবাম কলসী কন্যা, কোথায় পাইবাম দড়ি
তুমি হও গহীন গাঙ্গ আমি ডুব্যা মরি॥"

এই একান্ত সজীব আন্তরিক ভাষাই মৈমনসিংহ-গীতিকার প্রধান বৈশিষ্ট্য। মাটির কথা মাটির ভাষাতেই ছন্দিত আন্দোলনে অনবদ্য হ'য়ে উঠেছে।

॥ খ ॥ বাংলা মৃত্তিকা-জাত উপমা:

এই গীতিকা সমূহে যে সকল উপমা ব্যবহার করা হ'য়েছে তা' একান্তভাবে বাংলারই। এই সকল উপমার জন্যে কবিকে অসীম স্বর্গালোকে উঠ্‌তে হয় নি, স্বর্ণ-ঝলকিত রাজপ্রাসাদেও পদার্পণের প্রয়োজন হয়নি—এই উপমা-রাজী আহৃত হ'য়েছে বিপুল বিস্তারিত বনভূমি হ'তে, বর্ষা-বিস্ফারিত নদ-নদী হ'তে, নীলিমার উদার শ্যামলীমা হ'তে। এক কথায় যা প্রত্যক্ষ এবং বাস্তব, যা মনোরম এবং সুন্দর সেই সমুদয় বস্তুগুলি

প্রত্যক্ষদর্শী কবিদের কল্পনায় নিবিড় ভাবে ধরা দিয়েছে। মহুয়ার রূপ-বর্ণনায় কবি বলেছেন ঃ

হাট্টীয়া না যাইতে কইন্যার পায়ে পরে চুল!
মুখেতে ফুট্টা উঠে কনক চাম্পার ফুল॥

এখানে মহুয়ার দীর্ঘায়িত কেশের বর্ণনা দিতে গিয়ে 'আজানুলম্বিত' এই বিশেষ কথাটির ব্যবহার নেই, মুখের শুভ্রতা ও নির্মলতার বর্ণনায় বহু-পরিচিত পূর্ণচন্দ্র এসে ভীড় জমায় নি—বাঙালীর অতিপরিচিত চাঁপা ফুল দিয়ে কবি মহুয়াকে কেমন মনোরম অনবদ্যতার দুষ্প্রাপ্য-মনোহর করে তুলেছেন। শত উপমা উৎপেক্ষায় যা' সম্ভব হ'তো না এক চম্পা-কলিতে তাই সম্ভব হ'য়ে উঠেছে! মহুয়া তাইতো আমাদের সম্মুখে কামনা-মদির রৌদ্র-বিলাসিনী চম্পা-সহচরী নয়—নিটোল-যৌবনা কৃষাণ-কুমারী। 'কমলা'র রূপ বর্ণনায় কবি আশ্চর্য দক্ষতার সাথে যে উপমাগুলি প্রয়োগ করেছেন তাতে কমলার রূপ শত ভাব-ব্যঞ্জনায় ঝলকিত হ'য়ে উঠেছে। অভিনব রূপাল্পনায় কবি যেন তুলির টানে টানে কমলাকে রেখাঙ্কনে জীবন্ত করে তুলেছেন।

চান্দের সমান মুখ করে ঝলমল।
সিন্দুরে রাঙ্গিয়া ঠুট তেলাকুচ ফল॥
জিনিয়া অপরাজিতা শোভে দুই আখি
ভ্রমরা উড়িয়া আসে সেই রূপ দেখি
দেখিতে রামের ধনু কন্যার যুগ্ম ভুরু।
মুষ্টিতে ধরিতে পারি কটিখানা সরু॥
কাকুনি শুপারি গাছ বায়ে যেন হেলে।
চলিতে ফিরিতে কন্যা যৌবন পড়ে ঢলে।
আষাঢ় মাস্যা বাশের কেরুল মাটি ফাট্টা উঠে!
সেই মত পাও দুইখানি গজন্দমে হাটে
বেলাইনে বেলিয়া তুলছে দুই বাহুলতা
কণ্ঠেতে লুকাইয়া তার কোকিল কয় কথা

রক্ত-রঙীন তেলাকুচ ফলের সাথে রক্তাভ ঠোঁট, সমীরণে কম্পমান শুপারি

গাছেব সাথে যুবতীব যৌবন-ভারাক্রান্ত দেহেব কম্পন, সজল আষাঢ়ের সরস মৃত্তিকা ভেদী বাঁশেব শ্যামল-সতেজ অঙ্কুবোদ্‌গমেব সাথে নব যৌবন-সম্ভারে সজ্জিতা যুবতীব অটল পদযুগল এবং বেলুনে বেলা নিটোলতাব সাথে সুকোমল বাহুদ্বয় উপমতি হওযায যৌবন-বাগ-দীপ্ত কমলার যে অপূর্ব মূর্তি আমাদেব সম্মুখে অঙ্কিত হযেছে বাংলা সাহিত্যে তা' বিরল-দৃষ্ট। অথচ প্রতিটি উপমাই আমাদেব কত পবিচিত, কত প্রত্যক্ষ!
দীর্ঘ বিবহ এবং বিচ্ছেদেব পব নদেব ঠাকুব যখন মহুয়ার সন্ধান পায় তখন তাব অতৃপ্ত হৃদযেব পবম শান্তিব বার্তা কবিব তুলিকায রেখায়িত হ'য়ে ওঠে এই ভাবে:

সাপে যেমন পাইল মণি পিয়াসী পাইল জল।
পদ্মফুলের মধু খাইতে ভমরা পাগল ॥

এখানে সাপ ও মণি, পদ্ম, ও ভমবা, মহুযা ও নদেব চাঁদেব অন্তবাত্মাকে অপূর্ব ব্যঞ্জনালোকে সমুদ্ভাসিত কবে তুলেছে।
কঙ্কের বিরহে, লীলার হৃদয়ে বজ্রশেল নিক্ষিপ্ত হ'যেছে—বিবহের সুতীক্ষ্ণ দহনে লীলাব লালিযাস অঙ্গশ্রী মলিন হ'য়ে গেছে:

ভাবিতে ভাবিতে লীলার বদন হইল কালা।
সাপের বিষ হইতে অধিক বিরহের জ্বালা ॥

এই বিবহই লীলাব দীঘল কেশপাস চাচুলীব আঁশে পবিণত হয:

গঙ্গার তরঙ্গ লীলার দীঘল কেশপাশ।
সে কেশ শুকাইয়া হইল চাচুলীর আঁশ ॥

চাচুলীর আশেব সাথে (বাঁশ চাচিলে যেরূপ আশ হয) বিবহিনী লীলাব বিশুষ্ক কেশেব তুলনা কি অনন্য সুন্দব এবং মর্মান্তিক। এই উপমাগুলি লীলাব বিশীর্ণ ছবিকে সুন্দবরূপে তুলে ধবেছে। কিন্তু উপমাব চাতুর্য ও প্রয়োগ মহিমা বুঝি সর্বোচ্চ গ্রামে (climax) পৌঁচেছে বিবহ-কাতবা লীলাব শীর্ণ দেহ বর্ণনায়:

প্রথম যৈবন কন্যা কমনীয় লতা।
সে দেহ শুকাইয়া হইল ইক্ষুকের পাতা।

বৈকালীর রাঙ্গা ধনু মেঘেতে লুকায়।
দিনে দিনে ক্ষীণ তনু শয্যাতে শুকায় ॥

বিরহের এই জীর্ণ দশা, এই অন্তিম অবস্থা অন্য কোন ভাষায় এমন হৃদয়বিদারক হ'য়ে উঠবে ? এক বিশুষ্ক ইক্ষুকের পাতা লীলার অন্তর্ভেদী সমুদয় বেদনা-ব্যথাকে উজাড় করে আমাদের অন্তরমূলে সঞ্চারিত করে দিয়েছে। এ উপমা কত সজীব, কত জীবন্ত, কত গভীর গূঢ় অর্থ ব্যঞ্জক ! মৈমনসিংহ গীতিকার মৃত্তিকাজাত উপমাগুলির চরম সার্থকথা এইখানে।

গ ॥ মাটির চিত্র ঃ

মৈমনসিংহ-গীতিকায় মাটির ভাষায়, মাটির উপমায় যে চিত্র ফুটেছে তা' একান্ত ভাবে মাটিরই চিত্র। মৃত্তিকার সুধারসে তা' সিক্ত। মৃত্তিকার মোহাঞ্জন-স্পর্শে তা' পরমসুন্দর। এই চিত্র কোন দূব পথের কৃত্রিম ইট-পাথরের ধাঁধানো সৌন্দর্যকে প্রকট করে তোলে না—মুক্ত প্রকৃতির শ্যামল-সৌন্দর্যকে উন্মুক্ত করে দেয়। বর্ষাব কদম্ববৃক্ষ, নদীর তীর-ভূমে কেয়াফুলের ঝাড়, মান্দার গাছের ডালে ঘেরা কদলীবন, চাঁপা-কুমুদের কুসুমাস্তীর্ণ পথ এবং সর্বোপরি ছায়া-ঢাকা শ্যামল বৃক্ষতলে ছোট ছোট কুটির—স্বপ্নমন্থর সোনালী দিনের মত এক অপূর্ব রহস্যালোকে আমাদের নিখিল চিত্তকে উদ্বেল করে তোলে। বিরহী কঙ্ক যে পথে বাঁশী বাজিয়ে চলে সেই বিজন-প্রান্তরের গলিপথ আমরা যেন স্পষ্টই দেখতে পাই, চাঁদ বিনোদ যে পথ দিয়ে হরষিত মনে ধান কাট্‌তে চলে সে পথ আমাদের কত পরিচিত, যে বনপথে কাঞ্চলরেখা বিসর্জিত হয়েছিল তা' আমাদের অজ্ঞাত নয়, যে পর্ণকুটিরাভ্যন্তরে বসে বিরহিনী মদিনা দুলালের জন্যে ব্যাকুল প্রতীক্ষায় পাণ্ডুর-ম্লান দিনগুলি যাপন করেছিল তা' আমাদের পরিচিত দিগন্তের উজ্জ্বল স্বর্ণ-দেউল। প্রথম ধান ঘরে আনার সময় যে অসীম আনন্দে চাষীদের অন্তরর্লোক আনন্দ মূর্চ্ছনায় রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠ্‌তো তা'র সার্থকতম প্রতীক চাঁদ বিনোদ। তার বারমাসীতে সেই আনন্দ-রোল শত ধারায় গুঞ্জিত হ'য়ে উঠেছে। এইমৃত্তিকার একটি সুস্পষ্ট

চিত্র পাই স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেনের ভাষায়: "গুরু গুরু ডাকে মেঘ ঝিল্‌কি ঠাডা পড়ে, ছত্রটিতে 'ঝিল্‌কি'শব্দের দ্বারা বর্ষার তমসাচ্ছন্ন আকাশ হঠাৎ বিদ্যুৎ-স্ফুরণে কিরূপ ক্ষণতরে আলোকিত হইয়া যায়, পূর্ব-বঙ্গবাসীর চক্ষে সেই চিরপরিচিত দৃশ্যের আভাস আনয়ন করিতেছে। 'হাতেতে সোনার ঝাড়ি বর্ষা নেমে আসে'—কি সুন্দর পদ! তাহা হইতে 'বৌ কথা কও' পাখীর বর্ণনা। মাথায় বজ্র, অনবরত শ্রাবণের জলে সিক্ত দেহ,— সেদিকে দৃকপাত নাই— পাখীটা কাঁদিয়া কাঁদিয়া পথে পথে 'বৌ কথা কও' বলিয়া অভিমানিনী প্রিয়তমার মান ভাঙ্গাইতে চেষ্টা পাইতেছে। "শাউনিয়া ধারা শিরে বজ্র ধরি মাথে। 'বউ কথা কও' বলি কাঁদে পথে পথে"॥....অপরাহ্ন কাল,....আরালিয়াতে আসিয়া তৃণশস্যময়ী বনভূমির উপান্তে পুষ্করিণীর পাড়ে কদম গাছের তলায় দাঁড়াইয়া 'ঝড় জঙ্গলে ঘেরা' মান্দারের বেড়ায় বেষ্টিত রন্তাবন ও জলের নীলাভ শোভা দেখিতে দেখিতে বাপ্পীস্পর্শ-শীতল বায়ুর হিল্লোলে চাঁদ বিনোদ ঘাটের উপর ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। তখন মলুয়ার মেঘের মত নিবিড় কৃষ্ণ-কুন্তল তাহার পায়ে লুটাইতেছিল ও তাহার কলসীতে জল ভরিবার শব্দ শুনিয়া মেঘ-গর্জন মনে করিয়া কুড়াপাখী চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল। সেই কুড়ার ডাক আসন্ন বর্ষার অবেশ আনয়ন করিয়াছিল।" এ চিত্র কী গভীর মর্মস্পর্শী! এই পটভূমিতে যখন দুর্জয় প্রেম-শক্তিশালিনী মহুয়াকে 'সীমাহীন আকাশের নৃত্যলীলা ময়ূরীর মত অসীম বেগে জৈতা-পাহাড় হ'তে ছুটে বামুন-কান্দা গ্রামে আস্‌তে দেখি, যৌবন-সম্ভরা কমলাকে যখন তৃণ বিস্তীর্ণ-হুলিয়া গ্রামের পথে পথে ভ্রমণ করতে দেখি, উলুয়াকান্দা-বেদের দীঘি-ঠাকুরবাড়ীর উপর দিয়ে যখন ধীর পদসঞ্চারে সরল অনাড়ম্বর দুরন্ত প্রেমের এক সদর্প মিছিল অস্পষ্ট রেখার মত চলে যায় তখন আমাদের সমগ্র সত্তা মাটির পরিচিত স্পর্শে দুরন্ত আবেগে আন্দোলিত হয়ে ওঠে। দীঘলহাটি গ্রামের প্রান্তর সন্নিহিত কেয়াবনে রোরুদ্যমানা সোনাইয়ের শোচনীয় পরিণাম, বাঘরার হাওরে তার

মর্মান্তিক মৃত্যু—আমাদের সমগ্র মনপ্রাণকে ক্রন্দনাকুল করে তোলে। তারপর দস্যু কেনারামের সেই নল খাগড়ার বন গহণে কী অপূর্ব বেদনার স্মৃতিই না বহন করে আনে। সর্বোপরি সেই বার দুয়ারী ঘর, শানবাঁধান পুকুর ঘাট, বিশাল আম্র-বীথি, সীমাহীন শস্য-শ্যামল প্রান্তর সকলের সম্মিলনে অতিপরিচিত পল্লীর একটি চিত্র অঙ্কিত হওয়ায় আমাদের সমগ্র মনপ্রাণ মাটির রসে সিক্ত হ'য়ে ওঠে! মৈমনসিংহ গীতিকা তো তাই মৃত্তিকার সন্তান।

॥ সাত ॥

॥ মৈমনসিংহ গীতিকার নারী চরিত্র ॥

মৈমনসিংহ গীতিকার শ্রেষ্ঠ সম্পদ এই নারীচরিত্র। এই নারীচরিত্র গুলিই গ্রন্থখানিকে এক অখণ্ড স্বর্গীয় মহিমা দান করেছে। সমাজ যে প্রেমকে রক্ষা করেনা ববং যে প্রেম তার সমুদয় মহিমাও শক্তির প্রজ্জ্বলতায় সমাজকে রক্ষা করে—এই গীতিকাব প্রত্যেকটি নারী চরিত্র সেই চিরপবিত্র উজ্জ্বলতম নিষ্কলুষ মধুময় প্রেমের সার্থকতম প্রতিনিধি। প্রেমের অনির্বান দীপালোকে প্রতিটি চরিত্র হীরকোজ্জ্বল। "কোথাও কৃত্রিমতা, বাঁধাবাঁধি, মুখস্থ করা শাস্ত্রের গৎ ইহাব কিছুই নাই। পরিণয় আছে কিন্তু পুরোহিতের মন্ত্রপূত দম্পতীর চেলীর বাঁধের মত তাহা বাহ্যাড়ম্বর নহে। এই গীতি সাহিত্যের উদার মুক্ত ক্ষেত্রে প্রেমের অনাবিল স্রোত শতধারা ছুটিয়াছে, তাহা প্রস্রবণের মত অবাধ নির্ঝরের মত নির্মল, শ্যামল ক্ষেতের উপব মুক্তাবর্ষী বর্ষাব-অফুরন্ত মহাদানের ন্যায় অজস্র। এই ভালবাসার পুবস্কার—দুঃসহ অত্যাচার, উৎকট বিপদ, মৃত্যু ও বিষ পান। এই পুরস্কার পাইয়া বন্ধুর দুরারোহ দুর্গম পথে অনুরাগের খর প্রবাহ চলিয়াছে; স্বীয় গতির আনন্দে ঝংকৃত হইয়া সমস্ত বাধা উপেক্ষাপুর্বক, এই আত্মতৃপ্ত, সংসার-বিমুখ, উর্দ্ধমুখী মন্দাকিনী স্বীয় মানস কল্পলোকের সন্ধানে ছুটিয়াছে।" প্রতিটি চরিত্রেই এই 'উর্দ্ধমুখী মন্দাকিনী'র গর্জনোন্মুখ কল-গানে মুখর। প্রেমের অনাবিল ধারায় তারা প্রবাহমান। বিপদ

উৎপীড়নে, ঝঞ্ঝা ঘূর্ণাবর্তায় চরিত্রগুলি অটল-বলে স্থির। সকল বাধা বিঘ্ন প্রেম-মন্দাকিনীর দুর্জয় স্রোতে দিগন্তহারা হ'য়েছে।

এই মন্দাকিনীর উন্মাদ স্রোতেই মহুয়া জীবনের সকলবাধা ও বিপত্তিকে অতল সলিলে নিমজ্জিত করেছে। শ্রাবণের অবিরাম বারিবর্ষণের মত শত ধারায় দুঃখ বেদনা মহুয়ার জীবন বেলায় ঘনায়মান অন্ধকারের মত জমেছে, কিন্তু এই প্রেমের মুক্তাহার কণ্ঠে পরে মহুয়া চির বিজয়ী, মৃত্যুকে বরণ করে মৃতুঞ্জয়ী। মলুয়ার পুর্বরাগ, বাসর ঘরে স্বামীর সহিত আলাপ, কাজীর ধৃষ্ট প্রস্তাবের প্রত্যুত্তর—এই সমস্ত কি অপুর্ব। এই অতুলনীয় চিত্র জীর্ণ গৃহে, অনশনে স্বামী-বিরহে, দেওয়ানের হাবলিতে, সর্পদষ্ট স্বামীর পার্শ্বে এবং শেষ দৃশ্যে ডুবন্ত মন-পবনের নৌকায় বিচিত্রভাবে সর্বত্র অনুরাগের অরুণরাগে উজ্জ্বল। সর্বশেষে শাপগ্রস্তা লক্ষীর ন্যায়, বিজয়ী প্রেমের কিরীট অতল জলেডুবে যাচ্ছে। রাগে উজ্জ্বল, বিরোগে উজ্জ্বল সহিষ্ণুতায় উজ্জ্বল এই মহীয়সী প্রেমের সম্রাজ্ঞীর তুলনা কোথায়? চন্দ্রাবতীর জীবনে দেখি এই প্রেমের অপুর্ব ব্যঞ্জনা। শৈশব হতে যে প্রেম তিল তিল করে কঙ্ক ও লীলার জীবন-সমুদ্রে সীমাহীন তরঙ্গমালার মত পরিব্যাপ্ত হয়েছিল—ভাঁটার টানে সেই প্রেম-সমুদ্র যেদিন বিশুষ্ক হল সেদিনের তপস্যাচর্যা লীলার ধ্যান-সমাহিত মূর্তিকে ভুল্‌বে কে। সেই "চাইর কোন পুষ্কুনির পারে চম্পা নাগেশ্বর" পুষ্পচয়ন করা হ'তে বিবাহের পূর্ব দিন পর্যন্ত এ যে একটানা দুরূহ ব্রতের নির্মম অনুশাসন, ভগবানকে পাওয়ার জন্যে ভক্তের বিরামহীন ব্যাকুলতার মতই তা' গূঢ় অর্থবাহী। এই তীব্র প্রতীক্ষার পরিণতি হ'ল হৃদয়ভেদী এক সুগভীর দীর্ঘশ্বাসে। কারকুন এবং দেওয়ান ভাবনার লালসা-বহ্নিতে ইন্ধন না যুগিয়ে কমলা এবং সনাই উভয়েই ঘরছাড়া হ'য়েছে—নারী-ধর্মের বিপুল উদ্দাম তাদের এই দুর্গম পথে যাত্রা করার মুলে বেগ সঞ্চার করেছে। বহু উৎপীড়ন, গিরি-খাত অতিক্রমের পর অবশেষে কমলার সাথে রাজপুত্রের বিবাহ হয়েছে। কিন্তু প্রিয়তম মাধবকে

উদ্ধারের পর সাধ্বী সনাই বিষপানে আত্মহত্যা করলে সমগ্র কাহিনীটির উপর ট্রাজেডির যে করুণ সুর বেজে ওঠে তার রেশ হৃদয়ের গহনতম স্থান পর্যন্ত পৌঁছে আমাদের সমগ্র চিত্তকে বিষাদ মলিন করে তোলে। মদিনা চরিত্রের মাধ্যমে প্রেমের অপরিসীম মাধুর্য যেন নবীন রূপে বিকাশমান। তালাকের পরও যখন মদিনাকে আমরা দুলালের জন্যে প্রতীক্ষা করতে দেখি তখন আমরা বিস্ময়ে নির্বাক হ'য়ে পড়ি। মানবীয় প্রেমের সর্বোচ্চ পরিণতি বুঝি এখানেই। কেবলমাত্র অবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সম্মুখ সংগ্রাম কিংবা আত্মত্যাগের ভিতর দিয়ে যে নারীর শক্তি প্রকাশ পায়, তা' নয়—নীরব সহিষ্ণুতার ভিতর দিয়াও যে তার এক অপূর্ব মহিমা প্রকাশিত হয়, মদিনা আপন জীবন বাঞ্ছিতের পদতলে উৎসর্গ করে তাই প্রমাণ করেছে। এখানে মদিনা অনন্য সাধারণ, এখানে মদিনা দোসর-হীন।

মৈমনসিংহ-গীতিকার নারীচরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে প্রেমের এই বিচিত্র গতি অভিনবরূপে রেখাঙ্কিত হ'য়েছে। এক একটি গীতিকার অভ্যন্তর দিয়ে এক এক ভাবে এই প্রেম-রেখাঙ্কন উজ্জ্বলতর হ'য়ে উঠেছে। প্রতিটি আখ্যান ভিন্ন, প্রতিটি কাহিনী পৃথক কিন্তু তবুও সকল আখ্যান সকল কাহিনীর ভিতর দিয়ে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার ন্যায় প্রেমের দুর্বার প্রবাহ বহমান। এই সূত্রে সকল কাহিনীই আপন আপন বিভেদকারী প্রাচীর ভেঙে মহত্তর গণ্ডীতে শ্রীক্ষেত্রের মহা সম্মিলনে এক হ'য়ে মিশেছে। সেখানে তারা পৃথক নয়, সেখানে তারা বিচ্ছিন্ন নয়—সেখানে তারা একদেহ ধারণ করে একই রূপ লাবণ্যে ঝলকিত হয়ে উঠেছে। সবার মূলেই প্রেম, সবার মূলেই প্রেম-গীতার অভিনব মন্ত্রোচ্চারণ। তাই দেখি এই পল্লী-গাথার রমণীরা অনেকবার কুলধর্ম-বিসর্জন দিয়েছেন, কিন্তু কখনই নারী-ধর্ম পরিত্যাগ করেনি।

এই গীতিকার নারীচরিত্রগুলির পাশে পুরুষ চরিত্রগুলি যেন একান্ত নিষ্প্রভ। নারীচরিত্রগুলি রঙ্গমঞ্চের উজ্জ্বল পাদ-প্রদীপের সম্মুখে জীবন-নাট্য অভিনয়ে কর্মবহুল পুরুষ চরিত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ

হয়েছে আর পুরুষ চরিত্রগুলি চলে গেছে অন্তঃপুরিকার নিভৃততম কক্ষে। অন্ধকারাচ্ছন্ন নিশীথ-নীলিমার দিগন্ত ব্যাপী নারী চরিত্রগুলি পূর্ণচন্দ্রের মত কিরণ দান করেছে—তাদের অত্যুজ্জ্বল কিরণমালার পাশে নক্ষত্রবৎ ক্ষীণালোকিত পুরুষ চরিত্রগুলি যেন ম্লান পাণ্ডুর হয়ে গেছে। তাইতো দেখি মাধবকে উদ্ধারের জন্যে সনাই এগিয়ে গেছে, রাজপুত্রকে পাওয়ার জন্যে সমুদয় বিপদ-রাশি মাথায় করে নিয়েছে কমলা, নদের চাঁদকে পাওয়ার জন্যে তাই তো মহুয়ার আমরণ সাধনা, বিনোদের প্রেম-বিহ্বল বক্ষে মিলিত হওয়ার জন্যে তাইতো প্রেমোন্মাদিনী মলুয়া চালিয়েছে বিজয়-অভিযান। জীবন-যুদ্ধের ভীষণ রণভূমে স্ত্রী চরিত্র-গুলিই সেনাপতির গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেছে—পুরুষগুলি হীন পদাতিক মাত্র। সকল বাধা বিঘ্ন সকল অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে পরাভূত ধ্বংস স্তুপের উপর প্রেম-নির্ভিক বীর-রমণীগণ উড্ডীন করেছে প্রেমের বিজয়-পতাকা। অবশেষে স্মরণ করি এই গীতিকা-সংকলনের অপূর্ব বাণী ঃ "এই গীতিকাগুলির নারী-চরিত্র সমূহ প্রেমের দুর্জয় শক্তি, আত্মমর্যাদার অলঙ্ঘ্য পবিত্রতা ও অত্যাচারীর পরাজয় জীবন্তভাবে দেখাইতেছে। নারী-প্রকৃতি মন্ত্র মুখস্থ করিয়া বড় হন নাই, চিরকাল প্রেমে বড় হইয়াছে। জননীরূপে তিনি জগতের বরেণ্যা, স্ত্রীরূপে তিনি জগতের প্রাণ।........নাবী ধর্মের যে জীবন্ত মূর্তি-গুলি এই সকল গাথায় পাওয়া যাইতেছে—তাহারা পাতিব্রতে, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায়, বিপদে, ধৈর্য্যে, উপায়-উদ্ভাবনায় এবং একনিষ্ঠায় অতুল্য।"

॥ আট ॥

॥ একটি সার্থক গীতিকার পরিচয় ॥

বাংলায় বহুল প্রচলিত 'বাঁশ বনে ডোম কানা' প্রবাদটির অর্থ নতুন করে উপলব্ধি করলাম স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় কর্তৃক সংকলিত "মৈমনসিংহ-গীতিকা" পাঠ করে। এই বিশালায়তন গ্রন্থটির মধ্যে মোট দশটি গীতিকা সংকলিত হয়েছে। এর মধ্যে কোন গীতিকাটি যে সর্বোৎকৃষ্ট তা' নিঃসন্দেহে নির্ণয় করা অসম্ভব। এক একটি গীতিকার

অন্তর্মূলক হ'তে এক একটি স্বতন্ত্র সুর-ধ্বনি ঝংকৃত হয়েছে। আখ্যান-ভাগে প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র, আমাদের চিত্ত-ভূমিতে তাদের আবেদনও তাই পৃথক। কোন গীতিকার পরিসমাপ্তিতে অনুভব করি মহান মিলনের অপূর্ব মাধুরী আবার কোন গীতিকার সমাপ্তি-সীমা হ'তে বেজে উঠেছে গভীর বিষাদের সকরুণ রেশ। কোন গীতিকার সঞ্চারণ-ভূমিতে দেখেছি সর্বস্ব-ত্যাগী সীতার স্বর্গীয় মূর্তি আবার কোন গীতিকার মর্মমূল হ'তে উৎসারিত হ'য়েছে সীতা-সাবিত্রীর অটল বৈভব! প্রত্যেকটি গীতিকা যেন ঘটনার স্বর্ণ-ইষ্টকে ভাবের তাজমহল হ'য়ে উঠেছে।

তবুও উত্তমের মধ্য হ'তে আমাদের সর্বোত্তমটি নির্ণয় করতে হ'বে। প্রথমেই একটি কথা স্পষ্ট করে স্বীকার করে নেওয়া ভাল। আস্বাদনের দিক হ'তে প্রত্যেকটি গীতিকা অভিনব হ'লেও গীতিকার যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য-গুলির সাথে আমরা পরিচিত "মৈমনসিংহ-গীতিকাব" প্রত্যেকটি আখ্যানে তা' যথাযথরূপে রক্ষিত হয়নি। তুলনামূলক আলোচনায "মহুয়া" গীতিকাটি আমাদেব নিকট অনেকখানি ত্রুটি-শূন্য বলে মনে হয়।

কাহিনী: গীতিকার একটি সাধাবণ বৈশিষ্ট্য হলো আখ্যান ভাগ হ'বে একটি মাত্র কাহিনীর ঘনসন্নিবিষ্ট রূপায়ণ। কোন উপকাহিনীর অবাঞ্ছিত প্রবেশাধিকার তা'তে থাকবে না। মূল কাহিনী দ্রুত সঞ্চারিত হ'য়ে পরম পরিণতির দিকে এগিয়ে যাবে। "দস্যু কেনারামের পালা"-য় মূল কাহিনীকে পিছনে ফেলে সরব হ'য়ে উঠেছে মনসামঙ্গলের পাঁচমিশেলী কাহিনী। "দেওয়ান মদিনা"-র প্রথমাংশের সাথে শেষাংশের বিশেষ কোন যোগ নেই, "কাজলরেখা"য় শুকপাখী একটি বড় রকমের ভূমিকা গ্রহণ করে নায়িকার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে দুর্বল করে দিয়েছে এমন কী "মলুয়া" এবং "কমলা"-র মত গীতিকা দু'টি বর্ণনাত্মক হওয়ায় অযথা ভারাক্রান্ত হ'য়ে পড়েছে। "মহুয়া" গীতিকাটির-কাহিনী অংশের মধ্যে এই দুর্বলতা নেই। উপকাহিনীর উৎপীড়ন হ'তে মুক্ত হয়ে এবং বর্ণনার ফেনিল অংশ হ'তে সরে এসে বিদ্যুৎ-গতিতে উত্থান পতনের ভিতর দিয়ে

চরম পরিসমাপ্তির দিকে এগিয়ে গেছে। এই হুমরা কর্তৃক মহুয়াকে চুরি, এই মহুয়ার খেলা দেখান, এই নদ্যার ঠাকুরের সাথে তার সাক্ষাৎ এবং প্রেম নিবেদন, তারপর স্থানান্তরে গমন ইত্যাদি সকল ঘটনা যেন মুহূর্তে-মুহূর্তে বিদ্যুৎ-ঝলকের মত ঝলকিত হ'য়ে উঠেছে। সময় সময় মনে হয় পল্লী কবি এই কাহিনী বর্ণনায় একটি পৃষ্ঠা তো দূরের কথা একটি পংক্তি, এমনকি একটি শব্দও অপব্যয় করেন নি। প্রতিটি শব্দ যেন ওজন করা, প্রতিটি বর্ণ যেন লক্ষ্যভেদী। পল্লী কবি মহুয়ার চুরির দৃশ্যটি এইভাবে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করেছেন ঃ

ছয় মাসের শিশু কইন্যা পরমা সুন্দরী।
রাত্রি নিশাকালে হুমরা তারে করল চুরি ॥
চুরি না কইর‍্যা হুমরা ছার‍্যা গেল দেশ।
কইবাম্ সে কন্যার কথা শুন সবিশেষ ॥

কেমন করে চুরি, কোথা হ'তে চুরি, কন্যার পিতামাতারা বিলাপ করল কি না, হুমরা দেশ পরিত্যাগ করলই বা কেমন করে—সকল কিছুই অবলীলাক্রমে ত্যাগ করে পল্লীকবি তাঁর পাঠক-পাঠিকাকে নিয়ে এসেছেন কাঞ্চনপুর হ'তে বামনকান্দায়—নতুনতর পটভূমিতে। এই চারিটি পংক্তির মধ্যে যা সমাপ্ত হ'য়েছে—সেই চুরির ব্যাপার নিয়ে বাংলাদেশে বিশালায়তন ডিটেকটিভ উপন্যাসের অভাব নেই। এখানে পল্লীকবি কাহিনীকে বিস্ফারিত করার যে দুর্দমনীয় লোভ সংবরণ করেছেন বাংলা সাহিত্যে তা' বিরল-দৃষ্ট।

নাটকীয় বিন্যাস ঃ কাহিনীর মূল বৈশিষ্ট তিনটি—পরিবেশ, চরিত্র এবং ক্রিয়া। গীতিকা যদিও এই তিনটি উপাদানের সংমিশ্রনে গঠিত তথাপি ক্রিয়ার (action) প্রভাব ব্যাপক এবং গভীর। এমন কি ক্রিয়ার সর্বগ্রাসী উত্থান-পতনের মধ্যে অপর দুইটি উপাদান গৌণ হ'য়ে পড়ে। বলাবাহুল্য "মহুয়া"য় আমরা ক্রিয়ার অভিনব আন্দোলন দেখেছি। "মলুয়া", "কমলা", "কাজলরেখা," "দেওয়ানা মদিনা" ইত্যাদি উপাখ্যানে

ক্রিয়ার প্রভাব এমন তীব্র ও তীক্ষ্ণ হ'য়ে ওঠেনি। নদ্যার ঠাকুরকে নিয়ে 'বাদ্যার' দল ছেড়ে পলায়নের পর হ'তেই ক্রিয়ার উত্থান-পতনের মধ্য দিয়েই সমগ্র কাহিনীটি অন্তিম মুহূর্তের দিকে এগিয়ে গেছে। নদী পথে সওদাগরের করালগ্রাস হ'তে নিজেকে মুক্ত করে মহুয়া ছুটেছে নদ্যার ঠাকুরের সন্ধানে গভীর অরণ্যে। বিপদ-সংকুল অরণ্যাভ্যন্তরে মন্দিরের মাঝে সে পেল বাঞ্ছিতের সন্ধান, কিন্তু সেখানেও আর এক নতুন বিপদ—সন্ন্যাসী মহুয়ার নিটোল যৌবনে প্রলুব্ধ, গভীর রাত্রে সে আসে প্রেম নিবেদন করতে। ক্রিয়ার এ এক বিদ্যুৎশিহরণ! অবশেষে কঙ্কালসার নদ্যার ঠাকুরকে নিয়ে অচীন অরণ্য-পথে গভীর বিপদের মাঝে ঝাপিয়ে পড়ে মহুয়া। শুরু হয় আরণ্যক জীবন। আজীবন বেদনাতুর জীবনে হয়তো একটু বসন্তের হাওয়া এসেছিল কিন্তু ঠিক সেই সুখের সময় আর এক চরম নাটকীয় পরিস্থিতির অভ্যুদয়। সহসা অরণ্য পথে আসে মহুয়া 'বাদ্যা'—সাক্ষাৎ যমদূত। অবশেষে যুগল জীবনে নামে নিয়তির নির্মম পরিহাস। 'বিষলক্ষে'র ছুরিতে আত্মহত্যা করে মহুয়া আর নদ্যার ঠাকুরের রক্তাক্ত দেহ লুটিয়ে পড়ে শ্বাপদ-সংকুল অরণ্য ভূমির নির্জন বনপথে। সমগ্র কাহিনীটি যেন অনিশ্চিত ঘটনার অতর্কিত উত্থানপতনের ভিতর দিয়ে আবেগে কম্পমান হ'য়ে উঠেছে। পরিশেষে মহুয়ার জীবনে যে বিপদ-ঘন গভীর ট্রাজেডী নেমে এসেছে তা' সমগ্র পাঠক-চিত্তকে ক্রন্দনাকুল করে তোলে। ঘটনা-বিন্যাসে গীতিকাটি দৃঢ়-পিনদ্ধ এবং নিঃবন্ধ্র। সর্বোপরি কাহিনীর দুর্লভ নাটকীয়তা সকল আখ্যানগুলির মধ্যে "মহুয়া"কে এক বিরল-বৈশিষ্ট্য দান করেছে।

সংলাপ ঃ গীতিকার আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো সংলাপ। সংলাপের ভিতর দিয়ে সমগ্র কাহিনীটি দ্রুত-সঞ্চারমমান হ'য়ে ওঠে। বলাবাহুল্য এদিক দিয়েও "মহুয়া"র বিশিষ্টতা লক্ষণীয়। মহুয়া যখন বাঁশে উঠে খেলা দেখাতে ব্যস্ত তখই নদ্যার ঠাকুরের হৃদয়ে সুপ্ত প্রেমাকাঙ্ক্ষার নব জাগরণ ঘটে। পল্লী কবি মাত্র কয়েকটি বর্ণসুষম (balanced) রেখাঙ্কনে আমাদের সম্মুখে সেই জাগ্রত প্রেমের ছবিটি সুন্দর রূপে তুলে ধরেছেন ঃ

যখন নাকি বাইদ্যার ছেরি বাশে মাইল লাড়া।
বইসা আছিল্‌ নদ্যার ঠাকুর উঠ্যা ঐল খাড়া ॥
দড়ি বাইয়া উঠ্যা যখন বাশে বাজি করে।
নইদ্যার ঠাকুর উঠ্যা কয় পাইর‍্যা নাকি মরে ॥

তারপর আসন্ন সন্ধ্যায় নির্জন জলের ঘাটে চলে ভীরু প্রেমিকের শঙ্কিত প্রেম-নিবেদন ঃ

জল ভর সুন্দরী কন্যা জলে দিছ ঢেউ।
হাসি মুখে কওনা কথা সঙ্গে নাই মোর কেউ ॥

তারপর প্রেমভবা সলজ্জ দৃষ্টি বিনিময়। মহুয়ার মাতা-পিতার পরিচয় জানতে চায় নত্থার ঠাকুর। কিন্তু 'মহুয়ার জীবন আদ্যোপান্ত একটি দীর্ঘ-নিঃশ্বাসের সুবে গাথা' ঃ

নাহি আমার মাতা পিতা গভে সুদর ভাই।
সুতের হেওলা অইয়া ভাসিয়া বেড়াই ॥

এরপর পরিচয় নিবিড়িতর হ'তে থাকে। নদ্যার ঠাকুরের বিয়ে হয়নি জেনে মহুয়া কটাক্ষ করে—তাব উত্তরে ভীরু প্রেমিকের হৃদয়ার্তি হয়ে ওঠে ঃ

কঠিন তোমার মাতাপিতা কঠিন আমার হিয়া।
তোমার মত নারী পাইলে করি আমি বিয়া ॥

এবার নারীত্বের সহজাত লজ্জাপ্রবণতায় আবক্ত হ'যে ওঠে মহুয়া—বলে ঃ

লজ্জা নাই নির্লজ্জ ঠাকুর লজ্জা নাইরে তর।
গলায় কলসী বাইন্ধ্যা জলে ডুব্যা মর ॥

নত্থের ঠাকুরের প্রেম-নিবেদন এবার সর্বোচ্চ-সীমা (climax) স্পর্শ করে ঃ

কোথায় পাব কল্‌সী, কইন্যা, কোথায় পাব দড়ি।
তুমি হও গহীন গাঙ্গ আমি ডুব্যা মরি ॥

এই সংলাপ যেমন সজীব তেমনি প্রাণবন্ত। কি অমোঘ এর আকর্ষণ! **ছন্দঃ** ছন্দের দিক দিয়েও "মহুয়া" উপাখ্যানটি ত্রুটি শূন্য। শ্বাসাঘাত, পয়ার ছন্দই গীতিকার একমাত্র বাহন। কিন্তু মৈমনসিংহ গীতিকার বিভিন্ন উপাখ্যানে পয়ার ছাড়াও ত্রিপদী ছন্দ ব্যবহৃত হ'য়েছে। "কাজলরেখা" উপাখ্যানটি তো রীতিমত গল্পাশ্রয়ী গদ্যেয় লিখিত। কিন্তু "মহুয়া" এই সকল ত্রুটি হ'তে মুক্ত। আখ্যানটি আগাগোড়া শ্বাসাঘাত প্রধান পয়ার ছন্দের রূপায়নায় মনোরম হ'য়ে উঠেছে।

পরিণতি ঃ পরিণতির দিক হ'তে কয়েকটি আদর্শ গীতিকা গীতিকা-ধর্ম হ'তে বিচ্যুত হয়েছে। কাজলরেখা উপাখ্যানটি তো সম্পূর্ণ রূপকথাশ্রয়ী, মলুয়া গীতিকাটিতেও শেষ পর্যন্ত রূপকথার আমেজ এসেছে। 'মনপবনের নায়ে' চড়ে মলুয়ার যে আত্মহত্যার সংবাদ পরিবেশিত হ'য়েছে তা' একমাত্র রূপকথার রাজ্যেই সম্ভব। কিন্তু "মহুয়া" উপাখ্যানের পরিণতিতে এমন কোন অবাস্তব কল্পনা স্থান পায়নি। একান্ত বাস্তবানুগ পরিণতির ভিতর দিয়ে যে মর্মভেদী হাহাকার উঠেছে তা' আমাদের চিত্তকে অশ্রু-সিক্ত করে তোলে।

কি আঙ্গিক, কি ঘটনা বিন্যাস, কি চরিত্র-চিত্রন কি পরিণতি সকল দিক দিয়েই "মহুয়া" অনবদ্য। এই উপাখ্যানটির এক প্রান্তে যেমন আছে নাটকীয় গতিসম্পন্ন দ্রুতসঞ্চারমান কাহিনী তেমনি অন্যটিতে আছে পল্লী প্রাণের উছল সজীবতা। ভাব ও ভাষায়, "শব্দ ও "ছন্দে মহুয়া" সত্যই মনোরম এবং মহান হয়ে উঠেছে।

।। বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলিম কবি ও কাব্য ।।

॥ এক ॥

॥ মুসলিম পদকর্তাদের পদে চৈতন্য-প্রভাব ॥

বৈষ্ণব নয়—বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন। কথাটা লক্ষ্য করার মত। এই বিশিষ্ট কথাটির প্রয়োগকর্তা শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য। গবেষণা কার্যে রত হয়ে তিনি ১০২জন মুসলিম পদকর্তার পদ আবিষ্কার করেছেন এবং পদগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশের সময় সেই গবেষণা-গ্রন্থিকার নামকরণ করেছেন "বাংলার বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন মুসলমান কবি।" অধুনিক কোন কোন সমালোচক এই গবেষণা-গ্রন্থিকায় সংকলিত পদগুলি অভিনিবেশ সহকারে পাঠকবে এই মুসলিম পদকর্তাদের খাঁটি বৈষ্ণব বলার পক্ষপাতী। এ ধাবণা নিতান্ত ভ্রান্ত। অন্ততঃ এই ধারণার পরিপোষকতার কোন সঠিক প্রমাণ আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। আসলে এইআপাতঃ বিরুদ্ধ কাজ সম্ভব হ'য়েছে প্রবল যুগ ধর্মেব প্রভাবে। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব এই যুগধর্মের প্রবর্তক। তাঁর মানবতার পটভূমিতে মহাপ্রভুর সমগ্র জীবনাচরণেব মধ্য দিয়ে ভক্তি ও প্রেমের যে বিপুল প্লাবন এনেছিলেন তা কেবল 'হিন্দুব গৃহপাশেই প্রবাহিত হয়নি—মুসলমানদের আঙ্গিনাব পাশ দিয়েও প্রবাহিত হ'য়েছিল।' মহাপ্রভুর ব্যাপক প্রভাবের কথা বলতে গিয়ে নিষ্ঠাবান সমালোচক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু মহাশয় ঘোষণা করেছেনঃ "প্রাণ জাগিলেই গান জাগে। মধ্যযুগে সমগ্র বাংলাদেশে ব্যাপ্ত করিয়া যেন একটা সংগীতের আসর বসিয়াছিল। ঘরকে বাহির এবং বাহিরকে ঘর করিয়া বাংলাদেশের সুরোন্মত্ত মানুষগুলি বিশ্বজীবনের মহাপ্রাঙ্গণ-তলে সেই সুর-সভায় আসিয়া মিলিত হইল। উপরে অনন্ত নীলাকাশ—নীলকৃষ্ণ;

তাহার উপরে রাধা চন্দ্রাবলী—ভুল হইল, চৈতন্যচন্দ্রোদয় হইয়াছে। বাঙালীর ভাবের উচ্ছ্বাস রসের উল্লাস, আনন্দের উৎসার বাধা মানে নাই। প্রাণ যে জাগিয়াছে—মহাপ্রান, মহাগান তো জাগিবেই।" এই মহাসংগীতের সুর সভাতলে বধির হ'য়ে বসে থাকবে কে? বসে যে ছিল—সে বধির-ই, সুস্থ সবল মানুষ নয়। মুস্‌লিম কবি এবং শ্রোতাদের এই সুর-সভাতল হতে দূরে থাকা সম্ভব হয়নি, চৈতন্যদেবের প্রবল ব্যক্তিত্বে এবং যুগধর্মের অনতিক্রম্য প্রভাবে মন্ত্র মুগ্ধের মত সেই এসে যোগদান করেছিলেন। কেবল যোগদান নয়—অন্তরের প্রেরণাবেগে পদ রচনা করেছেন, কীর্তন গেয়েছেন। তাইতো নিষ্ঠাবান বহু বৈষ্ণবের কণ্ঠে মুসলিম পদকর্তাদের পদ সংকীর্তিত হয়েছে, বৈষ্ণপদ সংকলিয়তাদের পক্ষে তাই এই পদকর্তাদের পদ এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি।

পদকর্তাগণ যে বৈষ্ণব ছিলেন না সে সম্পর্কে আরো বড় প্রমাণ এই যে দু'একটি পদ রচনা ছাড়া অধিকাংশ কবি আজীবন মুসলিম-সংস্কৃতি নিয়ে চর্চা করেছেন, সে বিষয়ে বিশালায়তন কাব্য লিখেছেন। সুস্থ মন নিয়ে বিবেচনা করলে এখন স্পষ্টই প্রতীয়মান হ'বে বিপুলায়তন কাব্যের মধ্যে কবির মানস-ভংগীর যে প্রতিফলন ঘটেছে সেটা সত্য না সামান্য দু'একটি পদে—তা' সে যত তন্ময়তাপুর্ণই হোক না কেন—কবি-মানসিকতার যে ছায়াপাত ঘটেছে সেটা তীব্র।

মুসলিম পদকর্তাগণ নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ছিলেন একথা যাঁরা প্রচার করেন তাঁদের মতও যেমন ভ্রান্ত তেমনি যাঁরা বলেন বৈষ্ণব ধর্মের কোন কিছুতে আকৃষ্ট না হ'য়ে মুসলিম পদকর্তাদের পদগুলি 'বৃন্তহীন পুষ্পসম' আপনাতে আপনি বিকশিত হয়ে উঠেছে তাঁদের মন্তব্যও অনুরূপে একদেশদর্শিতার পরিচায়ক। বৈষ্ণবীতার কোনকিছুতে আকৃষ্ট না হ'য়ে এই স্বতোৎসারিত পদগুলি রচনা করা যে কারো পক্ষে সম্ভব তা বিশ্বাস করতে মন ঠিক সায় দেয় না। বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহন না করলেও বৈষ্ণবীয়তায় যে তাঁরা আকৃষ্ট হয়েছিলেন এ কথা ধ্রুব সত্য। আসলে এই পদকর্তারা বৈষ্ণব নন আবার অবৈষ্ণবও নন—বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন। সে

যুগের আকাশে বাতাসে যে উদার প্রেমের মন্ত্র-গুঞ্জরণ ধ্বনিত হয়েছিল—সেই গুঞ্জরণে ঐসকল কবিও আপনা কণ্ঠ মিলিয়ে দিয়েছিলেন। যুগধর্মের সার্থক প্রতিফলন ঘটেছে এ সব পদকর্তাদের পদে।

বারে বারে আমরা যে যুগধর্মের কথা বলেছি—এখন সেই যুগধর্ম। অর্থাৎ চৈতন্য-সংস্কৃতি এবং চৈতন্য-প্রভাব এই পদকর্তাদের উপর কতটা পড়েছে সেটা দেখে নিতে চেষ্টা করব।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদি লীলার ১৩শ পরিচ্ছেদে পাই ঃ

> কিশোর বয়সে আরম্ভিলা সংকীর্তন।
> রাত্রিদিনে প্রেমে নৃত্য সঙ্গে ভক্তগণ॥
> নগরে নগরে ভ্রমে কীর্তন করিয়া।
> ভাসাইল ত্রিভুবন প্রেমভক্তি দিয়া॥

এই নগরে নগরে ভ্রমণ করে কীর্তন করাব মাধ্যমেই মহাপ্রভুর জীবনাচরিত প্রেমধর্মের অভিব্যক্তি সুন্দর হয়ে ফুটেছে। এই কীর্তনের মাধ্যমেই তিনি জনসাধারণকে আকৃষ্ট করেছেন বেশী। শ্রদ্ধেয় যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য তাই সত্যই বলেছেন, "চৈতন্য-জীবনী আলোচনা করিলে দেখা যায় পণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার নিকট তর্কে পরাজিত হইয়া অথবা তাঁহার অদ্ভুত পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া তাঁহার মতাবলম্বী হইয়াছিলেন। কিন্তু জনসাধারণ, যাহারা পাণ্ডিত্যের ধার ধারে না, যাহারা পণ্ডিত চৈতন্যকে বুঝিবার মত পাণ্ডিত্যের অধিকারী নহে, তাহারা মুগ্ধ হইয়াছিল তাঁহার কীর্তনে ও নর্তনে। যাহারা কীর্তনরত শ্রীচৈতন্যের প্রস্ফুট কদম্বপুষ্পতুল্য প্রেম-রোমাঞ্চিত কলেবর ও শিশির সজল পদ্ম-কোরক সদৃশ প্রেমাশ্রুপূর্ণ অর্দ্ধ-নিমীলিত নয়ন একবার দেখিয়াছে তাহারাই ভুলিয়াছে।" এই কীর্তনগান এবং অর্ধনিমীলিত নয়নে আকৃষ্ট হয়েছে সরল পল্লীবাসী পথের কর্ম-ক্লান্ত পথিক একেশ্বরবাদী মুসলিমও। কেননা এ চৈতন্যদেব তো বৈষ্ণবধর্মের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা নন, এ চৈতন্যদেব প্রভু—মহাপ্রভু—সকলের মহাপ্রভু। সকল জাতি ধর্ম, বিভেদ-গ্লানির উর্ধে এঁর স্থান—উদার প্রেমের মূর্ত-

বিগ্রহ। বুদ্ধিমান্ত খান কেবল আকৃষ্ট নয়—চৈতন্যের সেবক প্রধান হয়ে পড়েছিলেন :

শ্রীচৈতন্যের অতি প্রিয় বুদ্ধিমান্ত খান।
আজন্ম আজ্ঞাকারী তিঁহো সেবক প্রধান ॥
॥ চৈতন্যচরিতামৃত : আদিলীলা, ১০ম পরিচ্ছেদ ॥

বুদ্ধিমন্ত খানের অনুরূপ চৈতন্য-নিষ্ঠার পরিচয় পাই চৈতন্যভাগবতের অন্তলীলার ৯ম পরিচ্ছেদে :

চলিলেন বুদ্ধিমন্ত খান মহাশয়।
আজন্মা চৈতন্য-আজ্ঞা যাঁহার বিষয় ॥

এ ছাড়াও চৈতন্যচরিতামৃত এবং চৈতন্যভাগবতের বর্ণনা হ'তে জানা যায় বহু কাজী এমন কি স্বয়ং হুসেন শাহ পর্যন্তও চৈতন্যের কীর্ত-শ্রবনে মুগ্ধ হ'য়েছিলেন। অনুরূপে মুগ্ধ হ'য়েছিলেন মুস্‌লিম পদর্তাগণ। তাঁদের গৌরচন্দ্রিকার পদগুলিতে চৈন্যদেবের এই আবেশ-বিহ্বল মূর্তির সুনিবিড় পরিচয় রয়েছে। বৈষ্ণব মহাজনগণের গৌরচন্দ্রিকার পদসমূহে যে ঐকান্তিকতা ফুটেছে, এঁদের রচিত পদসমূহে তাব সমকক্ষ ঐকান্তিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। সময় সময় এমনও মনে হয়—গৌরচন্দ্রিকার পদরচনায় এসব কবিদের মানস-চক্ষে গৌরাঙ্গদেবের গৌরমূর্তি স্পষ্টরূপে ঝলকিত হ'য়ে উঠেছিল। গৌর-নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার পরিচয় নিবিড় হ'য়ে ধরা পড়েছে সাহা আকবরের একটি পদে :

জীউ জীউ মেরে মন চোর গোরা
আপহিঁ নাচত আপন রসে ভোরা ॥
খোল করতাল বাজে ঝিকি ঝিকিয়া।
আনন্দে ভকত নাচে লিকি লিকিয়া ॥
পদ দুই চারি চলু নট নটিয়া।
থির নাহি হোয়ত আনন্দে মাতোয়ালিয়া ॥

এখানে কবি তাঁর মুগ্ধ মনের সমুদয় ঐকান্তিকতাটুকু যেন উজাড় করে দিয়েছেন। এই বাণী বন্ধনের ভিতর দিয়ে পাঠকের সম্মুখে 'আবেশ বিহ্বল মূর্তিতে, গৌরাঙ্গদেব যেন স্পষ্ট হ'য়ে ওঠেন।

লাল মামুদের একটি পদে'সোনার মানুষগৌরাঙ্গদেবের রূপমূর্তি সুন্দর হয়ে ফুটেছে আর ফুটেছে 'সোনার মানুষের পরশে' 'কত লোহার মানুষের' সোনা হওয়াব কথা—পাপীর পুণ্যাত্মায় পরিণত হওয়ার ইতিহাস ঃ

সোনার মানুষ নদে এল রে।
ভক্তসঙ্গে প্রেমতরঙ্গে ভাসিছে শ্রীবাসের ঘরে ॥....
সোনার মানুষ, সোনার বরণ, সোনারনূপুর, সোনার চরণ।
চারিদিকে সোনার কিরণ ছুট্‌ছে আলোকিত করে।
কত লোহার মানুষ সোনা হল গৌর অবতারে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবনই তাঁর বাণী। আজীবন আচরণের মাধ্যমে তিনি তাঁর বাণীকেই বাস্তবে রূপায়িত করেছেন। যে নতুন ভাব-বন্যায় 'শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়' সেই নতুন ভাবই তাঁর আচরণে সুপরিস্ফুট। 'এই আপনি মেতে জগৎ মাতানোর' কথা ভাবদ্রষ্টা কবি লালনেব পদে অপূর্ব চিত্রগরিমায় বিকশিত। এই একটি মাত্র পদেই যেন মহাপ্রভুর রূপ এবং সমগ্র জীবনাচরণের মর্মনির্যাসটুকু বিধৃত হয়েছে ঃ

আয় দেখে যা নূতন ভাব এনেছে গোরা।
মুড়িয়ে মাথা গলে কাঁথা কটিতে কৌপীন ধরা ॥

এ পর্যন্ত কবি গৌরাঙ্গের বাহ্য-প্রকৃতিকে তুলে ধরেছেন। কিন্তু এর পর কবি চলে গিয়েছেন মহাপ্রভুর জীবন-কথার মূল সুরে, মানব-প্রেমের মধ্যে, আপনি মেতে জগৎ মাতানোর মাঝে ঃ

গোরা হাসে কাঁদে ভাবের অন্ত নাই।
সদা দীন দরদী বলে ছাড়ে হাই
জিজ্ঞাসিলে কয়না কথা হ'যেছে কি ধন হারা ॥
গোরা শাল ছেড়ে কৌপিন পরেছে।
আপনি মেতে জগৎ মাতিয়েছে ॥

'জিজ্ঞাসিলে' কয় না কথা হয়েছে কি ধন হারা' পংক্তিটির মধ্য দিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবেগ-বিহ্বল মূর্তির কথা মনে পড়বেই। কবি

এ চিত্রাঙ্কনের মধ্যেও থামেন নি—আরো এগিয়ে গিয়েছেন। গৌরাঙ্গদেব যে স্বয়ং একটা যুগের স্রষ্টা সে কথা ভাবুক কবি উপলব্ধি করেছেনঃ

সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি হয়।
গোরা তার মাঝে এক দিব্যযুগ দেখায়।

এই সামান্য পংক্তির মধ্যে কেবল গৌরাঙ্গদেবের স্বরূপটি নয়, চৈতন্য-প্রভাবিত বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ছবিটি সুস্পষ্ট।

অনেক নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবের কাছে শ্রীচৈতন্যদেব কেবল উপায় নন—উপেয়, উপাসক নন—উপাস্য। শ্রীচৈতন্য তাঁদের কাছে সাধরণ মানুষ নন—দেবতা। মুস্‌লিম পদর্তাগণের অনেকই চৈতন্যদেবকে দেবতার আসনে বসিয়ে উপেয় রূপে কল্পনা করেছেন। আরাধ্য দেবতার আসনে বসিয়ে তাঁর পদে জীবনোৎসর্গের আকূতি জানিয়েছেন ঃ

গৌরচান্দ আমার।
তোমার লাগি আমি ঘরের বার।।

ছৈদয় আলির একটি পদে গৌরাঙ্গ আরাধ্য দেবতারই নামান্তর ঃ

গৌর-আজ্ঞায় বিচারিলে পাইবার তার দরশন।
এই তনে চাপিয়া রইছে সে রতন।।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আলোচনায় আমরা দেখেছি গৌরাঙ্গদেব রাধাকৃষ্ণের মিলিত স্বরূপ। কৃষ্ণই চৈতন্য। একে অপরের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। রাধা-লীলাস্বাদন করার জন্যে, আপনার প্রেম-মাধুর্য উপলব্ধির জন্যে দ্বাপরের শ্রীকৃষ্ণ কলি যুগে শ্রীচৈতন্যে রূপান্তরিত। কবিরাজ গোস্বামী তাঁর বিপুলায়তন গ্রন্থে এই কথাটি নানাভাবে ব্যক্ত করেছেন। মুস্‌লিম পদকর্তাদের কেউ কেউ একই সুরে কণ্ঠ মিলিয়ে দিয়েছেন। গরিব খাঁর একটি পদে শ্রীচৈতন্যই যে রাই-কানুর সমন্বিত রূপ সেকথা সুন্দর-রূপে ব্যক্ত হ'য়েছে ঃ

শরমে শরম প্যেলায়ে গেল।
রাই কানু দুটি তনু
যেমন দুধে জলে ম্যালায় গেল।।

এ পর্যন্ত আলোচনা এবং উদ্ধৃত পদসমূহ হ'তে আমরা স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করতে পেরেছি মুসলিম কবিগণের পদ রচনায় অবতীর্ণ হওয়ার মূলে শ্রীচৈতন্যের প্রভাব কি ব্যাপক এবং গভীর। বস্তুতঃ কেবল মুসলমান কবিগণ কেন—বাংলা দেশে শ্রীচৈতন্যের প্রেম-বন্যা প্রবাহিত না হ'লে হিন্দু কবিগণও রাধা-কৃষ্ণ প্রেম-বিষয়ক পদরচনায় কতটুকু এগিয়ে আসতেন এবং সার্থকতা অর্জন করতেন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। বর্তমানে বাংলার বৈষ্ণবধর্ম বলতে যা' বুঝি তা' শ্রীচৈতন্যেরই দান। শ্রীচৈতন্যের দ্বারাই বৈষ্ণবধর্মে নবযৌবন সঞ্চার ঘটেছে। জয়দেব-বড়ুচণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির পদাবলী শ্রীচৈতন্যের দ্বারাই নতুন মহিমায় বিকশিত হ'য়ে উঠেছে। জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরাম, রায়শেখর এ সকল মহাজনগণ তো চৈতন্যদেবেরই সৃষ্টি। অনুরূপে মুসলিম পদকর্তাগণ চৈতন্যের জীবন হ'তে বেগ নিয়ে কাব্য রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। চৈতন্যই তাঁদের কাব্য-প্রেরণার উৎস-ভূমি।

॥ দুই ॥

॥ রাধাকৃষ্ণ না শাশ্বত প্রেমিক-প্রেমিকা ॥

চৈতন্য প্রভাবের কথা স্মরণে করে আমরা বার বার বলেছি শ্রীমন্মহাপ্রভু আজীবন আচরণে' মধ্য দিয়ে যে সমন্বয়কামী যুগধর্ম গড়ে তুলেছিলেন সেই যুগধর্মের প্রবল আকর্ষণে মুসলিম পদকর্তাগণ (হিন্দুপদকর্তাগণও) রাধাকৃষ্ণ লীলা-বিষয়ক পদ রচনায় প্ররোচিত এবং প্রলুব্ধ হন। এখন আমাদের বিচার করে দেখ্‌তে হবে রাধাকৃষ্ণ এই পদকর্তাদের পদে কি রূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। তাঁরা কি জীবত্মাপরমাত্মার প্রতীক? কোনবিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের দেবদেবী? এ কৃষ্ণ কি গীতার কৃষ্ণ? এ রাধা কি কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তির বহিঃপ্রকাশ? অথবা এ রাধা কৃষ্ণের অন্তরালে প্রকাশিত হ'য়েছে শাশ্বত প্রেমিক-প্রেমিকার রূপ-মূর্তি?

আমাদের এ জিজ্ঞাসাগুলির উত্তর আংশিক ভাবে "বাংলার বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন মুসলমান কবি" গ্রন্থের সম্পাদক শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের

মন্তব্য হ'তেই পেয়ে যাব। তিনি লিখেছেন, "এই শ্রেণীর মুসলমানরা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা সরস্বতী, গণেশ প্রভৃতি দেবদেবীকে প্রশ্রয় স্বীকার করেন নাই। স্বীকার করিয়াছেন—প্রেমিক-প্রেমিকার মূর্ত-প্রতীক রাধাকৃষ্ণকে ইহারা কৃষ্ণ বলিতে গীতার কৃষ্ণকে জানেন না, জানেন রাধাবন্ধু কৃষ্ণকে। এই রাধাকৃষ্ণ আবার অধিকাংশ মুসলমান কবিদের নিকট অপৌরুষেয়। ইহারা বৃষভানু-নন্দিনী বা যশোদা নন্দন নহেন। 'কানু ছাড়া গীত নাই, কানু ছাড়া উপমা নাই',—প্রভৃতি প্রবাদের দ্বারা যে প্রেমিক কানুর কথা বলা হইয়াছে প্রেমের কথা বলিতে যাইয়া সেই কানুর নাম মুসলমান কবিরাও গ্রহণ করিয়াছেন।" এই সুদীর্ঘ উক্তিটির ভাব-সত্য হ'তে এ কথা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে এ কৃষ্ণ আর যাই হোক কোন বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের দেব নন। কিন্তু মাঝে মাঝে এই উক্তির অযাথার্থও প্রমাণিত হ'বে, কোন কোন পদে আমরা দেখব কবিকুলের অন্তরের ঐকান্তিক আকূতিতে এ রাধাকৃষ্ণ বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের দেব-দেবী হ'য়ে উঠেছেন। কৃষ্ণ সেখানে যশোদা-নন্দন আব রাধা সেখানে কৃষ্ণেরই হ্লাদিনী শক্তির প্রতীক। কিন্তু এমন পদ আলোচ্য সংকলন গ্রন্থে বিরল না হলেও একেবারে বিবল-প্রায়। আসলে এ রাধা-কৃষ্ণেব আববণে আত্মগোপন কবে আছে নদীমাতৃক বাংলা দেশের প্রেমোন্মত্ত নরনারী, শাশ্বত প্রেমিক-প্রেমিকা। এই তরুণ-তরুণী, এই প্রেম-বিহ্বল যুবক-যুবতীই রাধা-কৃষ্ণরূপে কায়া বদল করেছে মুস্‌লিম কবিকুলের পদাবলীতে, বেগ সঞ্চার করেছে তাঁদের কল্পনার প্রসারতায়। আরো একটু লক্ষ্য করলে আমরা দেখ্‌তে পাব এ প্রেমিক-প্রেমিকা শাশ্বত কিন্তু যুগল প্রেমের স্রোতে ভেসে আসা' মিষ্টিক নয়। অঙ্গে ধূলি মাটির আকর্ষণ, মাটির পৃথিবীর সাথে তাদের কি নিবিড় সংযোগ!

মহাজন পদকর্তাদের পদে আমরা বিভিন্ন রস পর্যায়ের পদ পেয়েছি। মুসলিম কবিগণও বিভিন্ন রসপর্যায় নিয়ে পদ রচনা করেছেন। এঁদের পদে 'গোষ্ঠ, পূর্বরাগ, অভিসার, বাসর-সজ্জা, মিলন, কুঞ্জ-ভঙ্গ, বিরহ

মাথুর, খণ্ডিতা, দানলীলা, হোলি-লীলা, নৌকাবিলাস, বংশী দুঃখ নিবেদন প্রভৃতি বিষয় পদ রয়েছে।' এখানে কয়েকটি রস পর্যায়ের পদ আলোচনা করা যেতে পারে ঃ

প্রথমেই গোষ্ঠবিহারের পদ। এ রসপর্যায়ে একটি আশ্চর্য সুন্দর পদ লিখেছেন নশীর মামুদ। পদটি এ রস পর্যায়ের কেবল শ্রেষ্ঠ পদ নয়—শব্দ-ঝংকার এবং অলংকার নিপুণতার দিক দিয়ে পদটির একটি বিশিষ্ট মূল্য আছে। যমুনা-তীরে শ্রীদাম সুদাম সংগীসাথে মিলিত হ'য়ে বালক কৃষ্ণের ধেনু চরাণোর ছবিটি বর্ণাল্পনায় সুন্দর হ'য়ে ফুটেছে। পদটি যে কোন বৈষ্ণব মহাজনের পদের সাথে তুলনীয় ঃ

ধেনু সঙ্গে, গোঠে রঙ্গে
খেলত রাম, সুন্দর শ্যাম
পাঁচনি কাঁচনি বেত্র বেনু
মুরলী খুরলী গানরি।

প্রিয়দাম শ্রীদাম মেলি,
তরুণী-তনয়া তীরে কেলি,
ধবলি সাঙলি আওবি আওবি
ফুকরি চলত কানরি॥

বয়স কিশোর মোহন ভাঁতি
বদন ইন্দু জলদ কাঁতি
চারু চন্দ্রি গুঞ্জাহার,
বদনে মদন ভানরি।

আগম নিগম বেদ সার,
লীলায়ে করত গোঠবিহার,
নাশীর মামুদ করত আশ,
চরণে শরণ দানরি॥

এ পদটি একান্তভাবে বৈষ্ণবভাবাপন্ন। মনে হয় যেন রূপদ্রষ্টা কবি ধ্যান-তন্ময় চিত্তে কৃষ্ণের গোচারণ ভূমি দেখেছেন—দেখে তুলির টানে টানে রূপ দিয়েছেন। পদটির শেষ স্তবকটি কবির কৃষ্ণভক্তির অনবদ্য

প্রকাশ। একটি আবেগ-আকুল কণ্ঠ ধীরে ধীরে ক্রমোচ্চ হ'য়ে শেষ স্তবকে একেবারে কাতরতায় ভেঙ্গে পড়েছে। বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন মুসলিম কবি-কুলের যে কোন শ্রেষ্ঠ পাঁচটি পদের মধ্যে নিঃসন্দেহে এ পদটি একটি।

বয়ঃসন্ধির একটি সুন্দর পদ পাই মহাকবি আলাওলের রচনায়। এ বয়ঃসন্ধির বর্ণনা রাধিকার নয়—“পদ্মাবৎ ” কার্যের নায়িকা পদ্মিনীর। অথচ বৈষ্ণবভাবের সুরটি যেন স্পষ্ট শোনা যায়। বস্তুতঃ পরিচয় না দিয়ে পদটি তুলে দিলে রাধার বয়ঃসন্ধির পদ বলে সকলেই ভ্রম হ'বে।

আড আঁখি বক্রদৃষ্টি ক্রমে ক্রমে হয়।
ক্ষণে ক্ষণে লাজে তনু আসি সঞ্চরয়॥
চোর রূপে অনঙ্গ অঙ্গেতে উপজয়।
বিরহ বেদনা ক্ষণে ক্ষণে মনে হয়॥

পূর্বরাগের পদে বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য ফুটেছে বলে মনে হয় না। অন্ততঃ মহাজনদের পদে যে আত্মহারা ব্যাকুল ভাবটি ফুটেছে এখানে সেটি অনুপস্থিত। আকবর আলীর পদে স্বপ্নদর্শনে রাধিকার চিত্তে পূর্ব-রাগোন্মেষের চিত্রটি আভাসিত হ'য়েছে ঃ

একা ঘরে শুইয়া থাকি সুতিলে স্বপন দেখি
ও আমার কর্ম্মদোষে না পাইলাম জাগিয়া॥

কবি মোহাম্মদের একটি পদেও পূর্বরাগের সুরটি ধরা পড়েছে ঃ

ও কি অপরূপ পেখিলুং বিপিন মাঝে
জার জথ হিত চিত্ত প্রকাশিত
সাফল নআন সাঝে
কতুক কারণে গেলুম বৃন্দাবন
দেখিতে ছো বন্ধু শ্যাম।

পূর্বরাগের পদে বোধহয় সর্বাপেক্ষা বেশী কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন কবি হানিফ ঃ

মধুর মুরলি শুনিতে সুস্বর।
ভুবন মোহন রূপ চলহ মথুর॥

কি রঙ্গ দেখিলাম সইরে যমুনার কুলে।
পুলকিয়া উঠে প্রাণ ছটফট করে।।....

একটু লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাব পদগুলিতে কৃষ্ণতন্ময়তা নেই—আছে কেবল একটি চিত্র। এখানে রাধা-কৃষ্ণ সাধারণ নরনারী—সাধারণ যুবকযুবতীর আকুতি এবং হৃদয়াকাঙ্ক্ষা রাধাকৃষ্ণ নামের মাঝে আত্ম-গোপন করে আছে।

আলাওলের একটি পদে রাধা-চিত্রের অন্তরালে এক অভিসারিকা পল্লীবালার চিত্রটি সুন্দর হ'য়ে ফুটেছে। 'রাধা', 'ভেল', 'ননদিনী' প্রভৃতি পদাবলীর কয়েকটি বহুল-ব্যবহৃত শব্দের প্রলেপে পদটিকে বৈষ্ণব ভাবাপন্ন করা হয়েছে। আলাওল যে একজন বিশিষ্ট বৈষ্ণবরসজ্ঞ ব্যাক্তি ছিলেন এ পদটি তার সার্থক প্রমাণ। রাধিকা প্রত্যুষে অভিসারে গিয়ে ফিরছেন সন্ধ্যায়—কুটিলা এই বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করেন।

ঘরের ঘরণী জগত মোহিনী
প্রত্যুষে যমুনায় গেলি।
বেলা অবশেষ নিশি পরবেশ
কিসে বিলম্ব করিলি।

রাধা বিলম্বের কারণ নিদর্শন করেন ঃ

প্রত্যুষে বেহানে কমল দেখিয়া
পুষ্প তুলিবারে গেলুম।
বেলা উদানে কমল মুদনে
ভ্রমর দংশনে মৈলুম।।
কমল-কণ্টকে বিষম সঙ্কটে
করের কঙ্কন গেল
কঙ্কণ হেরিতে ডুবদিতে দিতে
দিন অবশেষ ভেল।।

সীথের সিন্দুর নয়নের কাজল
সব ভাসি গেল জলে।
হের দেখে মোর অঙ্গ জরজর
দারুনি পদ্মের নালে ॥

এটা ঠিক রাধিকার স্বর নয়—অভিসার-প্রত্যাগতা পল্লী কুমারীর কণ্ঠ। যমুনায় পদ্ম—একটু বিসদৃশ মনে হয় না কি। আসলে এটা বৃন্দাবন-উপকণ্ঠ-সিক্ত করা যমুনা নয়—সবুজ পত্র-পল্লবে ঘেরা পদ্মপুকুর। এ কুমারী চতুরা, উপস্থিত বুদ্ধি প্রখর। বিলম্বের কারণগুলি কি সুনিপুণ দক্ষতার সাথেই না ব্যাখাত হ'য়েছে। অবশ্য এ প্রসঙ্গে এ কথাও স্বীকার্য পদটিকে যদি কেউ বৃষভানু- নন্দিনী রাধার উক্তি বলেই প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন তাও করতে পারেন। পদটিতে পদাবলীর ছন্দ ও সুরের আশ্চর্য সমাবেশ ঘটেছে।

সেখলালের একটি পদে বিরহের সুরটি সকরুণ হ'য়ে ধরা পড়েছে। এই পদটির প্রশান্ত ভাববাহী সরল অনাড়ম্বর ভাষা চণ্ডীদাসের অশ্রু-সজল সহজ পদগুলির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। পদটির মধ্যে রাধার বিরহ-কাতর কণ্ঠ সকরুণ হ'য়ে উঠেছে। কবিও যেন এখানে রাধার অন্তর-বেদনাটি নিজে গ্রহণ করেছেন—চণ্ডীদাসের মত রাধাভাবে ভাবিত হ'য়েছেন। পদটি একান্ত ভাবে বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন ঃ

শুনলো স্বজনি কিছুই না জানি কি বুধি করিব আমি।
তরিতে নারিব দৈবে মরিব নিশ্চয় জানিহ তুমি ॥
শয়নে স্বপনে শ্যাম বঁধুর সনে সুখে গিয়াছিনু নিদ
পাঁজর কাটি শ্যাম বঁধুরে কেবা দিয়া নিল সিঁদ ॥
শয়নে স্বপনে ঘরেতে পিরিতে করিনু শ্যামের সনে।
সেই হইতে মোর চিত বেয়াকুল কিছুই না লয় মন ॥

এরপর আত্মনিবেদনের পদ। আত্মনিবেদনের পদে সৈয়দ মর্তুজা' একটি পদ লিখেছেন। পদটি সমগ্র বৈষ্ণবজগতে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করায় পদসংকলন গ্রন্থ "পদকল্পতরু"-তে তার স্থান অনিবার্য হ'য়ে পড়েছে।

চণ্ডীদাসের আমিত্ব-বিসর্জিত ক্ষোভহীন আত্মনিবেদনের পদের সাথে এই পদটি একই সমভূমিতে দাঁড়াবার স্পর্দ্ধা রাখে। অন্ততঃ এ পদটিকে শাশ্বত প্রেমিক-প্রেমিকার কণ্ঠ-ধ্বনি বলে চালান দুঃসাধ্য—এখানে কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি আরাধিকা শ্রীরাধার বিরল-শ্রুত কণ্ঠ ধ্বনিত হ'য়েছে ঃ

শ্যাম বঁধু, আমার পরাণ তুমি!
কোন শুভদিনে দেখা তোমা সনে
পাশরিতে নারি আমি ॥
যখন দেখিয়ে ও চাঁদ বদনে,
ধৈরয ধরিতে নারি।
অভাগীর প্রাণ করে আন্‌চান্‌
দণ্ডে দশবার মরি ॥
মোরে কর দয়া দেহ পদছায়া
শুন শুন পরাণকানু।
কুল শীল সব ভাসাইনু জলে
না জীয়ব তুয়া বিনু ॥

খণ্ডিতা নায়ক-নায়িকার কয়েকটি সুন্দর পদ পেয়েছি মুস্‌লিম পদকর্তাদের পদে। কৃষ্ণের জন্যে শয্যা এবং আহারাদি প্রস্তুত করে শ্রীরাধা ব্যাকুল-প্রতীক্ষা করেন কিন্তু কৃষ্ণের দেখা নেই। কৃষ্ণ অন্য সখীর কুঞ্জে রাত্রি যাপন করে পরদিন প্রভাতে যখন শ্রীরাধার কণ্ঠ ক্রমোচ্চ হ'য়ে ওঠে জিজ্ঞাসার পর জিজ্ঞাসা, অনুযোগের পর অনুযোগ ঃ

সবাই বলে রাধার পরাণ কানাই।
তুমি রজনী বঞ্চিলে কেন ঠাঁই ॥
কেমনে বনালে চূড়া শ্রবনে ঢুলিতেছে
মেলিতে নার দুটি আঁখি ॥
কস্কুম কস্তুরী আর সুগন্ধি তাম্বুল
থুইয়াছিনু শিয়র উপরে।

হা হরি হা হরি করি জাগিয়া পোহানু নিশি
তুমি ছিলে কাহার মন্দিরে ॥

বংশী বা মুরালী বৈষ্ণব সাহিত্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। এ প্রসঙ্গের বিস্তারিত আলোচনা আমবা জ্ঞানদাসের পদালোচনায় করেছি। পুনরুক্তি নিস্প্রয়োজন। বংশী রূপক—বংশী-ধ্বনি আর কিছুই নয় ভগবানের সাথে ভক্তের মহামিলন আহ্বান। ভগবানের এ ডাকে ভক্ত সাড়া না দিয়ে পারে না। পবমাত্মার সাথে জীবাত্মা মহামিলন ডোরে আবদ্ধ হওয়ার জন্যে উন্মুখ হ'য়ে ওঠে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'কালিনী-নই-কুল' হ'তে এ বংশী-ধ্বনি উত্থিত হ'য়েছে, মহাজন-পদাবলীর সর্বত্রই তো সুরঞ্জ মুবলীব মোহন তান গুঞ্জিত, মুসলিম পদকর্তরাও এ বংশীকে এড়িয়ে যেতে পারেন নি—তাঁদেরও পদাবলীব নম্র-কোমল বক্ষ হ'তে এ মোহন তান বাঙ্ময় হ'য়ে উঠেছে। কীর্তি-খ্যাত পদকর্তা আলী রাজার একটি পদ ঃ

বনমালী শ্যাম তোমার মুরলী জগপ্রাণ
জাতি ধর্ম কুল নীতি তেজি বন্ধু সব পতি
নিত্য শুনে মুরলীর গীত।
বংশী হেন্ শক্তি ধরে তনু রাখি প্রাণী হরে
বংশীমুলে জগতের চিত ॥

বংশী সম্পর্কে চাঁদ কাজির একটি বিখ্যাত পদ ঃ

বাঁশী বাজান জান না।
অসময় বাজাও বাঁশী পরাণ মানে না ॥
যখন আমি বৈসা থাকি গুরুজনার কাছে।
তুমি নাম ধইরা বাজাও বাঁশী, আর আমি মইরি লাজে ॥
ওপার হইতে বাজাও বাঁশী, এপার হইতে শুনি।
আর অভাগিয়া নারী হাম হে সাঁতার নাহি জানি ॥
যে ঝড়ের বাঁশের বাঁশী সে ঝাড়ের লাগি পাঁও।
জড়ে মুলে উপড়িয়া যমুনায় ভাসাওঁ ॥

কোন নিষ্ঠাবান সমালোচক উল্লিখিত অংশটুকু সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, এই "পদে রাধার ব্যাকুলতা আরও তীব্র এবং তাঁর লজ্জাশীলা মূর্তিটি বড়ই মধুর। গুরুজনের নিকট যখন রাধা উপাবিষ্টা তখন অকস্মাৎ বাঁশীর রব তাঁহার কানে পশিয়াছে—ইহাতে তিনি লজ্জায় বিব্রত। কিন্তু সে বংশী-ধ্বনি 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া' তাঁহাকে এমনই ব্যাকুল করিয়াছে যে, তাঁহার অবরুদ্ধ আত্মা সীমার বাঁধ ভাঙ্গিয়া অসীমের সহিত মিলিত হইবার জন্য নিবিড় আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে। এই শ্রেণীর বৈষ্ণব-কবিতাগুলি অধ্যাত্ম-রাজ্যের—এগুলি অতীন্দ্রিয় ভাবের দ্যোতক। ক্রমাগত সীমার বন্ধন অতিক্রম কবিয়া অসীমের সহিত মিলিত হইবার ব্যাকুল প্রার্থনায় পরিপূর্ণ এই পদগুলি।" এ মন্তব্যের সার-কথা স্মরণ রেখেও আমরা পাঠককে আর একটু সতর্ক হতে বলব। একটু সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে দেখলে আমবা উপলব্ধি করতে পারব শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের 'কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী-নই-কূলে' প্রভৃতিব মধ্য দিয়ে বংশীর অবিরাম ধ্বনি গুঞ্জিত হ'যে উঠেছে আলোচ্য পদটিতে সে ধ্বনি নেই। এপদে রাধা নামের অন্তরালে মিশেছে পূর্ববঙ্গের লোকগীতিকার নিজস্ব সুর-বৈশিষ্ট্য এ পদের আধ্যাত্মিক অর্থ যাই থাক লৌকিক অর্থ সে অর্থকে ছাপিয়ে প্রধান হ'য়ে উঠেছে। এ পদের রাধিকাকে পদাবলীর রাধিকা বলতে আমাদের মন সঙ্কুচিত।

এই লৌকিক ভাব এবং পল্লীবালাব সরল চিত্তটি একেবারে অনাবৃত ভাবে প্রকাশিত হয়েছে নিম্নের পদটিতে ঃ

বিনোদ আজু যাও ঘর।
তোমা খাইবে বাঘে সাপে কলঙ্ক আমার॥
উঠানেতে হাটু পানি সম্মুখে গড়খাই।
সোনাহেন বন্ধুয়া রাখিমু কোন ঠাঁই॥

এ পদে আধ্যাত্মিকতা খুজঁতে যাব কোন সাহসে ? আমরা জানি বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন মুসলিম কবিদের অধিকাংশই পূর্ববঙ্গবাসী। রাধা-কৃষ্ণ নাম

দিয়ে পদ রচনা করলেও সে পদের অন্তরাগিনীটি পল্লীবালারই অন্তরাগিনীর সাথে বেজে উঠেছে, পুর্ববাংলার পল্লীচিত্রটিই সে পদে চিত্রিত। পদ সংকলিয়তা যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য এ প্রসঙ্গে সুন্দর মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন এ পদের "বর্ণনায় বৃন্দাবনের চিত্র কতখানি ফুটিয়াছে তাহা বলিবার অধিকারী আমি নহি। কিন্তু এইরূপ চিত্র যে পুর্ববঙ্গে অহরহ চোখে পড়ে তাহা পুর্ববঙ্গবাসী মাত্রই স্বীকার করিবেন। পুর্ববঙ্গের কবি-রচিত পদাবলীসমূহের মধ্যে বঙ্গভূমির খণ্ডচিত্র সার্থকভাবে চিত্রিত হইয়াছে। এই সকল কবিরা বাঙ্গালার জাতীয় কবি নামে অভিহিত হওয়ার সম্পুর্ণ অধিকারী।"

অবশ্য এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন হ'তেপারে এপ্রেম-গাথাগুলি যদি পল্লীবালার ব্যথা বেদনার সাথে জড়িত হয় তা'হলে রাধা-কৃষ্ণ নাম দিয়ে রচিত হ'ল কেন। উত্তরে বলা চলে মহাপ্রভুর আগমনে এবং তাঁর আজীবন আচরণের মধ্য দিয়ে রাধাকৃষ্ণ হ'য়ে উঠেছিল শাশ্বত প্রেমিক-প্রেমিকা। সকল দ্বেষ, সকল হিংসা, সকল ধর্ম ও সকল সাম্প্রদায়িকতার উর্ধে তাঁরা হ'য়ে উঠেছিলেন আদর্শ প্রেমিক-যুগল। মহাপ্রভুর আজীবন ধ্যান-সাধনার মধ্য দিয়ে এ রাধা-কৃষ্ণ হ'য়ে উঠেছিল সর্বজনীন। বাংলার শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত কবিগণ তাই প্রেমের কথা বলতে গিয়ে রাধা কৃষ্ণের আশ্রয়ই গ্রহণ করেছেন।

অবশ্য এ রাধাকৃষ্ণ যে সর্বত্রই লৌকিক নায়ক-নায়িকা নয় আমাদেব আলোচনার কোন কোন অংশে আমরা দেখেছি এঁরা বৃষভানু-নন্দিনী এবং যশোদা নন্দন হ'য়ে উঠেছেন এবং এ সব অংশের কবিগণও আর ঠিক অবৈষ্ণব নন—বৈষ্ণবানুরাগী। কোন কোন পদের ভণিতাংশে এই অনুরাগ শতধারায় উৎসারিত হ'য়ে উঠেছে! এমনি ধরণের কয়েকটি ভণিতার উল্লেখ করে আমরা এ প্রসঙ্গের সমাপ্তি করব!

ক॥ চাঁদ কাজী বলে বাঁশী শুনে ঝুরে মরি।
জীমুনা জীমুনা আমি না দেখিলে হরি॥

খ ॥ দুঃখ সব দিল—নিদয়া কালায়।
ভাবিয়া ইরকানে কয় শ্যামের চরণ যেন পাই ॥

গ ॥ জন্ম নিয়া মুসলমানে বঞ্চিত হব শ্রীচরণে
আমি মনে ভাবিনা একবার।
এবার লাল মামুদে হ'রেকৃষ্ণ মন করেছে সার ॥

ঘ। সৈয়দ মর্তুজা বাণী শুন রাধা ঠাকুরাণী
ধনি ধনি তোমার জীবন
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর যারে ভাবে নিরন্তর
সে তোমার কেবল শরণ ॥

ঙ। সৈয়দ মর্তুজা কহে শুন মোর কথা।
মন মোর মজি রৈল বাঁশী পুরে যথা ।।

চ। সৈয়দ মর্তুজা ভণে কানুর চরণে নিবেদন শুন হরি।
সকল ছাড়িয়া রহিলু তুয়া পায়ে জীবন মরণ ভরি ॥

এ সকল ভনিতা হ'তে নামগুলি তুলে চণ্ডীদাসাদির নাম বসিয়ে দিলে কোথাও কোন অশোভন হয় কি? এ সকল ভনিতায় কবি মনের ব্যাকুলতা, কবি মনের আবেগ, আকূতি অত্যুজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। কৃষ্ণ-পদ সেবাই এদের কাম্য। এখানে কোন জাতীয় সংকীর্ণতা কোন ধর্মের বেড়াজাল কবির শুভ্র—কামনাকে আবিল করে তুলতে পারেনি। সর্বসংস্কারমুক্ত উদার প্রাণ এবং বিপুল-বিস্তারী মন নিয়ে কৃষ্ণের শান্ত পদছায়া কামনা করেছেন। একেশ্বরবাদী মুস্‌লিম কবিদের পক্ষে এ যেন চুড়ান্ত বিদ্রোহ ঘোষণা।

॥ তিন ॥

॥ বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসাদির প্রভাব ॥

রাধা-কৃষ্ণ-লীলা বিষয়ক পদ রচনায় পরিধি খুব সীমিত। উপকরণ এক উপস্থাপন ভংগীও একই পন্থানুসারী একই ভাষা; একইরূপ একই রেখা; তাই একের প্রভাব অপরের মধ্যে পড়তে বাধ্য। বিদ্যা-

পতি চণ্ডীদাস যে পদ রচনা করে গেছেন, যে সুরে আলাপন করেছেন—কমবেশী অন্যান্য সকল মহাজনদের পদে তার ছায়াপাত ঘটেছে কেবল ছায়াপাত নয়—সময় সময় একই পদ দু'এক জায়গায় সামান্য অদল-বদল হয়ে অন্য পদকর্তার নামে প্রচলিত হয়েছে। বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন মুসলমান কবিদের সৃষ্টিতে অনুরূপ পদ পরিলক্ষিত হয়। এঁরা কেবল মহাজনদের পদাবলীতে আকৃষ্ট হয় নি।—অনুকরণ করেছেন। সেই অনুকরণের মধ্যেও 'কবি-ব্যক্তিত্বের' স্পর্শ টুকু অনুভব করা যায়। মুসলিম কবিদের যে পদ সমুহে অন্যান্য মহাজনের পদের প্রভাব ব্যাপক—নিম্নে আমরা তার কয়েকটি মাত্র উদ্ধৃত করছি।
আলাওলের এই পদটিতে ঃ

চলিল কামিনী গজেন্দ্র গামিনী
খঞ্জনগমন শোভিতা ॥

বিদ্যাপতির নিম্নোদ্ধৃত পদটির প্রভাব সুগভীর

গেলি কামিনী গজহু গামিনী
বিহসি পালটি নেহারি'।

নাশীর মামুদের গোষ্ঠবিহারের একটি পদে গোবিন্দদাসের রাসের একটি পদের ভাষা শব্দ-ঝংকার এবং সুর বৈচিত্র্য অবিকল ধরা পড়েছে। যদিও একটি গোষ্ঠবিহারের আর-অপরটি রাসের একটির ভাবমাধুর্য অপরটি হতে ভিন্ন তথাপি মনে হয় নাশীর মামুদ গোবিন্দদাসের পদটি সম্মুখে রেখে আপন পদ রচনা করেছেন। উভয় পদের দুই পংক্তি। প্রথমে নশীর মামুদ ঃ

বয়স কিশোর মোহন ভাঁতি
বদম ইন্দু জলদ-কাঁতি
চারু চন্দ্রি গুঞ্জা হার
বদনে মদন ভাণরি।

এই সাথে গোবিন্দদাসের পদ ঃ

হেরত রাতি ঐছন ভাতি
শ্যাম মোহন মদনে মাতি
মুরলী গান পঞ্চম তান
কুলবতী চিত চোরণী।

মুসলিম পদকর্তাদের বহুপদে চণ্ডীদাসের পদাবলীর সুরধ্বনিত হ'য়ে উঠেছে। বহুপদে ভাষার সারল্য, ছন্দের বাঁধুনি এবং ভাবের শান্ত শুভ্রগভীরতা যেন হুবহু চণ্ডীদাস হতে গ্রহণ করা। বস্তুতঃ পাঠের সময় আমরা চণ্ডীদাস পড়ছি না সেখলাল-সৈয়দ মর্তুজা পড়ছি বোঝা কষ্টকর। সেখলালের "শুন লো স্বজনি কিছুই না জানি কি বুধি কবির আমি (পূর্বোদ্ধৃত) এবং সৈয়দ মর্তুজার "শ্যাম বঁধু, আমার পরাণ তুমি" (পূর্বোদ্ধৃত) ইত্যাদি পদগুলির সাথে চণ্ডীদাসের পদের কোনই পার্থক্য নেই। একে অপরের পরিপূরক না পাদপূরক—বলা মুস্কিল, বোঝা শক্ত।

বসন্তোৎসবের দু'টি পদ প্রায় এক বলেই মনে হয়। একটি কবীরের অপরটি জ্ঞানদাসের। তবে লক্ষণীয় বিষয় এই কবীর এখানে জ্ঞানদাস অপেক্ষা অধিকতর সার্থক। কবীরের পদের অংশত এই ঃ

বরজ কিশরী ফাগু খেলতে রঙ্গে
চুয়া-চন্দন, আবীর গোলাব
দেয়ত শ্যামের অঙ্গে ॥

আর জ্ঞানদাসের পদ ঃ

মধুবনে মাধব দোলত রঙ্গে
ব্রজ বদিতা ফাগু দেই শ্যাম অঙ্গে।

অধিক উদ্ধৃতির প্রয়োজন নেই। একের প্রভাব যে অপরের উপরে পড়েছে একথা স্বীকার না করে উপায় নেই। আর না পড়েও উপায় ছিল না। কেননা পথ একই—চলতে গেলে পদচিহ্নের ওপর পদচিহ্ন

পড়বেই। পুর্ব-রাগোন্মত্ত রাধার ব্যাকুল ভাব, মেঘ দর্শনে গৌর রাধার বিরহ-কাতর মুর্তি দুর্যোগঘন বাদলঝরা নিশীথে অভিসারিকা রাধার দৃঢ় পদক্ষেপ বংশী-ধ্বনিতে শ্রীমতীর শ্যাম-আকুলতা—ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই একই সুর, একই ভাবের একই আলাপন। তবুও আনন্দের কথা এই একই পথে পদচারণা করেও আপন মানস বিভিন্নতার জন্য এই কবিকুলের পদরাজীতে এক একটি আশ্চর্য-মনোরম চিত্র ফুটেছে, ক্ষণ-সুন্দর মূহুর্তগুলি স্বর্ণচেলিতে আবদ্ধ। কেবল বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবিদেরই না—সমগ্র বৈষ্ণব কবিকুলের সার্থকতা এখানেই। এই চির পুরাতনের মাঝে চির নতুনের সৃষ্টিতে।

।। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ।।

।। এক ।।

॥ ভূমিকা ঃ চৈতন্যদেব ও জীবনী গ্রন্থ ॥

বহু প্রসঙ্গে, বহু স্থানে আমরা উল্লেখ করেছি যে মহাপ্রভুর আবির্ভাবে কেবল দেশ নয় দর্শন, সমাজ নয় সাহিত্যেও নতুন প্রাণ পেয়ে জেগে উঠেছিল। সর্বত্রই জেগেছিল একটা প্রাণের আভাস, জীবনাবেগ। প্রাক্-চৈতন্য যুগে বাংলা সাহিত্যের যে সকল ধারা আত্মবিকাশ করেছিল চৈতন্যত্তর যুগে তাদের বলিষ্ঠ রূপ-সম্পূর্ণতা তো ঘটেছিল উপরন্তু বাংলা সাহিত্যের এমন একটি শাখার উৎসমুল খুলে গিয়েছিল যার পদধ্বনি বাংলা সাহিত্যের বুকে এই প্রথম শোনা গেল। এই শাখাটি হ'ল জীবনী শাখা। মানুষের-জীবনী এই সর্বপ্রথম বাংলা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হ'ল। মানুষের কথা-কাহিনী, তাঁর আচার-আচরণ, তাঁর বাসনা-কামনা এই সর্বপ্রথম সাহিত্যের পৃষ্ঠায় আত্মপ্রকাশ করল। পুর্বে যা ছিল অসম্ভব, পুর্বে যা ছিল অলীক-অবিশ্বাস্য পরে তাই বিপুল বর্ণ-বিন্যাসে একান্ত বাস্তব-বিশ্বাস্য হ'য়ে উঠ্‌ল। এ প্রচেষ্টার শ্রেষ্ঠ ফসল কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—অসংখ্য চৈতন্য-জীবনী-গ্রন্থের মধ্যে সবাপেক্ষা প্রামাণিক এবং প্রতিষ্ঠিত। গুণ এবং গুরুত্ব সকল দিক দিয়েই এর মূল্য অপরিসীম।

এ প্রসঙ্গে চৈতন্য-জীবনী-গ্রন্থেব মূল-স্বরূপটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। চৈতন্য-জীবনী নিয়ে গ্রন্থ রচিত হ'তে পেরেছিল তার প্রধান কারণ মহাপ্রভুর জীবনই ছিল তাঁর বাণী। তিনি যে দেববাদ-নির্ভর-মানবতাবাদরে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁর জীবনাচরণই ছিল সে মতবাদের পরিপোষক এবং পূর্ণ অভিব্যক্তি। তিনি একাধারে মানুষ এবং দেবতা —এক বৃন্তে দুটি ফুল, নর এবং দেবতার যুগল প্রতীক। আধুনিক যুগে যে সকল জীবনী গ্রন্থ রচিত হ'চ্ছে তা'তে দোষ-গুণ পাপ-পুণ্য সমন্বিত মানুষটির ছবি সুস্পষ্ট কিন্তু মধ্যযুগের ধর্মান্ধতার আমলে সেটি হ'বার

উপায় ছিল না—মানুষ নয় দেবতার লীলা-খেলার উপরেই গণজীবনের আস্থা ছিল বেশী। নর রূপীদেব শ্রীচৈতন্য আপন জীবনাচরণের দ্বারা দৈবী কর্মের মত অসাধ্যসাধন করতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর জীবনালেখ্য রচনায় অসংখ্য জীবনীকার উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। তবে এ প্রসঙ্গে এটাও লক্ষণীয় মহাপ্রভুকে দেবতার আসনে বসিয়ে অনেক জীবনীকার তাঁর জীবনের সত্য ঘটনাকে পিছনে ফেলে অবাস্তব অলৌকিক ঘটনা বর্ণনায় মেতে উঠেছেন। তবে আমাদের সৌভাগ্য চৈতন্যচরিতামৃত এদিক দিয়ে সম্পূর্ণ নির্দোষ না হ'লেও প্রায়-নির্দোষ। অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ এ গ্রন্থে আছে—কিন্তু সত্য ঘটনার সাথে এই অলীক কাহিনীগুলি এমনভাবে মিশে আছে যে এগুলিকে চিনতে মোটেই বেগ পেতে হয় না।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত কেবল জীবনী গ্রন্থই নয়—মহাপ্রভুর জীবনী বর্ণনা-প্রসঙ্গে বৈষ্ণব-ধর্মের তত্ত্বকথাগুলির বিশ্লেষণে এই বিপুলায়তন গ্রন্থের বিরাট একটা অংশ ব্যয়িত হ'য়েছে। নিম্নে আমরা কয়েকটি অধ্যায়ের আলোচ্য গ্রন্থে সন্নিবেশিত মূল তত্ত্বককথাগুলির প্রধান কয়েকটি অন্তর্নিহিত সত্য সার বুঝে নিতে চেষ্টা করব।

॥ **দুই** ॥

॥ গৌরতত্ত্ব ও রাধাতত্ত্ব ॥

শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর লোকোত্তর জীবন-লীলার মহাভাষ্যকার শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁর সাহিত্য ও সাধন-জীবনের মহা-সৃষ্টি চৈতন্যচরিতা-মৃতের আদি-লীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদে গৌরতত্ত্ব ও রাধাবাদের জটিল স্বরূপটি অভিনব প্রজ্ঞার আলোকে সুন্দর করে তুলে ধরেছেন। তত্ত্বের গহনারণ্যে প্রবেশ করার পুর্বে আমরা তত্ত্বের মূল জিজ্ঞাসাগুলির সাথে পরিচিত হওয়ার চেষ্টা করবো। জিজ্ঞাসাগুলি এই ভাবে উপস্থিত করা যেতে পারে :

শ্রীরাধা কে? শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি কী কারণে শ্রীরাধারূপে প্রকাশিত হয়? কী কারণে এক বস্তু দুইরূপে আত্মপ্রকাশ করেন?

এক বস্তু দুইরূপে প্রকাশিত হয়ে আবার একীভূত হন কেন? শ্রীগৌরাঙ্গ কে? 'রাধাভাবদ্যুতি সুবলিততনু' রূপে অবতারের কারণ কি? ইত্যাদি।

ভগবানের স্বরূপ-শক্তি তিন রূপে প্রকাশিত—সৎ (সান্ধনী বা ইচ্ছাময়)' চিৎ (সংবিৎ বা জ্ঞানময়) এবং আনন্দ (হ্লাদিনী বা আনন্দময়)। ত্রয়ীরূপে ভগবানের এই যে প্রকাশ—এ প্রকাশ পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ-যুক্ত —একে অপর হ'তে সম্পূর্ণ পৃথক বা বিচ্ছিন্ন নয়। সৎ, চিৎ, আনন্দ এরা প্রত্যেকেই একে অপরের ক্রম ঘনীভূত রূপ মাত্র। দুগ্ধের সারাংশ যেমন সর, সরের ঘনীভূত রূপ যেমন ক্ষীর তেমনি সৎ-এর ঘনীভূত রূপ চিৎ-এর ঘনীভূত-তর রূপ আনন্দ। সুতরাং আনন্দাংশেই হলো ভগবানের স্বরূপ-শক্তির শ্রেষ্ঠতম বিকাশ-ক্ষেত্র। এখন যে আনন্দাংশকে আমরা ভগবানের স্বরূপ-শক্তি বিকাশের শ্রেষ্ঠতম অংশ রূপে আখ্যায়িত করলাম সেই আনন্দাংশেরও একটি সারতম অংশ আছে—যে অংশের জন্যেই আনন্দাংশ সজীব, যে অংশই আনন্দাংশের প্রাণ-স্পন্দন। এই সারতম শক্তিটির নাম হ্লাদিনী শক্তি। সুতরাং এই হ্লাদিনী শক্তিই হলো শ্রীভগবানের শ্রেষ্ঠতম শক্তি। হ্লাদিনী শক্তিই সকল শক্তির আবাস-স্থল। কবিরাজ গোস্বামী এই হ্লাদিনী শক্তির সারকে প্রেম, প্রেমের সারকে ভাব এবং ভাবের পরম-প্রকাশকে মহাভাব বলেছেন। শ্রীরাধা হলেন এই মহাভাবের মূর্ত প্রতীক:

> হ্লাদিনীর সার প্রেম প্রেমসার ভাব।
> ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম মহাভাব॥
> হাভাব স্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
> সর্বগুণ-খনি কৃষ্ণ কান্তা-শিরোমণি॥....॥আদিলীলা: ৪র্থ পরিচ্ছেদ

সুতরাং রাধা শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তির চরম বিকাশ—হ্লাদিনী শক্তির মূর্ত বিগ্রহ। রাধা-শ্রীকৃষ্ণ পৃথক নয়—এক, বিভিন্ন নয়—একাত্ম। শ্রীরাধা হলেন শ্রীকৃষ্ণের 'প্রণয়-বিকার'—শ্রীকৃষ্ণের এক শক্তিই শ্রীরাধায় রূপান্তরিত:

রাধা এক আত্মা দুই দেহ ধরি।

অন্যোন্য বিলসে রস আস্বাদন করি ॥....॥আদিলীলা : ৪র্থ পরিচ্ছেদ ॥

রাধা-কৃষ্ণ যদি একাত্মই হন তা' হলে তাঁদের দুই দেহ ধরার কারণ কী ? সংক্ষিপ্ত ভাবে এর উত্তরে আমরা বল্‌তে পারি—এই দুই দেহ ধারনের মূলে রয়েছে ভগবানের আত্মোপলব্ধির তীব্র স্পৃহা। দুই দেহ ধারণ করে তিনি নিজেকেই নিজে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। বাহ্যতঃ কথাটা আপাতঃ বিরোধী মনে হ'তে পারে। কেননা রাধা যদি তাঁর অংশই হন তা' হ'লে রাধা তো তাঁর নিজের মধ্যেই বর্তমান—সুতরাং পৃথক দেহ ধারণ না করেও তো তিনি নিজের মধ্যেই নিজেকে উপলব্ধি করতে পারেন। কিন্তু নিজের মধ্যে সকল উপাদান থাকা সত্ত্বেও নিজেকে উপলব্ধি করা যায় না—রসাস্বাদনের জন্যে দ্বৈত্য সত্তার প্রয়োজন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে আমরা এই মন্তব্যটির মর্মমুল হ'তে সার নিষ্কাষণ করার চেষ্টা করবো। আমরা গল্প-কবিতা রচনা করি কেন ? গল্পের বিষয়বস্তু, কবিতার সকল উপাদান তো আমাদের মানসলোকে বর্তমান তবুও তার বহিঃপ্রকাশ অনিবার্য হয়ে পড়ে। কেন ? ছবি যিনি আঁকেন তাঁর সম্পর্কে ঠিক এই একই প্রশ্ন উথাপন করা চলে। ছবির সকল পরিকল্পনা শিল্পীর গহন মনে বিরাজিত—তবুও সেই পরিকল্পনাকে রূপরেখায় তাঁকে বাইরে প্রকাশ করতে হয়। যতক্ষণ মূল পরিকল্পনাটি দ্বৈত সত্তার আপন স্বরূপে প্রকাশিত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত কবি-শিল্পীর তৃপ্তি নেই—সমগ্র জীবন-জুড়ে চলে অতৃপ্তির দাহ। আপন গহণ মনে কল্পনাশ্রয়ী যে রূপ তাকে স্বরূপের মাঝে রূপায়িত করে, কবিতা বা চিত্রের মর্মমূলে সঞ্চারিত করে দিয়ে—যে দ্বৈত শিল্প-রূপ গড়ে ওঠে সেই শিল্পরূপের মাঝেই হয় শিল্পী মনের নব পরিচয়। এই শিল্পরূপ আর কিছুই নয় সেই অনাদি অতীত চির পুরাতনকে 'নূতন বিবাহে'র বন্ধনে আবদ্ধ করে নতুন করে পাওয়া। যতক্ষণ ভাবোদ্বেল চিন্তারাশি শিল্পীর মানসলোক ছিল ততক্ষণ শিল্পীর পক্ষে সেই বিশেষ ধ্যান-চিন্তা হতে রসাস্বদন করা হয়নি—কিন্তু সেই ধ্যান-কল্পনা যখন শিল্পী মনের মাধুরী-সংমিশ্রনে মূর্তি

পরিগ্রহ ক'রে বাইরে প্রকাশিত হলো তখন তার সাথে কবির হলো নতুন পরিচয়। শিল্পরূপ ও শিল্পীমন নির্জন মিলন-লীলায় আপন-হারা হয়ে গেল। নিজেকে বিভক্ত করে দেখতে না পারলে কখনো আত্মোপলব্ধি সম্ভব নয় এই উপলব্ধির জন্যেই ' শ্রীকৃষ্ণ আপন শক্তির মর্ম্ম-নির্যাস দিয়ে রাধাকে সৃষ্টি করলেন। রাধা হলেন শ্রীকৃষ্ণের প্রতিবিম্ব (Image) রাধার সাথে শ্রীকৃষ্ণের যে লীলা এ নিজের সাথে নিজের লীলা, নিজেই নিজে অনুভব করা। নিজের বিভক্ত রূপে এই যে রাধার সৃষ্টি হলে স্বভাবের সৃষ্টি, সৃষ্টির আবেগে ও আনন্দেই এ সৃষ্টি সুন্দর। সুতরাং স্বভাবানুগ রাধা-সৃষ্টির সাথে ভগবানের যে লীলা এ হলো আপনার অন্তরে আপনার আস্বাদন, এ হলো মনের মুকুরে আত্মোপলব্ধি—Self realisa tion ঠিক এই চিন্তাই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সুন্দর রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে 'বলাকা'র অনেকগুলি কবিতা তার প্রমাণ। যে দিন ভগবান একা-ছিলেন সেদিন তাঁর আত্মোপলব্ধি সম্ভব হয়নি ঃ

যেদিন তুমি আপনি ছিলে একা।
আপনাকে তো হয়নি তোমার দেখা।

ভগবানের অখণ্ড সত্তার মধ্যে তাঁর সমুদয় কল্পনা-চিন্তা পঙ্গু ও মূক হয়ে-ছিল কিন্তু এই অখণ্ড সত্তা ভেঙে যেদিন এল সৃষ্টির প্রবাহ সেদিন ভগবানের পক্ষে সম্ভব হলো তাঁর আত্মোপলব্ধি, সৃষ্টির মধ্য দিয়েই তিনি পেলেন আপনার পরশ ঃ

আমি এলেম, তাই তো তুমি এলে,
আমার মুখে চেয়ে
আমার পরশ পেয়ে
আপন পরশ পেলে।

শ্রীভগবানের আত্মোপলব্ধির বিশাল ক্ষেত্র হলেন শ্রীরাধা। সাধারণের বিশ্বাস ভু-ভার হরণের নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণ মর্তে অবতীর্ণ হয়ে ছিলেন কিন্তু

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মতে ভূ-ভার হরণ হলো শ্রীকৃষ্ণের মর্তে অবতারের গৌণ কারণ—মুখ্য কারণ হলো রাধার অসীম প্রেমরস নির্যাস-আস্বাদন এবং এই আস্বাদনের মাধ্যমে আপনার স্বরূপ-উপলব্ধি।

এখন স্বভাবতই অমাদের মনে প্রশ্ন জাগে রাধার প্রেমাস্বাদন যদি কৃষ্ণাবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য হয় তা' হলে কৃষ্ণাবতারের পর আবার গৌরাঙ্গাবতার কেন? কবিরাজ গোস্বামী তাঁর চরিতামৃতে গৌরাঙ্গ অবতারের তিনটি কারণ প্রদর্শন করেছেন এবং সেই তিনটি কারণকে অবলম্বন করেই তিনি শ্রীরাধার স্বর্গীয় প্রেম-সুষমার অভিনব ব্যাখা দান করেছেন। কৃষ্ণাবতারে প্রেমাস্বদনের পরও শ্রীরাধার প্রেমের কয়েকটি বিশেষ দিক আস্বাদনের উপর ভগবানের বিশেষ বাসনা ও আকাঙ্খা ছিল—সেই আকাঙ্খার পরিতৃপ্তির জন্যেই প্রয়োজন হয়েছিল গৌরাঙ্গাবতারের। গৌরাঙ্গবতারে প্রেমাস্বাদনেব পুষ্টি সর্বাধিক। প্রেমাস্বাদনের ব্যাপাবে শ্রীভগবানেব মনে যে সুপ্ত আকাঙ্খার কথা আমরা উল্লেখ করলাম সেই বাসনাগুলি স্বরূপদামোদরের কড়চায় সুন্দর রূপে প্রকাশিত হয়েছেঃ 'যে প্রেমের দ্বারা রাধা আমার অদ্ভুত মাধুরিমা আস্বাদন করে সে প্রণয় মহিমাই বা কি রকম, আর বাধাপ্রেম কর্তৃক আস্বাদ্য যে আমার অদ্ভুত মাধুরিমা তাই বা কি রকম; আমাকে অনুভব করে রাধার যে সুখ হয় তাই বা কি রকম,—এবই লোভে রাধাভাবযুক্ত হ'য়ে শচীগর্ভরূপ সিন্ধুতে হরি (গৌরাঙ্গ) রূপ ইন্দু (চন্দ্র) জন্মগ্রহণ করেছেন।

এই কড়চায় ভগবানের যে তিনটি লোভের কথা বলা হয়েছে সেগুলি নিম্নলিখিত ভাবে প্রতিবিম্বিত করা যেতে পারেঃ

ক।। শ্রীরাধার অতলান্ত প্রেমের মহিমা কেমন?
খ।। রাধা আস্বাদিত কৃষ্ণের অদ্ভুতমাধুরিমা কেমন?
গ।। কৃষ্ণ-প্রেমাস্বাদনে রাধায় যে সুখ হয় তা' কেমন?

কৃষ্ণাবতারে রাধাপ্রেমের এই বিচিত্র দিক আস্বাদন করা ভগবানের পক্ষে

সম্ভব হয়নি—কেননা উপরে যে তিনটি লোভের কথা বলা হয়েছে রাধা-ভাব ব্যতীত কৃষ্ণ-স্বরূপে এই তিনটির একটিও আস্বাদন করা সম্ভব নয়। তাই ভগবান 'রাধাভাবদ্যুতি সুবলিততনু' ধারণ করে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। গৌরাঙ্গ কেননা বহিঃ প্রকৃতি গৌর (শ্রীরাধার বর্ণের ন্যায়) কিন্তু অন্তঃপ্রকৃতি কৃষ্ণময় (শ্রীরাধার অন্তরও কৃষ্ণময়—তিনি কৃষ্ণগত প্রাণা)। রাধার দুর্লভ অলৌকিক প্রেম-বর্ণনা-প্রসঙ্গে কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন ঃ

কৃষ্ণপ্রেম ভাবিত যার চিত্তেন্দ্রিয় কায়।
কৃষ্ণ-নিজশক্তি-রাধা—ক্রীড়ার সহায় ॥

অন্যত্র ঃ

কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তঁহো কৃষ্ণ স্ফুরে ॥

রাধা কৃষ্ণময়ী—কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কিছুই তার ধ্যেয় নয়। কৃষ্ণকে পরিতৃপ্ত করাই তাঁর জীবন-সাধন। আপন-হারানো মাধুর্য ভাব দিয়েই রাধা শ্রীকৃষ্ণকে পরিতৃপ্ত কবতে চেয়েছেন। মাধুর্য ভাব আবার দ্বিবিধ—স্বকীয়া এবং পরকীয়া। পরকীয়া প্রেমে রসের স্ফূরণ সর্বাধিক। ব্রজ গোপীগণসহ শ্রীরাধা সেই পরকীয়া প্রেমের চরম প্রতীক। শ্রীরাধিকাকে 'কৃষ্ণ কান্তা-শিরোমণি' বলা হয়েছে। শ্রীরাধিকা হতেই কৃষ্ণকান্তাগণের বিস্তার। এইকৃষ্ণ-কান্তাগণ ত্রিবিধ ঃ বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীগণ, দ্বারকায় মহিষী-গণ এবং ব্রজধামে ললিতাদি ব্রজাঙ্গনাগণ। লক্ষ্মীগণ শ্রীরাধার বৈভব-বিলাস অংশ রূপ, মহিষীগণ বৈভব প্রকাশ স্বরূপ এবং ব্রজগোপীগণ তাঁর কায় ব্যুহরূপ। শ্রীরাধা হ'তেই এই সকল কান্তাগণের বিস্তার কিন্তু কেউই শ্রীরাধার অনুরূপ নন। শ্রীরাধাই একমাত্র মহাভাব স্বরূপা—অন্য কোন কান্তার মধ্যে এই মহাভাবের লক্ষণ নেই।

আমরা পুর্বেই উল্লেখ করেছি সর্বান্তঃকরণে কৃষ্ণ প্রীতিই শ্রীরাধার লক্ষ্য বহু কান্তা ব্যতীত কৃষ্ণ প্রীতি এবং প্রেমোল্লাস সর্বোচ্চ-সীমা (Climax)

স্পর্শ করতে পারে না—তাই এক রাধিকাই ত্রিবিধ বহু কান্তায পরিণত হয়ে কৃষ্ণকে অনন্ত প্রেম-সম্ভাবেব বহু বিচিত্র লীলাবসাস্বাদন করান। রাধার প্রেমে এক দুর্বার শক্তি আছে—যে অদৃশ্য শক্তি নিরন্তর প্রবল ভাবে কৃষ্ণকে আকর্ষণ করে। রাধার এই অতলান্ত প্রেমেব মাধুর্য উপলব্ধির জন্য কৃষ্ণ আকুল। এই প্রবল আকাঙ্ক্ষা নিবৃতির জন্যে তাঁকে গৌব রূপে অবতীর্ণ হ'তে হয়েছে। বাধাব সে দুর্বাব দুর্জয প্রেমেব মহিমা কেমন—যে প্রেম গুরু-রূপে শিষ্য কৃষ্ণকে নাচায, যে প্রেম শ্রীকৃষ্ণের দেহকান্তি অবশ কবে ?

না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল।
যে বলে আমারে করে সর্বদা বিহ্বল ॥
রাধিকার প্রেম গুরু আমি শিষ্য নট।
সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায উদ্ভট ॥

শ্রীভগবান চিন্তাব গহণ গভীবে তলিযে যান। তিনি হলেন বাধাব প্রেমের বিষয় এবং সে প্রেমের আশ্রয স্বযং বাধা। বিষয জাতিয সুখ (অর্থাৎ কৃষ্ণের আনন্দানুভূতি অপেক্ষা আশ্রয়-আহ্লাদ) (অর্থাৎ বাধাব প্রেমানন্দ) কোটিগুণ বেশী। বাধাব প্রেমে যে আনন্দ কৃষ্ণ পান তদপেক্ষা কোটিগুণ বেশী সুখলাভ করেন শ্রীবাধা বাধাব এই অতল-স্পর্শী-সুখ সম্ভাব আস্বাদন কবাব জন্যে শ্রীকৃষ্ণ লালায়িত হযে ওঠেন :

আশ্রয় জাতীয় সুখ পাইতে মন ধায়।
যত্নে আস্বাদিতে নারি কি করি উপায় ॥

এই উপায় নির্ণয়ে শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণকে গৌব অবতাবে পুনরায ধরায় অবতীর্ণ হ'তে হযেছে। কেননা বাধাব আনন্দানুভূতি আস্বাদন করতে গেলে মনে প্রাণে রাধা ভাবে না ভাবিত হলে সে আনন্দ পাওয়া সম্ভব নয়।

গৌর অবতারের দ্বিতীয় কারণ হলো কৃষ্ণের মধ্যে যে ‘অদ্ভুদ মাধুরিমা' আছে— যে মাধুরিমায় রাধা উন্মাদিনী, যে মাধুরিমা রাধাকে তীব্র ভাবে আকৃষ্ট করে সেই মহান কৃষ্ণ-মাধুরীর আস্বাদন। এখানেও এই মাধুরিমাকে আপন হৃদয়মূলে গ্রহণ করতে হলে রাধা-রূপ গ্রহণ ছাড়া অন্য পথ নেই। কেননা আপনার ভিতর যে মাধুর্য আছে তা' তো আপনি স্বয়ং আস্বাদন করা যায় না। এ মাধুরিমায়, এই নধর দেহ-কান্তিতে রাধাই আকৃষ্ট হয়েছেন, শ্যামল-যৌবন-বনে রাধাই মন হারিয়েছেন—সুতরাং এই মন হারানোর আবেগ ও আনন্দ গ্রহণ করতে হলে রাধা ভাবই একমাত্র এবং অব্যর্থ অবলম্বন ঃ

দর্পনাদ্যে দেখি যদি আপন মাধুরী।
আস্বাদিতে লোভ হয় আস্বাদিতে নারী ॥
বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ-উপায়।
রাধিকা স্বরূপ হইতে তবে মন ধায় ॥

কবিরাজ গোস্বামী কৃষ্ণের আপনার অদ্ভুত মাধুরিমা আস্বাদন করার আকুলতাকে অন্যত্র বলেছেন—‘আপনি আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন।' গৌর রূপে অবতীর্ণ হয়ে শ্রীভগবান নিরন্তর আপনাব অপূর্ব মাধুর্য আপনি বিভোর হয়ে সর্বদা আস্বাদন করেছেন। গৌর রূপের অন্তরালে কৃষ্ণ-মাধুর্য-আস্বাদনই শত ভাব-ব্যঞ্জনায় আভাসিত হয়েছে।

গৌর-অবতারের তৃতীয় কারণ হলো কৃষ্ণের লীলামৃতে অবগাহন করে শ্রীরাধার সর্ব দেহে মনে যে অনন্ত সুখানুভূতি জাগ্রত হয় সেই মিলন জনিত পরম সুখ আস্বাদন করা। রাধার যে প্রেম তা' প্রাকৃত নয়—অপ্রাকৃত, তা' সকাম নয়—নিষ্কাম, তা আত্মেন্দ্রিয় নয়—কৃষ্ণেন্দ্রিয়। এখানে কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে রাধার প্রেমেও ‘কাম' ছিল কেননা তাঁকে ‘কামেশ্বরী' বলা হয়েছে কিন্তু লক্ষ্য করা উচিত এ কাম ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় কলঙ্কিত নয়—এ কাম মহাভাব স্বরূপা, স্বর্গীয় সংগীত-সুষমায় ঝংকৃত। এ কাম সকল প্রাকৃত জগতের গণ্ডী বিদীর্ণ করে—নির্মল অসীম

প্রেমের দিকেই ইংগিত করে। শ্রীরাধার প্রতিদ্বন্দ্বিনী 'চন্দ্রাবলী'র প্রেমের মধ্যে লেশমাত্র আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা থাকায় তা রাধিকার প্রেম অপেক্ষা নিকৃষ্ট। গোপীগণের বিশুদ্ধ প্রেমের আবেদনের কাছে শ্রীকৃষ্ণকে বারবার পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। কেননা গোপী-গণের যে প্রেম তা' সম্পূর্ণ রূপে কৃষ্ণেন্দ্রিয়। আপনার অঙ্গকে সুসজ্জিত রাখলে কৃষ্ণের আনন্দ বর্ধিত হয় সুতরাং গোপীগণ আপনাদের আপন আপন অঙ্গের প্রতি যত্নবান ঃ

আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ।
এত সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গ মুখ ॥

অন্যত্র ঃ

এই দেহ কৈল আমি কৃষ্ণে সমার্পণ।
তার ধন তার এই সম্ভোগ সাধন ॥
এ দেহ দর্শন স্পর্শে কৃষ্ণ সম্ভাষণ।
এই লাগি করে দেহে মার্জ্জন ভূষণ ॥

গোপীগণের এই প্রেমে স্বকীয় কোন দুঃখানুভূতি বা সুখানুভূতি নেই—সকল কিছু কৃষ্ণেন্দ্রিয়। অদ্ভুত এই গোপীগণেব নিষ্কাম প্রেম! কিন্তু এর মধ্যে আবার রাধিকা হলেন অদ্ভুততম ঃ

সেই গোপীগণ মধ্যে উত্তমা রাধিকা।
রূপেগুণে সৌভাগ্যে প্রেমে সর্বাধিকা ॥

নিষ্কাম প্রেমের ক্ষেত্রে রাধা এক বিরল-ব্যতিক্রম। কৃষ্ণই তাঁর আজীবনের ধ্যান স্বপ্ন। কৃষ্ণের প্রেমাস্বাদনে রাধা যে আনন্দ পান তার প্রকৃষ্ট উপমাস্থল একমাত্র রাধাই—স্বয়ং কৃষ্ণেও নন ঃ

পরস্পর বেণুগীতে হরয়ে চেতন
মোর ভ্রমে তমালেরে করে আলিঙ্গন ॥
কৃষ্ণ-আলিঙ্গন পাইনু জনম সফলে।
সেই সুখে মগ্ন রহে বৃক্ষ করি কোলে ॥

আমার সঙ্গমে রাধা পায় যে আনন্দ।
শতমুখে কহি যদি নাহি পাই অন্ত॥

মিলন জনিত এই অন্তহীন সুখের আস্বাদনই শ্রীকৃষ্ণের একান্ত কামনার ধন। এই প্রেমাস্বাদনের আকাঙ্খা ক্রমবর্ধমান হয়েই চলেছে—এ কামনাবেগের যেন সমাপ্তি নেই :

নানা যত্ন করি আমি নারি আস্বাদিতে।
সে সুখ মাধুর্য ঘ্রাণে লোভ বাড়ে চিতে॥

এবং শেষ পর্যন্ত এই ক্রমবর্ধমান লোভের পরিসমাপ্তি ঘটেছে 'রাধভাবদ্যুতি সুবলিততনু' গৌর-অবতারের মধ্যে :

রস আস্বাদিতে আমি কৈল অবতার।
প্রেম রস আস্বাদিল বিধির প্রকাশ॥

সাধারণের মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাস—নাম সংকীর্তন প্রচারের জন্যেই কলি যুগে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর অবির্ভাবই। কিন্তু এই বাহ্য—রাধাভাব এবং অঙ্গকান্তি ধারণ করে গৌর-অবতারের মুল উদ্দেশ্যই হলো ভগবানের বহু আকাঙ্খীত এই তিন বাসনা অর্থাৎ রাধার তুলনা-বিরল বিচিত্র প্রেমের ঐকান্তিক আস্বাদন। এই প্রেমাস্বাদনের মধ্যেই নিহিত রয়েছে রসিক শেখর শ্রীকৃষ্ণের গৌর-রূপে অবতারের গুহ্য সংকেত।

॥ তিন ॥

॥ চৈতন্যচরিতামৃতের উপাদান সংগ্রহ ঐতিহাসিক এবং তার বিচার ॥

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের লীলাবসানের প্রায় পঁচাত্তর বৎসর পরে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁর বহু বিখ্যাত গ্রন্থ চৈতন্যচরিতামৃত রচনা সুরু করেন। তিরোভাবের দীর্ঘ দিন পরে গ্রন্থ রচনা সুরু হওয়ায় সাধারণত আমাদের মনে গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনা সমূহের সত্যতা ও তাদের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। কেননা সাধারণতঃ কোন

মহামানবের মৃত্যুর পর তাঁর অপূর্ব জীবন কাহিনী লোক-মুখ-পরম্পরায় এমন অলৌকিক ও কিংবদন্তী মিশ্রিত হয়ে পড়ে যা' থেকে সঠিক সত্য-সার নিষ্কাষণ করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। বিশেষ করে চৈতন্যদেবের মত একজন অতিমানবের জীবন-লীলা সেই কিংবদন্তীর যুগে বহুবিকৃত হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। আমাদের এই স্বাভাবিক সন্দেহ চৈতন্য-চরিতামৃতের ঐতিহাসিকতা বিচারে বোধহয় তীব্র হয়ে উঠ্‌তে পারবে না—কেননা মহাপ্রভুর তিরোধানের দীর্ঘদিন পর গ্রন্থখানি রচিত হলেও গ্রন্থের মধ্য-স্থিত প্রায় প্রত্যেকটি ঘটনা সমালোচনার কষ্টি পাথরে পরীক্ষিত। মহাপ্রভুর দিব্য-জীবন-লীলা নিয়ে যতগুলি জীবনীগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে সেই পুস্তকারণ্যের মধ্যে ঐতিহাসিকতার দিক দিয়ে বোধ হয় চরিতামৃতের দান সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। কেননা কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্য-জীবন লীলার প্রত্যক্ষদর্শী এবং বহু অভিজ্ঞ পণ্ডিতকুলের সংস্পর্শ লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন এবং এত অধিক পরিমাণে মহাপ্রভুর জীবন লীলা সম্বন্ধে গোস্বামীগণের তার্কিক-তাত্ত্বিকতার গর্ভজাত খাঁটি সত্যের সন্ধান পেয়ে ছিলেন যে তা' অন্য কোন চৈতন্য জীবনীকারের পক্ষে লাভ করা সম্ভব হয়নি। এছাড়াও বিভিন্ন ভাষায় রচিত অসংখ্য চৈতন্য জীবনী গ্রন্থের মর্ম-নির্যাস গ্রন্থ রচনার পুর্বেই কবিরাজ গোস্বামী গ্রহণ করেছিলেন। এ সবের উপরেও স্বয়ং কবিবাজ গোস্বামী ছিলেন একাধারে অসামান্য প্রতিভাব অধিকারী, অনন্যসাধারণ পণ্ডিত তত্ত্বজ্ঞানী এবং নিষ্ঠাবান ভক্ত-বৈষ্ণব। ফলে অসীম পাণ্ডিত্য এবং অগাধ চিন্তাশীল মন নিয়ে পরিণত বয়সে তিনি যে মহাকাব্য রচনা করেছেন তাতে অপরিণত মনের অসংযমী উচ্ছাস এবং ফেনিল বাষ্পময় অংশ নেই বললেই চলে। তবে সকল স্থানেই যে ঘটনাব ঐতিহাসিকতা রক্ষিত হয়েছে এমনও বলা চলে না—মাঝে মাঝে অতিরঞ্জন এবং অলৌকিকতার স্পর্শ লেগেছে—এ সবের পরিচয় আমরা যথাস্থানে পাব—কিন্তু এ সকল ছাড়াও মোটামুটি ভাবে গ্রন্থখানিকে ঐতিহাসিক সত্যাধার বলা চলে। চৈতন্যচরিতামৃতে যে সকল ঘটনা বর্ণিত হয়েছে সেগুলিকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে:

ক ॥ শ্রীচৈতন্যের লীলা-প্রবাহ বা জীবন-ঘটনা

খ ॥ শ্রীচৈতন্য কর্তৃক বিভিন্ন তত্ত্বের বিশ্লেষণ—কৃষ্ণ, তত্ত্ব, সাধ্য সাধন নির্ণয় ইত্যাদি।

কবিরাজ গোস্বমী স্বয়ং গ্রন্থমধ্যে ঘটনাংশেব উপাদান সংগ্রহের জন্য প্রধানতঃ চরজন গ্রন্থকারের গ্রন্থের উপর নির্ভর করেছিলেন ঃ

১ ॥ স্বরূপ দামোদরের কড়চা

২ ॥ মুরাবী গুপ্তের কড়চা

৩ ॥ বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত

৪ ॥ কবি কর্ণপুরের চৈতন্যচরিতামৃত ও চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক। বলাবাহুল্য এই চার জনই কবিরাজ গোস্বামীর পুর্বে চৈতন্য-জীবনী লিখে স্বনাম ধন্য হয়েছিলেন কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় এই চারজনের মধ্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ আপন গ্রন্থের মধ্যে কবি কর্ণপুরের নাম একবারও উল্লেখ করেন নি।

এখন মহাপ্রভুর জীবনের বহু বিচিত্র ঘটনার উপাদান সংগ্রহের জন্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ যে গ্রন্থগুলিব উপর নির্ভব করেছিলেন ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে সেগুলি কতটা সত্য তা নির্ণয় কবার প্রশ্ন এসে পড়ে। কেননা মূল গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনাই যদি সত্য না হয় তা' হলে চরিতামৃতে বর্ণিত ঘটনাগুলি মিথ্যা হ'তে বাধ্য। এখন আমরা উল্লিখিত চারটি গ্রন্থের ঐতিহাসিক সত্য-বিচারের চেষ্টা করব।

স্বরূপ দামোদবের কড়চা ঃ চৈতন্যচরিতামৃতে আদি লীলার প্রথম পরিচ্ছেদে দশটি শ্লোক (৫-১৪) "তথাহি শ্রীস্বরূপ গোস্বামীকড়চায়" বলে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু অনেকে আবার মনে করেন শ্লোকগুলি স্বয়ং কবিরাজ গোস্বামীবই রচনা কিন্তু এখানে শ্লোক রচয়িতাকে নিয়ে তর্ক উঠলেও ঐ শ্লোকগুলির অন্তর্নিহিত তত্ত্বগুলি যে স্বরূপ দামোদর কর্তৃক নির্ণীত হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এ ছাড়া চৈতন্যচরিতামৃতের সেই বহুবিখ্যাত 'রাধাভাবদ্যুতি সুবলিততনু' বা রাধাকৃষ্ণের সম্মিলিত মূর্তির লীলা বা তত্ত্ব স্বরূপ-দামোদর কর্তক লিখিত। প্রভুর অন্তলীলা

সম্পর্কে স্বরূপদামোদেরের উক্তি এবং মন্তব্য একান্ত ভাবে নির্ভরযোগ্য। কেননা শ্রীমন্‌মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ সমাপ্ত করে নীলাচলে ফিরে এলে স্বরূপ দামোদর তাঁর ঘনিষ্টতম সংস্পর্শে আসেন তিনি মহাপ্রভুর বদনমণ্ডল অবলোকন করেই তাঁর গহন মনের জাগ্রত ভাব-ধারার পরিচয় পেতেন। অন্তলীলায় যখন মহাপ্রভুর উন্মাদ অবস্থা তখন তিনি স্বরূপেরই গলা ধরে ক্রন্দন করতেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তো স্বরূপকে মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ বলে আখ্যায়িত করেছেন। যা হোক স্বরূপ ছিলেন বহুশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত পরম, ভক্ত-বৈষ্ণব আবার নিরপেক্ষ সমালোচকও। কেহ কোন পুস্তক রচনা করে আনলে "স্বরূপ পরীক্ষা কৈলে পাছে প্রভু" শ্রবন করতেন। সুতরাং স্বরূপ এবং মহাপ্রভু যে কতটা একাত্ম ছিলেন তা সহজেই অনুমেয়। দাক্ষিণাত্য হ'তে প্রত্যাবর্তনের পর মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ অবস্থার সময় স্বরূপ আহার নিদ্রা ত্যাগ করে ছায়ার মত তাঁর সঙ্গে ঘুরেছেন এবং চোখে চোখে রেখেছেন। সুতরাং মহাপ্রভুর অন্তলীলা সম্পর্কে স্বরূপের মত অভিজ্ঞ এবং প্রামাণিক ব্যক্তি আর দ্বিতীয় নেই। এই স্বরূপ দামোদরই তাঁর গ্রন্থে অন্তলীলার যে ঘটনা সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করেছিলেন তাই ছিল কবিরাজ গোস্বামীর প্রধান অবলম্বন—ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে স্বরূপ দামোদরে বর্ণিত ঘটনাসমুহ বহুমুল্য কোহিনূর—এই ঘটনাপুঞ্জে কোন প্রকারের সন্দেহে-কালিমা লেপন করা চলে না।

মুরারী গুপ্তের কড়চা: চৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীকবিরাজ গোস্বামী আপন গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহের জন্যে মুরারী গুপ্তের নিকট বিশেষ ভাবে ঋণী। মুরারীগুপ্ত ছিলেন নবদ্বীপবাসী এবং মহাপ্রভুর সমসাময়িক। সন্ন্যাস গ্রহণের পুর্ব পর্যন্ত গৌরাঙ্গ-লীলায় প্রায় সকল ঘটনার সাথে তিনি ছিলেন প্রত্যক্ষ পরিচিত—সুতরাং আদি লীলার ঘটনা বর্ণনায় মুরারী গুপ্তের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অবশ্য স্বীকার্য। তাঁর কড়চায় আদি লীলা সম্পর্কে তিনি যে বর্ণনা রেখে গেছেন তার বাস্তবতা সম্বন্ধে তাই কারো কোন সন্দেহ নেই। চৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত

আদিলীলার বহু ঘটনার উৎস-স্থল এই 'কড়চা'—সুতরাং সে সকল ঘটনারও ঐতিহাসিক গুরুত্ব কোন ক্রমে উপেক্ষণীয় নয়।

বৃন্দাবন দাসঃ আপন গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহের জন্যে চৈতন্য চরিতামৃতকার যে সকল ব্যক্তির নিকট বিশেষ রূপে ঋণী তাঁদের মধ্যে বৃন্দাবন দাসের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। বৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্যের আদিলীলা এবং মধ্যলীলা বহু বিস্তৃতভাবে লিখেছেন। কবিরাজ-গোস্বামীর 'চৈতন্য ভাগবতে' যে সকল ঘটনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে সেই ঘটনাগুলি বিস্তৃত ভাবে লিখেছেন এবং যে ঘটনাগুলি বিস্তৃত ভাবে আছে সেগুলির সংক্ষিপ্ত রূপ দান করেছেন। মাঝে মাঝে বৃন্দাবন দাস বর্ণিত ঘটনা সমূহ কবিরাজ গোস্বামী নতুন রূপে বর্ণনা করেছেন। বলাবাহুল্য বৃন্দাবনের অসংখ্য পণ্ডিত গোস্বামীগণের সংস্পর্শে এসে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবন দাস বর্ণিত যে সকল ঘটনাকে ভ্রম বলে মনে করেছিলেন সেই গুলিকেই নতুন রূপে উপস্থাপিত করেছেন। সুতরাং এই নব উপস্থাপিত ঘটনা-সমূহ ঐতিহাসিকতার দিক দিয়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ এবং এগুলি বৃন্দাবন দাসের ভ্রম সংশোধন ছাড়া আর কিছুই নয়। যে সকল ঘটনাকে কবি নতুন রূপে উপস্থাপিত করেছেন সেগুলির মধ্যে প্রধান হলো কাজী দলন, চৈতন্যের পুরী গমন, সার্বভৌম উদ্ধার, প্রতাপ রুদ্রের প্রতি কৃপা ইত্যাদি—কাজী দলন প্রসঙ্গটিকে কৃষ্ণদাস কবিরাজ একেবারে ভেঙ্গে চুরে নতুন রূপ দান করেছেন।

কবি কর্ণপুরের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয় 'নাটক' এবং 'চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য' হ'তেও কবিরাজ গোস্বামী বহুতর ঘটনা গ্রহণ করেছেন। গ্রন্থের এক স্থানে তিনি লিখেছেনঃ

দামোদর স্বরূপের কড়চা অনুসারে।
রামানন্দ মিলন-লীলা করি যেপ্রচারে॥

এই উদ্ধৃতি থেকে মনে হয় কবিরাজ গোস্বামী রামানন্দ মিলন-লীলা স্বরূপ দামোদরের কড়চা-বর্ণিত ঘটনা হতে গ্রহণ করেছেন কিন্তু বিমান

বিহারী মজুমদার স্পষ্টই দেখিয়েছেন যে কবি কর্ণপুরের রচিত গ্রন্থ হ'তে ইংগিত পেয়েই কৃষ্ণদাস কবিরাজ রামানন্দ-চৈতন্য মিলন-লীলা বর্ণনা করেছেন। অবশ্য এই প্রসঙ্গের মূল ঘটনা আন্তরিকতার গুণে যে ঐতিহাসিক রূপলাভ করেছে তা' কবিরাজ গোস্বামীর আপন সংযোজনা। উল্লিখিত গ্রন্থকারের বিবিধ গ্রন্থ হ'তে কবিরাজ গোস্বামী যে আপন গ্রন্থের জন্যে উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন সে বিষয়ে আর কোন প্রমাণ-পরিচয়ের প্রয়োজন নেই। কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃতে এমন অনেক ঘটনা আছে যা' অন্যত্র কোথাও উল্লিখিত হয় নি। এই অনুল্লিখিত ঘটনাগুলির উপর অনৈতিহাসিকতা দোষ আরোপ করা ঠিক হ'বে না—কেননা এগুলি যদিও পূর্বে কোথাও উল্লিখিত হয়নি তথাপি এগুলি অসত্য নয়—এগুলি হলো কবিরাজ গোস্বামীর তীব্র অনুসন্ধিৎসার অমৃতময় ফল!

কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনা হ'তে জানা যায় কুড়ি পঁচিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত তাঁর স্ব-গৃহেই কেটেছে। স্ব-গৃহে থাকাকালীন তিনি মহাপ্রভুর জীবনের অনেক ঘটনা জানতে পেরেছিলেন। তারপর তিনি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর স্বপ্নাদেশে বৃন্দাবনে আগমন করেন। বৃন্দাবনে আগমনের পর হতেই তাঁর সম্মুখে জ্ঞান সমুদ্রের আবরণ উন্মোচিত হয়ে গেল—এখানে এসেই তিঁনি লাভ করলেন শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব, শ্রীরঘুনাথ দাস, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রীগোপাল ভট্ট ইত্যাদি মনীষীগণের মহৎ সঙ্গ। এই মনীষীগণের অনেকেই মহাপ্রভুর জীবনের কোন কোন লীলার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। এঁরা সকলেই বৃন্দাবনে সম্মিলিত ভাবে বসবাস করতেন এবং প্রত্যহ সমবেত ভাবে মহাপ্রভুর জীবনকথা আলোচনা করতেন। কবিরাজ গোস্বামী ছিলেন সেই ভাব-সভার নীরব- শ্রোতা। বৃন্দাবনবাসী নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবগণের প্রতিদিনের আলাপ-আলোচনায় মহাপ্রভুর দিব্যজীবনের বহু অজ্ঞাত ঘটনা প্রকাশিত হয়ে পড়তো। এ ছাড়াও কারো কোন ঘটনা বর্ণনার মধ্যে অতিরঞ্জন বা অমূলক কিছু থাকলে তা' সমবেত শ্রোতামণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতো আর তার সংশোধন হওয়ার সুযোগ ঘটতো। এইভাবে প্রতিদিনের

নিষ্ঠাপূর্ণ আলাপচারণায় সত্যানুসন্ধিৎসু বৈষ্ণবগণের মধ্য হ'তে গৌর-লীলার অন্তর্নিহিত পরীক্ষিত সত্য-স্বরূপটি প্রকাশিত হ'তো। কবিরাজ গোস্বামীর বিশালায়তন গ্রন্থে গৌরাঙ্গবতারের যে মহান চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা' সত্যের কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত এবং পরিমার্জিত বিচক্ষণ বৈষ্ণবগণের সেই খাঁটিরূপ-নির্যাস। সুতরাং কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থের ঐতিহাসিক বিশুদ্ধি শ্রদ্ধা সহকারে স্মরণ-যোগ্য।

তথাপি গ্রন্থের মধ্যে এমন অনেক ঘটনা আছে যেগুলি ঐতিহাসিকতাব দিক দিযে গ্রহণ করতে বিশেষ আপত্তিকর বলেই মনে হয়। এই ধরণেব কয়েকটি ঘটনা আমরা নিম্নে উল্লেখ কবছি ঃ

১॥ কবিকর্ণপুব আপন গ্রন্থে উল্লেখ কবেছেন যে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু তের মাস মাতৃগর্ভে ছিলেন—কৃষ্ণদাসও আপন গ্রন্থে এই তের মাসের কথাই উল্লেখ কবেছেন। পক্ষান্তবে মুবারী গুপ্ত এবং বৃন্দাবন দাস দশ মাসের কথাই উল্লেখ করেছেন এবং এটাই যে স্বাভাবিক সে বিষয়ে কোন সন্দেহেব অবকাশ নেই।

২॥ কবি কর্ণপুব এবং বৃন্দাবন দাস ছ' সাত বছরের শিশু নিমাইয়ের মুখ দিয়ে শুচি-অশুচির তত্ত্বেব উল্লেখ কবিযেছেন। চৈতন্যচবিতামৃতেও দেখি কৃষ্ণদাস কবিবাজ দুগ্ধপোষ্য শিশুব মুখ দিযে সৎ-অসৎবাদ তত্ত্ব প্রচার কবিযেছেন এমন কি গঙ্গাব ঘাটে লক্ষীব সাথে হাস্যপরিহাসের সময় 'বাল্য ভাব ছলে' ভাগবতেব শ্লোক উচ্চারিত করিয়েছেন—"শ্লোক পড়ি তাঁব ভাব অঙ্গীকাব কৈল।" এ ঘটনাগুলি মহামানবের দোহাই দিলেও একটু অস্বাভাবিক মনে হয়।

৩॥ শ্রীচৈতন্যচবিতামৃতে আমরা বহুবাব পেযেছি শ্রীচৈতন্যেব 'গঙ্গা দেখে ভাবাবেশে যমুনা ভ্রম' হয়েছে। বৃন্দাবন দাস আপন কাব্যে কোথাও এই ভ্রমের কথা স্বীকার করেন নি। এবং তিনি এ উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নিকট থেকে। সুতবাং বৃন্দাবন দাসের নিরবতাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়।

৪ ॥ গোপীনাথ মন্দিরে শ্রীচৈতন্যের কোন অলৌকিক কীর্তি-কলাপের কথা বৃন্দাবন দাস বলেন নি কিন্তু কবিরাজ গোস্বামী এই প্রসঙ্গে অলৌকিকতার অবতারণা করেছেন।

৫ ॥ বৃন্দাবন দাস সাক্ষী গোপালের কাহিনী লেখেন নি—কৃষ্ণদাস গোস্বামী এটা গ্রহন করেছেন কবি কর্ণপুরের নাটক হতে। কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনা অনুযায়ী জানা যায় পুরুষোত্তম দেব কাঞ্চিকাবেরী বিজয়কালে সাক্ষী গোপালকে নিয়ে এসে সত্য বেদীতে প্রতিষ্ঠিত করেন।

৬ ॥ আধুনিক সমালোচকের মন্তব্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য যেন ধুলিসাৎ হয়ে গেছে বলে মনে হয় এখানে আমরা উক্তিটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি: "কৃষ্ণদাসের অলৌকিক ঘটনার প্রতি ঝোঁক অত্যন্ত বেশী। তিনি পূর্ববর্তী কোন গ্রন্থ অনুসরণ করিতে করিতে সহসা তাহার আনুগত্য ছাড়িয়া অলৌকিক ঘটনার সন্নিবেশ করিয়াছেন। যথা—আদিলীলায় আম্র ভক্ষণলীলা, মধ্যলীলায় বৌদ্ধ পণ্ডিতের মাথা কাটা যাওয়া ও পুনরুজ্জীবন, কাশী মিত্র ও প্রতাপ রুদ্রকে চতুর্ভুজ মূর্তি বা ঐশ্বর্য্য দেখানো, রথাগ্রে কীর্তন করিতে করিতে এককালে সাতটি সম্প্রদায়ের সম্মুখে উপস্থিত, যে রথ মত্ত হস্তী টানিতে পারিত না তাহা শ্রীচৈতন্য কর্তৃক চালানো, আর্বিভাবরূপে শচীর অন্নখাওয়া, বৃন্দাবনের পথে যাইতে যাইতে ব্যাঘ হরিণকে একসঙ্গে হরিনাম বলান, অন্তলীলায় ভাবাবেশে চৈতন্যের এক একখানি হাত দেড়গজ দীর্ঘ হওয়া, তিন দ্বারে কপাট লাগানো সত্বেও প্রভুর বাহির হইয়া যাওয়া ইত্যাদি।" দিগ্বিজয়ী, পরাভব, প্রকাশানন্দ, উদ্ধাব প্রভৃতি বিষয়ে পণ্ডিতদের সঙ্গে বিচার ও তাঁহাদিগকে পরাভব করার ঐতিহাসিক ভিত্তি নিতান্ত দুর্বল। এইগুলি ছাড়া আদি ও মধ্যলীলায় বর্ণিত ঘটানাসমূহের মধ্যে অতি অল্প অংশই কবিরাজ গোস্বামীর মৌলিক অনুসন্ধানের ফল।

সমালোচকের এই মন্তব্যের একটিও হয় তো অসত্য নয়—কিন্তু চরিতামৃত্যের ঐতিহাসিকতা এইটুকু দিয়েহৈ খণ্ডিত করা বোধ হয় যুক্তিযুক্ত হবে না। পণ্ডিতগণের পরাজয় সম্পর্কে সমালোচক যে কথা বলেছেন তার বিরুদ্ধ প্রমাণে আমরা এখানে সার্বভৌম পরাজয় প্রসঙ্গটি

উত্থাপন করছি। চৈতন্য-ভাগবতকার শ্রীবৃন্দাবনদাস এক দিনেই সার্বভৌম উদ্ধারপর্ব শেষ করেছেন কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই উদ্ধার পর্বটিকে বার দিন দীর্ঘায়িত করেছেন। সার্বভৌমের মত একজন তৎকালীন ভারত-বিখ্যাত পণ্ডিতকে একদিনেই মতান্তরিত করার পিছনে যুক্তি অত্যন্ত দুর্বল—কতকটা অলৌকিক বলেই মনে হয়। কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ সুদীর্ঘ বারদিন সময় নিয়ে ধীরে ধীরে গর্বোদ্ধত সার্বভৌমের উন্নত মস্তককে মহাপ্রভুর চরণতলে লুটিয়ে দিয়েছেন এখানে কৃষ্ণদাস কবিরাজের মৌলিকত্ব অনস্বীকার্য।

এই গ্রন্থের ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় ভূদেব চৌধুরী মন্তব্য করেছেনঃ বাস্তব লীলার বর্ণনায় যিনি ঐতিহাসিকের ন্যায় প্রায় প্রতি ক্ষেত্রে উৎস উদ্ধার (Authority Quote) করেছেন নৈয়ায়িকের মত তর্ক করেছেন বৈদান্তিকের মত করেছেন তত্ত্ব-প্রতিষ্ঠা, ভক্তি-নিষ্ঠ বিশ্বাসে তিনিই অলৌকিক কাহিনীর পর কাহিনীর জাল বুনে গেছেন। এই ভক্তি নিষ্ঠার প্রভাবেই অলৌকিক কাহিনী লৌকিক কাহিনীর সমমর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যুক্তি তথ্য সংবদ্ধ ইতিহাস দর্শন ভক্তি রসোত্তীর্ণ হয়েছে। "চৈতন্য-চরিতামৃত বাংলা ভাষায় লিখিত বাঙালীর ঐতিহাসিক-দার্শনিক চেতনার প্রথম সার্থকপ্রকাশ।" ডাঃ সুকুমার সেনের মন্তব্যও এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য ঃ "চৈতন্য-চরিত হিসাবে কি ঐতিহাসিকতত্ত্ব কি রসজ্ঞতা, কি দার্শনিক তত্ত্ববিচার সব দিক দিয়াই চৈতন্যচরিতামৃত শ্রেষ্ঠ।"

বস্তুতঃ গ্রন্থের মধ্যে কিছু কিছু অলৌকিকতা থাকলেও ঐতিহাসিকতার কিছু অপলাপ লক্ষ্য করা গেলেও যে মহান সত্যানুসন্ধিৎসু এবং সত্যনিষ্ঠা এই গ্রন্থ রচনার অন্তরালে বেগ সঞ্চার করেছে তাকে তো অস্বীকার করা যায় না কোন মতেই। এবং এই সত্যনিষ্ঠার জন্যেই সকল ত্রুটি সত্ত্বেও গ্রন্থখানি ঐতিহাসিক ভিত্তিতে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যর জীবন—বেদ হয়ে উঠেছে।

॥ চার ॥

॥ চৈতন্য-রামানন্দ আলোচনা এবং কান্তাপ্রেম বা রাগানুভক্তি ॥

বিপুল-বিস্তারী চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদ শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাপ্রভু এবং রায়রামানন্দের আলাপচারণার মাধ্যমে বৈষ্ণবীয় সাধন-তত্ত্বে উজ্জ্বল বা মধুর রসের শ্রেষ্ঠত্ব অভিনব রূপে প্রতিপন্ন করেছেন। ভারতীয় সাধন-তত্ত্বে ভাগবত সাধনার তিনটি পথ—জ্ঞান, কর্ম এবং ভক্তির পথ। জ্ঞানের পথে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্বরাশি বিদীর্ণ করে শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠা করেছেন অদ্বৈতবাদের। অদ্বৈতবাদেব মূল হলো জীব এবং ভগবানের মধ্যে কোন পার্থক নেই। জীব এবং ভগবান এক এবং অভিন্ন। 'সোহহং' অর্থাৎ আমিই সেই। বলাবাহুল্য জ্ঞানের পথ হলো বিচাব বিশ্লেষণেব পথ। গীতা হলো কর্ম-পথের নির্দেশিকা। কর্মমার্গের সকল তত্ত্বকথাই গীতায় ব্যাখ্যাত হয়েছে। গীতার ধর্ম নিষ্কাম ধর্ম—অর্থাৎ কোন কিছু আমাব নয়—সব সেই বিশ্ব-নিয়ন্তার।' তিনি করান আমরা করি—কর্ম আমাদের করণীয় কিন্তু ফললাভে আকাঙ্খিত নই। কর্মের সকল ফল শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করাই হলো গীতার নিষ্কাম ধর্ম। কিন্তু বৈষ্ণব সাধকেরা এই জ্ঞান বা কর্মের কোন সাধন-পথে পদচারণা করেন নি—তাঁদের যাত্রা ভক্তির পথে, তাঁরা প্রেমের পথে প্রেমোন্মত্ত পাগল পথিক। প্রেমের অভিনব রহস্যময় আলোকে আপন হৃদয়মূলে তাঁরা পেতে চেয়েছেন ভগবানের লীলা-স্পর্শ। জ্ঞান বা কর্ম দিয়ে ভগবানকে পাওয়া গেলেও সে পাওয়ার মধ্যে 'পরম পাওয়া'র ভাব নেই। প্রেমের পেলব-মসৃণ পথে পদচারণা করে এই 'পরম-পাওয়া' হলো বৈষ্ণব সাধকের লক্ষ্য। রায়রামানন্দের সাথে 'মহাপ্রভুর কথোপকথনের মাঝে মাধুর্যরসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এই পাওয়ার কথা নতুন আলোকে ঝলকিত হয়ে উঠেছে।)

রায় রামানন্দের নিকট কৃষ্ণ প্রাপ্তির জন্যে মহাপ্রভুর সাধ্যের সাধনতত্ত্ব জানতে চান ঃ 'প্রভু কহে পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।' উত্তরে রামানন্দ জানান যে স্বধর্মাচারণের মাধ্যমেই বিষ্ণুভক্তি হয়। কিন্তু মহাপ্রভু 'এহ বাহ্য' বলে রামানন্দের এই মন্তব্যে কোন গুরুত্ব দান করেন নি। এর পরেই রামানন্দ গীতার কর্মবাদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। কিন্তু এই কর্মবাদের মধ্যেও ভগবানের সাথে ভক্তের আন্তরিক ভক্তির সম্পর্ক স্থাপিত হয় না বলেই ঃ

প্রভু বলে এ বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে স্বধর্মত্যাগ ভক্তিসাধ্য সার॥

এই ভাবে মহাপ্রভু কর্তৃক পর পর স্বধর্মত্যাগ, জ্ঞানমিশ্র ভক্তি উপেক্ষিত হওয়ার পর যখন রায় জ্ঞানশূন্য ভক্তির কথা উল্লেখ করেন তখন মহাপ্রভু 'এহ বাহ্য' বলে উড়িয়ে না দিয়ে 'এহ হয়' ব'লে এই ভক্তির উপর কিঞ্চিৎ গুরুত্ব আরোপ করেন। কেননা জ্ঞানশূন্য ভক্তি শ্রদ্ধাভক্তিরই অন্তর্গত। এরপর রামানন্দ শান্ত, দাস্য প্রভৃতি ভক্তির কথা উল্লেখ করে সখ্য এবং বাৎসল্য প্রেমের কথা উত্থাপন করেন তখন মহাপ্রভু 'এহোত্তম' বলে সখ্য এবং বাৎসল্য প্রেম ভজনায় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। কিন্তু 'আগে কহ আর কথাটি এখনো মহাপ্রভুর মুখনিসৃত বাণী হয়ে রয়েছে। অবশেষে যখন রামানন্দ কান্তা প্রেমের কথা উল্লেখ করেন তখন মহাপ্রভুর বদন হতে এই বাণীটিও অবলুপ্ত হয়—অর্থাৎ কান্তাপ্রেমই হলো 'সর্বসাধ্য সার' কৃষ্ণপ্রাপ্তির শেষতম উপায়। এখন আমাদের বিচার করে দেখতে হবে এই কান্তাপ্রেম কেমন ভাবে এবং কেন সকল প্রেম হতে শ্রেষ্ঠ।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি বৈষ্ণব সাধকেরা জ্ঞান এবং কর্মের পথে পদচারণা করেন নি—অদ্বয় তত্ত্বও তাই বৈষ্ণব সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি অদ্বয়-তত্ত্বের অন্তর্নিহিত মর্ম-বাণী হলো জীব এবং ভগবান এক—উভয়ের মধ্যে কোন ভেদ নেই কিন্তু বৈষ্ণব সাধকের মতে "জ্ঞাত ও জ্ঞেয়ের মধ্যে, ভোক্তা ও ভোগ্যের মধ্যে সর্বদাই একটা প্রচ্ছন্ন ভেদাভেদ

সম্বন্ধ বর্তমান থাকে। জ্ঞেয় বস্তু যতক্ষণ জ্ঞাতার সঙ্গে এক না হয় ততক্ষণ জ্ঞান পূর্ণ হয় না, আবার বিভিন্ন না হ'লেও জ্ঞান সম্ভব হয় না।" ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে কিছু ব্যবধান না থাক্‌লে মিলন কখনো সর্বসুখের হতে পারে না। পৃথক সত্ত্বার সাথে মিলিত হয়ে যে এক যুগল অদ্বয় মধুর মূর্তি গড়ে ওঠে—প্রেমের উল্লাস, মিলনের পরিপূর্ণতা তো সেখানেই। কিন্তু অদ্বয়বাদীরা ভক্ত ও ভগবানকে এক করে এই মহান মিলনের পথ রুদ্ধ করেছেন। বৈষ্ণব-সাধকেরা এখানেই জ্ঞানমার্গের অদ্বয়তত্ত্ব হ'তে সরে এসে ভিন্ন পথে পদচারণা করে কল্পনা করেছেন অচিন্ত্য-ভেদাভেদের—অর্থাৎ ভক্ত ও ভগবান এক নয় আবার এক, ভিন্ন নয় আবার ভিন্ন। জ্ঞান ও কর্মের সাধনায় কোন আবেগ নেই, কোন অন্তর্গূঢ় আকর্ষণও ভিতর হ'তে তীব্র হয়ে ওঠে না—কিন্তু বৈষ্ণব-সাধকগণ যে প্রেমের পথে পদচারণা করেছেন সেই প্রেম-সাধনার মধ্যে আছে এক দুর্বার মিলনাকাঙ্খা আছে এক অসীম প্রণয়াবেগ। অজানিতে সমগ্র মন-প্রাণ এক অন্তহীন বিপুল আকর্ষণে উদ্বেল হয়ে ওঠে। এক অজানা রহস্যময় আকুল আবেদনই এই প্রেম সাধনার ধারাটিকে রোমাঞ্চ রঙীন করে তোলে। এবং এই পথের চরম সীমায় যে কৃষ্ণপ্রাপ্তি তা' সেই মধুরতম মিলন। লৌকিক প্রেমের বসে যখন 'প্রভুর জন্য দাস আপনার প্রাণ দেয়, বন্ধু আপনার স্বার্থ বিসর্জন করে, প্রিয়তম ও প্রিয়তমা পরস্পরের নিকট আপনার সমস্ত আত্মাকে সমর্পণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া ওঠে" তখন এই লৌকিক প্রেমের বুকেই সীমাতিক্রমীলোকাতীত এক বিপুল স্বর্গীয় ঐশ্বর্য ধ্বনিত হয়ে ওঠে। প্রেমের চরম সার্থকতা তো এখানেই।

বৈষ্ণব সাধকেরা প্রেম-সাধনায় ক্রম-পরিণতির স্তরে প্রেমকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেছেন—শান্ত, দাস্য' সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর।

শান্ত প্রেমের উপাসনায় কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় এবং এ প্রেমে ঐকান্তিক নিষ্ঠাও আছে—কিন্তু এ প্রেম হলো মমতাগন্ধহীন—ঐশ্বর্য শিথিল। সর্বান্তকরণে কৃষ্ণকে আপনার ভাবা কিংবা কৃষ্ণ-বিরহে আপনার বক্ষে

হাহাকার ধ্বনির তীব্রবেগ অনুভব করা এসব কোন কিছুই শান্ত রতিতে নেই।

দাস্য প্রেমে শান্তের ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে সম্মিলিত হয় মমতাবুদ্ধি বা সেবা। নিজেকে দাস ভেবে কৃষ্ণের সেবা করাই হলো দাস্য প্রেমের মুখ্য উদ্দেশ্য। কৃষ্ণ প্রভু আমি দাস, সুতরাং দাস্য প্রেমে আছে ভগবান ভক্তের প্রভু দাসের সম্পর্ক। শান্ত রতিতে কেবল ঐকান্তিক নিষ্ঠায় পর্যবসিত—কিন্তু দাস্যে শান্তের ঐকান্তিকী নিষ্ঠার সাথে ঐকান্তিকী সেবা মিলিত হওয়া শান্ত রতি অপেক্ষা দাস্য রতি উচ্চতর। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় এই শান্ত দাস্য এই উভয় প্রেমই ঐশ্বর্য-শিথিল। ভগবান বলেন 'ঐশ্বর্য শিথিল প্রেমে নহে মোর প্রীতি'। শান্ত এবং দাস্য রতি গাঢ় হয়ে প্রেমে পরিণতি লাভ করতে পারে কিন্তু ক্রমবর্দ্ধমান প্রেমের বিভিন্ন স্তরে যে স্নেহ, মান, প্রণয়' অনুরাগ, ভাব এবং মহাভাবের সৃষ্টি হয়—শান্ত এবং দাস্য রতিতে প্রেমের সেই উন্নততর অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব নয়।

দাস্যে নিজকে দাস ভেবে সর্বদা প্রভু অপেক্ষা নিজেকে ছোট করে রাখা হয়—কিন্তু সখ্য প্রেমে ভক্ত এবং ভগবান সমান। সেখানে উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। শ্রীকৃষ্ণ ও সুবলের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না—পণ রেখে খেলায় সুবল হেরে গেলে কৃষ্ণকে আপনার স্কন্ধে বহন করে নির্দিষ্ট পথ অতিক্রম করেছেন আবার কৃষ্ণ হেরে গেলে আপনার স্কন্ধে সুবলকে নিয়ে অনুরূপে নির্দিষ্ট পথ অতিক্রম করে পণ রক্ষা করেছেন। সুবলের পদযুগলের স্পর্শ হয়তো শ্রীকৃষ্ণের বক্ষে লেগেছে কিন্তু তাতে কোন ক্ষতি নেই—এখানে যে সুবল কৃষ্ণ সমান, ভক্ত-ভগবান অভিন্ন। তাই এই প্রেমকে তো আর 'এহ হয়' বলে বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে উপেক্ষা করা যায় না—মহাপ্রভুর মুখে তাই তো এ প্রেম 'এহোত্তম' হয়ে উঠেছে। এ প্রেম শান্ত এবং দাস্য থেকে উন্নত কেন না শান্তের ঐকান্তিকী নিষ্ঠা এবং দাস্যের সেবার সাথে মিলিত হয়েছে সখ্যের সংকোচহীনতা। দাসপ্রভুর মধ্যেকার সম্বন্ধ দূরে সরিয়ে ভগবান ভক্তের নিকট এক সমভূমিতে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাইতে শুনি সখ্য রতিতে ভগবানের বশ্যতা স্বীকারের ঘোষণা :

মমতা অধিক কৃষ্ণে আত্মসম জ্ঞান।
অতএব সখ্য রসে বশ ভগবান॥

বাৎসল্য প্রেম সখ্য প্রেম অপেক্ষা অধিকতর উচ্চস্তরের। এখানে আর ভক্ত ভগবান সমান নয়—ভগবানকে নিচে ফেলে ভক্ত উচ্চাসনে আসীন হয়েছেন। বাৎসল্য রতিতে প্রেমের আধিক্য হেতু মমতার সাথে এসেছে তাড়ন এবং ভৎর্সনা-জ্ঞান।
ভক্ত এখানে পালক ভগবান পাল্য—সুতরাং তাড়ন ভৎর্সন বিচিত্র নয়। বাৎসল্যে শান্ত, সখ্য দাস্য এবং বাৎসল্য এই চার রসের মিলন হওযায় 'চারি রসের গুণে বাৎসল্য অমৃত সমান' হয়ে উঠেছে।
কিন্তু বাৎসল্য প্রেমও প্রেমসাধনায় প্রান্ত-সীমা স্পর্শ করতে পারে না। বাৎসল্য রতি বর্ধিত হ'য়ে রাগ পর্যন্ত উঠ্তে পারে কিন্তু প্রেমের শ্রেষ্ঠতম বিকাশ-ক্ষেত্র ভাব এবং মহাভাব পর্যন্ত ওঠার সামর্থ এ প্রেমের নেই। কেবলমাত্র কান্তাপ্রেমের পথ বেয়েই প্রেমের শেষতম পর্যায় সমানভাবে ওঠা সম্ভব কান্তাপ্রেম তাই 'সর্বোত্তম' বা 'সর্বসাধ্য সার।' কান্তা-প্রেমের অসীমলোকে আপনার সকল ভেদাভেদ দূরীভূত হয়—বেদধর্ম, লোকধর্ম, কুলধর্ম, দেহ, গেহ, স্বজন সকল কিছুই ত্যাজ্য হয়ে কৃষ্ণপ্রাপ্তি পরম আকাঙ্খার হয়ে ওঠে। কান্তা প্রেমে শান্তের ঐকান্তিকী নিষ্ঠা, দাস্যের সেবা, সখ্যের সংকোচ-হীনতা, বাৎসল্যের লালন পালন সকলই আছে উপরন্তু আছে এক দুর্লভ আত্মদান- যা' আর কোন রতিতে নেই। আপনার কান্তি দিয়ে অর্থাৎ অঙ্গ দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের সেবা একমাত্র কান্তাপ্রেমেই বর্তমান এখানে ভক্ত ও ভগবান চরম আকর্ষণে পরম পুলকে, 'বিপুল নীড়ে' মিলিত হন—এ মিলন জ্ঞান কর্মের তার্কিক-তাত্ত্বিকতার কষ্টসাধ্য মিলন নয়,—এ মিলন হৃদয়াবেগের রসলোকে। তাই তো

পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হৈত।"

এ পথ সাধন-ভজনের নয়, এ পথ কষ্ট-সাধ্য নয়,—ভক্তের অঙ্গ-কান্তিতে ভগবান আপনি এসে সম্মিলিত হ'তে বাধ্য :

আপনাকে বড় মানে আমাকে সমহীন
সর্বভাবে হই আমি তাহার অধীন ॥

'কিন্তু ভক্ত যখন ভগবানকে বড় মনে করেন :

আমাকে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন ॥

কান্তাপ্রেমের চরম প্রাপ্তি মহাভাব রাধা হলেন সেই মহাভাবরূপা। এই মহাভাব আর অন্য কারো পক্ষে প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব নয়। 'রাধাভাবের' সাধনাই কৃষ্ণপ্রাপ্তির চরম উপায়। রাধাকৃষ্ণ সেবার মানস হতেই রাধার ভাবের জন্ম। সখীগণও আপনার অঙ্গ দিয়ে কৃষ্ণ পরিতুষ্টি করেছেন— তাঁরাও কান্তা প্রেমের অভিসারিকা। বাংলার বৈষ্ণব-কবিগণ যুগযুগান্তর ধরে কান্তাপ্রেমের অভিসারিকা হয়ে ছুটে চলেছেন অনন্তের পথে আপনার মানস-বৃন্দাবনে তাঁরা সখিত্বের শঙ্কিত আবেদন নিয়ে নিয়োজিত হয়েছেন কৃষ্ণ-লীলা আস্বাদনে। ভক্তের আকুল আহ্বানে ভগবানও মিলনোন্মুখ। কান্তাপ্রেমের মাধুর্য আস্বাদনের জন্যে ভগবান কাঙালের মত ছুটেএসেছেন বৈকুণ্ঠধাম ছেড়ে মর্তের ধুলি-মালিন্যের মাঝে, গৌরাঙ্গবতারের মূল প্রয়োজন তো এই কান্তা প্রেমের সুকোমল মহিমাময় আস্বাদন। এই কান্তাপ্রেম বা রাগানুগা ভক্তির বৈষ্ণব ধর্মকে মহিমাময়, রসায়িত এবং চিরন্তন করে তুলেছেন। কান্তাপ্রেম বা রাগানুগা ভক্তির সাধনায় শ্রীরাধা অদ্বিতীয় আর গৌরাঙ্গ হলেন এই প্রেম-সাধনার বিশাল সাম্রাজ্যে অতৃতীয়।

পাঁচ

ক ॥ দর্শন, কাব্য এবং চরিত গ্রন্থ হিসাবে চরিতামৃত : চরিতাংশ অপেক্ষা অমৃতাংশের প্রাধান্য ॥

বিশালায়তন চৈতন্য চরিতামৃতকে নিয়ে ভিন্ন মহলে অসংখ্য মতবাদ গড়ে উঠেছে। তথ্য জিজ্ঞাসু পাঠকেরা চৈতন্যচরিত গ্রন্থ হিসেবে চৈতন্যচরিতামৃতকে উচ্চাসন দান করেছেন, তত্ত্বপিপাসু পাঠকের নিকট গ্রন্থখানির দার্শনিক মূল্য অসীম আবার রসলিপ্সু পাঠকেরা গ্রন্থের মর্মমূলে কাব্যের অভিনব স্পন্দনে চমৎকৃত হয়েছেন। গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন আমাকে যে যেভাবে উপাসনা করে সে সেই-ভাবে পায়। আমরাও বলি চৈতন্যচরিতামৃত এমনি একখানি গ্রন্থ একে যিনি যে দৃষ্টিতে দেখেন সেইভাবে উপভোগ করতে পারেন।

চৈতন্যচরিতামৃত যেন জীবনী দর্শন এবং কাব্যের মূলধনে গঠিত যৌথ-শিল্প। এককভাবে চরিতামৃত কারো খাস দখলে নেই—চরিতামৃত—সর্ব সাধারণের। কিন্তু বিরূপ মন্তব্যও বিরল নয়। এ প্রসঙ্গে বাংলার একটি বহুল প্রচলিত প্রবাদের কথা মনে পড়েছে: 'সাজার মা গঙ্গা পায় না'—অর্থাৎ যে জিনিষটি সর্ব-সাধারণের হয়ে ওঠে সেটি পরিপূর্ণরূপে কাকেও তৃপ্তি দিতে পারে না। ফলে তার সকল আবেদন ব্যর্থ হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে কেউ বলেছেন চরিতামৃত খাঁটি জীবনী-গ্রন্থ হ'তে পারেনি, পূর্ণতত্ত্ব-গ্রন্থও নয়, কাব্য তো নয়-ই। আবার কেউ কেউ গ্রন্থে সন্নিবেশিত তত্ত্ব-প্রচারের বহুল-প্রয়াস লক্ষ্য করে—চরিতাংশ অপেক্ষা অমৃতাংশের গুরুভারে গ্রন্থখানি পীড়িত—এরূপ মন্তব্যও করেছেন। এখন এই আপাতবিরোধী অসংখ্য বিরূপ-মতবাদের কঠিন-ব্যূহ-বিদীর্ণ করে সত্য-স্বরূপ আমাদের উদ্ধার করতে হবে।

চরিতাংশ : এই বিশালায়তন গ্রন্থের রচয়িতা শ্রীকবিরাজ গোস্বামী যে একজন বহুশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি সে বিষয়ে কাহার দ্বিমত নেই।

বস্তুতঃ কবিরাজ গোস্বামীর দৃষ্টি ছিল তত্ত্ব পিপাসুর আর তথ্য-লিপ্সু, হলো ঐতিহাসিকের। গ্রন্থের ঐতিহাসিকতা বিচারে আমরা কবিরাজ গোস্বামীর তথ্য-পিপাসু দৃষ্টির সম্যক পরিচয় লাভ করেছি। ভাবাবেগে তিনি গ্রন্থের মধ্যে বাষ্পময় অংশেব প্রবেশাধিকারের ছাড়পত্র দেননি—বৃন্দাবনের অসংখ্য নিষ্ঠাবান ভক্ত-বৈষ্ণব গোস্বামীগণের সদাজাগ্রত দৃষ্টিতে পবীক্ষিত খ্ঁাটি সত্যের মর্ম-নি৷াসেই তিনি আপনার গ্রন্থখানিকে সুরভিত করেছেন।

জীবনী গ্রন্থের প্রধান লক্ষণ হলো জীবনের প্রবহমান ঘটনাপুঞ্জের সার-সংকলন। এই দৃষ্টি ভংগীতেও চৈতন্য-চরিতামৃত উৎকৃষ্ট জীবনী-গ্রন্থ। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর জীবন-লীলাকে কেন্দ্র করে অসংখ্য চবিত-গ্রন্থই রচিত হয়েছে কিন্তু বলতে বাধা নেই একটি গ্রন্থও জীবনী-গ্রন্থ হিসেবে পূর্ণাঙ্গ নয়। চৈতন্য চরিতামৃতের পূ৻ে মহাপ্রভুর বাহিরঙ্গ জীবনের অসীম ঘঠনা প্রবাহকে একত্রিত করে কোন সুসংবদ্ধ পুস্তক লিখিত বা সংকলিত হয়নি—পূর্বসুবীগণের প্রতিটি পুস্তক ছিল অসম্পূর্ণ। মুবারিগুপ্তের কড়চা, রঘুনাথ দাস-গোস্বামীর স্তবাবলী, রূপগোস্বামীর স্তবমালা, কবিকর্ণপুরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য, বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত ইত্যাদি অসংখ্য গ্রন্থের একটিও মহাপ্রভুর দিব্য জীবনের পূর্ণ চিত্রণ নয়—প্রতিটি গ্রন্থই অখণ্ড জীবন-লীলার খণ্ডরূপ মাত্র। কবিবাজ গোস্বামী এই সমস্ত গ্রন্থ হতে অসংখ্য উপাদান সংগ্রহ কবেছেন। সুতবাং এ সকল গ্রন্থে যা আছে চরিতামৃতে তো তা আছেই উপরন্তু তিনি আপন গ্রন্থে মহাপ্রভুব জীবনের এমন অনেক ঘটনা সংযোজনা কবেছেন যা অন্য কোন গ্রন্থে নেই। ঘটনা প্রবাহের ভিতর দিয়ে সমগ্র চৈতন্য-জীবনের স্বরূপটি একমাত্র আমরা চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যেই দেখ্‌তে পাই। মহাপ্রভুর বাল্যলীলার বিবাহ, সন্ন্যাস, তীর্থ পর্যটন, নীলাচলে স্থিতি নিখিল ভারতে প্রেম ধর্মের প্রচার এবং সর্বোপরি শেষ জীবনের দিব্যোন্মাদ অবস্থা প্রভৃতি অসংখ্য ঘটনার ভিতর দিয়ে মহাপ্রভুর সমগ্র জীবনটি যেন অনবদ্য হয়ে উঠেছে। তথ্য-

সংগ্রহ হিসেবে চরিতামৃতের অনন্যসাধারণ বিশিষ্টতা কোন দিনই ক্ষুণ্ন হবার নয়॥

তত্ত্বাংশঃ চৈতন্যচরিতামৃতকে জীবনী বা রচিত কাব্য বলার বিপক্ষে সর্বপেক্ষা বড় যুক্তি হলো অলৌকিকতা এবং তত্ত্ব প্রচার। গ্রন্থের প্রায় সর্বত্রই তত্ত্বের এমন বহুল প্রচার হয়েছে যে গ্রন্থখানিকে জীবনী-কাব্য বল্‌তে আমাদের মন যেন কোন মতেই সায় দেয় না। বাস্তবিক পক্ষে জীবনীর মধ্যে যদি তত্ত্বের বাহুল্য এসে পড়ে জীবনী হিসেবে তার মূল্য অনেকখানি ন্যূন হয়ে পড়ে। কিন্তু তত্ত্বের এই বাহুল্যে শ্রীচৈতন্যেব জীবন-মহিমা ম্লান হয়ে গেছে যদি এমন মনে করি তাহলে বোধহয় আমাদের ভুল করা হবে। কেননা ধর্মোন্মাদ মহাপুরুষদের জীবনই তাঁদের বাণী। জীবন ও বাণী পৃথক নয়—এক এবং অভিন্ন। সাধারণ লোকের ক্ষেত্রে জীবন এবং বাণী তেল-জলের মত পৃথক —একত্রে অবস্থান করেও তাদের পৃথক সত্তা বিঘোষিত হয কিন্তু মহামানবদেব ক্ষেত্রে জীবন এবং বাণী দুধ জলের মত অবিচ্ছেদ্য—সেখানে জীবন এবং বাণী তথ্য এবং তত্ত্ব একাত্মারূপে অনন্যসুন্দব হয়ে ওঠে। যীশু-খৃষ্টেব জীবন ও বাণীতে পার্থক্য বচনা কববে কে? হজরত মহম্মদেব বাণী ও কর্মকে পৃথকরূপে চিন্তা কবার শক্তি আমাদের নেই। শ্রীমনমহাপ্রভুর জীবন এবং বাণীও তাই অবিচ্ছেদ্য—তথ্য এবং তত্ত্ব এক। তত্ত্বেব মধ্যেই তথ্যের উজ্জ্বল প্রকাশ। সেইজন্য জীবন-বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে নিয়তিব মত অনিবার্য রূপে তত্ত্ব-রূপ আত্মপ্রকাশ কবেছে। বৈষ্ণবধর্মেব পরিপো-ষক অসংখ্য শ্লোক কবিরাজ আপন গ্রন্থ মধ্যে উদ্ধৃত করেছেন। রাধা-কৃষ্ণকে অবলম্বন করে যে বৈষ্ণবীয় প্রেম-ধর্মের উদ্ভব সেই রাধা-কৃষ্ণতত্ত্ব-কবিরাজগোস্বামী অনবদ্যরূপে ফুটিয়ে তুলেছেন। গৌরাঙ্গ অবতারের মূল তত্ত্বটি তিনি এমনভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যে সেখানে তত্ত্ব-পিপাসুদের চঞ্চল মনের চাঞ্চল্য স্তম্ভিত হয়ে যায় সেই অভিনব তত্ত্ব-ব্যাখ্যার অনন্ত রসাস্বাদন করে তাঁরা নীরব হয়ে পড়েন। বৈদান্তিকের মত খণ্ডনের সময় সার্বভৌমের সাথে মহাপ্রভুর কথাবার্তায় প্রেম-ধর্মের যে অনন্য সুন্দর তত্ত্ব রূপটি ফুটে উঠেছে সেখানে সাধারণ পাঠক পর্যন্তও বিস্ময়ে

নির্বাক হয়। কান্তা-প্রেম তত্ত্ব, রূপ সনাতনের শিক্ষাদানের সময় সে সকল অন্তর্গূঢ় তত্ত্বকথা প্রকাশিত হয়েছে সে সকল একাধারে যেন গৌরাঙ্গ জীবন মহিমাকে সুন্দর করেছে তেমনি আলোড়ন-স্পন্দনে উদ্বেলিত করেছে তত্ত্ব-লিপ্সু পাঠক চিত্তকে। সুতরাং এই তত্ত্ব প্রকাশ জীবন মহিমাকে তো ক্ষুণ্ণ করেই নি বরং গৌরাঙ্গ প্রভুর অপরিসীম জ্ঞানভাণ্ডাব উন্মুক্ত কবে দিয়ে তাঁর মহান স্বরূপটি আমাদের সম্মুখে তুলে ধরেছে। অবশ্য মাঝে মাঝে তত্ত্বের দুরূহ চাপে এবং দীর্ঘায়িত ব্যাখ্যায় জীবন-চিত্রেব সাবলীল রেখাঙ্কন যেন দীর্ঘ সময় স্তব্ধ হয়ে থাকে তত্ত্বালোচনার মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান জীবন প্রবাহ যেন রুদ্ধ হয়ে যায়। অবশ্য এদিক দিযে বিচাব করলে অর্থাৎ জীবনী এবং তত্ত্বকে পৃথক ভাবে দেখলে চরিতাংশ অপেক্ষা অমৃতাংশের প্রাধান্যই সূচিত হবে। বিশালায়তান চরিতামৃতের প্রায দুই তৃতীয়াংশই তত্ত্ব-ব্যাখ্যা।

কাব্যাংশ ঃ কবিরাজ গোস্বামী যে কত বড় প্রতিভাবান কবি ছিলেন চৈতন্যচরিতামৃতই তার একমাত্র প্রমাণ। এরমধ্যে তিনি বহুবিধ তথ্য এবং তত্ত্বেব আলোচনা করেছেন কিন্তু একটু লক্ষ্য কবলেই বোঝা যাবে সকল তথ্য ও তত্ত্বকথার—উপরে আছে চৈতন্যচরিতামৃতকারের সদাজাগ্রত মহান কবি-প্রতিভা। "প্রেম যে পুরুষার্থ শিরোমণি নরলীলাই যে শ্রেষ্ঠলীলা কৃষ্ণেন্দ্রিয প্রীতি ইচ্ছা যে কাম নয়—প্রেম, আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-বাঞ্ছাই যে কাম, রাগানুগা অহৈতুকী ভক্তিই যে সাধক-জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য জ্ঞানের চেয়ে প্রেমই যে ঢের বড়, কেবল রতি যে ঐশ্বর্যহীন ভক্তি-স্পৃহার মত মুক্তি-স্পৃহাও যে বর্জনীয়" ইত্যাদি অসংখ্য জটিল তত্ত্বের মধ্য হতে কাব্য প্রতিভার ঐন্দ্রজালিক-স্পর্শে তিনি সকল জটিলতাকে দূরে সরিয়ে সাবলীল ও সহজ করে তুলেছেন। এই দুরূহ তত্ত্বকথাকে তিনি সজীব-প্রায় করে গণচিত্তের কাছে আবেদনশীল করে তুলেছেন উপমা-অলংকারের অভিনব প্রয়োগে! কাব্যের রস নিষ্পত্তির ব্যাপারে এই উপমা অলংকারের প্রয়োগ মন্ত্রের মত কাজ করেছে ভক্ত ও ভগবানের সম্বন্ধের প্রকাশে কবিরাজ-গোস্বামী বলেছেন ঃ

মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে কভু নাহি ভেদ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥

ভক্ত ও ভগবানের মধ্যকার সম্বন্ধ এত অল্প কথায় অথচ এত সুন্দরভাবে আর কে বলেছেন? মৃগনাভি এবং তার গন্ধ, অগ্নি এবং তার দাহিকা শক্তি এই দুই উপমার ভিতর দিয়ে ভক্ত ভগবানের সম্বন্ধটি অনবদ্য হয়ে উঠেছে।

সাংকেতিক ভাষণ এই কাব্যেব এক বিশিষ্ট সম্পদ। একটু মাত্র আভাস, একটুমাত্র ইংগিত দিয়েই কবি অখণ্ড ধ্যান-চিন্তাকে প্রকাশ করেছেন। কাম এবং প্রেমের চিরন্তন পার্থক্যটিকে বোধহয় কৃষ্ণদাসের মত সংকেত তীর্যক ভাষণে আর কেউ প্রকাশ করতে পারেননি:

আত্মেন্দ্রীয় প্রীতি বাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥

কাব্যের বহুস্থানেই এমন সাংকেতিক অর্থ-গূঢ় ভাষণ অনবদ্য হয়ে উঠেছে। কাব্যের প্রাণ যে ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা তা একাব্যে বিরল নয়—ব্যঞ্জন গর্ভ অভিনব প্রকাশ এ কাব্যের আপাতঃ-রূঢ় অঙ্গকে লাবণ্য দীপ্ত করে তুলেছে। মহাভাবস্বরূপা রাধা ঠাকুরাণীর অভিনব চিত্র বাস্তবে অঙ্কিত করা কখনো সম্ভব নয়—সে তো এই ব্যঞ্জন-দীপ্ত রেখাঙ্কনে সীমিত। মহাপ্রভুর বাল্য লীলাঙ্কনে কবিরাজ গোস্বামী উচ্চস্তরের কবি-প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। ভাগীরথীর তীরে দুরন্ত নিমাই বালিকাদের পূজাতে বাধা দিয়ে নিজেই পূজাগ্রহণে উৎসুক হয়ে উঠেছেন আর বালিকাদের কাকেও বর দিয়েছেন—'তোমা সবার ভর্তা হবে পরম সুন্দর' বা

যদি মোরে নৈবেদ্য না দেহ হইয়া কৃপানী।
বুড়ো ভর্ত্তা হবে আর চারি চারি, সতিনী।

এ ক্ষেত্রে চপল দুষ্টু বালকটিকে যেন আমরা প্রত্যক্ষ দেখি। মহাপ্রভুর ভাব-বিহ্বল চিত্রাঙ্কনে ও কবিরাজ গোস্বামী কাব্যোৎকর্ষের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর বৃন্দাবন দর্শনের চিত্রটিও কাব্যে রসোত্তীর্ণ হয়ে উঠেছে। প্রকৃতি-বর্ণনাতে প্রকাশ পেয়েছে কবিবাজ গোস্বামীর সৌন্দর্য -বোধ। বৃন্দাবন যাত্রার পথে গহন-গভীর অরণ্যের মধ্যে বনচারী পশুপাখীকে কবি আপনার চমৎকাব বাক ভংগীর দ্বারা অভিনব রূপ দানকরেছেন।

পযাব এবং ত্রিপদিতে চৈতন্যচরিতামৃতেব বিশাল বপু পূর্ণ। পয়ার অংশে উচ্ছাস একেবাবেই নেই—যখন তাঁব গহন মনে কোন আবেগের সঞ্চাব হযেছে তখনই তিনি ত্রিপদীব আশ্রয গ্রহণ কবেছেন। তাই সাধারণতঃ ত্রিপদী-অংশই কাব্যগুণে সবল, সজীব এবং প্রাণবন্ত ঃ

কৃষ্ণপ্রেম সুনির্মল যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল
সেই প্রেমা অমৃতের সিন্ধু
নির্ম্মল সে অনুরাগে না লুকায অন্য দাগে
শুক্লবস্ত্রে যৈছে মসীবিন্দু।

বসনিষ্পত্তিব ব্যাপারে এ সকল অংশ যেন যাদুকরের মোহন মন্ত্রোচ্চাবণ। তাই তো সমালোচকের কণ্ঠে "শুনি ঃ তত্ত্বালোচনার দুস্তর সাগবে কৃষ্ণদাস করিবাজ যে কিরূপ অবলীলাক্রমে পয়াব-ত্রিপদীর পাড়ী জমাইযাছেন তাহা চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ না করিলে অনুমান করিতে পাবা যায না। যথাসম্ভব সংক্ষেপে অথচ কবিত্বেব সহিত তথ্য ও তত্ত্ব ব্যাখ্যান কার্যে কৃষ্ণদাসের সফলতা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে কীর্তিরূপে চিবকাল বিরাজ কবিবে।"

অবশ্য সুবিপুল কাব্যের কোথাও যে দুর্বলতা নেই তা নয়—অন্ত্যানুপ্রাস অনেক ক্ষেত্রে সুশ্রাব্য নয় অনেকস্থলে পয়াবের অক্ষর সমতারক্ষিত হয়নি, ছন্দ-নির্মাণ যে সবক্ষেত্রে নির্দোষ হয়েছে এ কথাও বলা চলে না তথাপি

আন্তরিকতার গুণে কবি-হৃদয়ের 'মাধুরী'-স্পর্শে চৈতন্যচরিতামৃত কাব্যের রসলোকে উন্নীত হয়েছে।

সুতরাং দেখা যাছে কি ঐতিহাসিক তথ্য-সম্ভারে, কি বৈষ্ণবধর্মের নিগূঢ়-তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনে, কি কাব্যরূপের বর্ণ-বিন্যাসে কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত একটি অনবদ্য গ্রন্থ। ঐতিহাসিকের তথ্য এবং তত্ত্ব-সাগর মন্থন করে তিনি যে বিরল কবি-প্রতিভায় এই বিপুললায়তন কাব্য-সৌধটি নির্মাণ করেছেন এর দোসর বাংলা সাহিত্যে নেই।

॥ ছয় ॥

॥ চৈতন্যচরিতামৃত ও চৈতন্যভাগবত : একে অপরের পরিপূরক ॥

চৈতন্যচরিতামৃত এবং চৈতন্যভাগবত মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের দুই পরমাশ্চর্য গ্রন্থ। কেবল আয়তনে নয়, বিষয়বস্তু নির্বাচনে, বর্ণনায় এবং বিস্তারে কাব্য দু'টি মহাকাব্যের প্রান্ত-সীমা-লগ্নী হয়ে উঠেছে। উৎকর্ষের ক্রম-পার্থক্য থাকলেও গ্রন্থ দু'খানি যেন একই বৃন্তে দুটি ফুলের মত-দু'টোই বর্ণোজ্বল, দু'টোই সুগন্ধী এবং সুন্দর। দুই কাব্যের রচয়িতা দুই ভক্ত বৈষ্ণব, নিষ্ঠাবান সাধক-কবি। একই মহাপুরুষের অনন্ত জীবন-মহিমার মহান্‌-চিত্রণ উভয় গ্রন্থের লক্ষ্য। একই ভাব-সম্পদ উভয় গ্রন্থের সৃজন-শিল্পের অন্তরালে বেগ সঞ্চার করেছে এবং একই প্রেরণায় উভয়ে প্রাণময় এবং পরিপুষ্ট। তবুও গ্রন্থ দু'টি এক নয়। সমজাতীয় হলেও সমান নয়। এখানেই উভয়ের পার্থক্য, এখানেই উভয়ের মাঝে দুরতিক্রমী ব্যবধান। গ্রন্থদ্বয়ের উৎস-মূল অনুসন্ধান করলে উভয়ের মধ্যকার ব্যবধানী সম্পর্ক বিধৃত হবে।

চৈতন্যভাগবতে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর যে জীবন-চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা' অপূর্ণ এবং খণ্ডিত। গ্রন্থখানি আদি, মধ্য ও অন্ত্য এই তিন খণ্ডে বিভক্ত। অদি খণ্ডে পাই মহাপ্রভুর বাল্য জীবনের বিস্তৃত বর্ণনা—গয়া গমন পর্যন্ত এ খণ্ডের সীমা। মধ্য খণ্ডে পাই মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত সকল বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা আর অন্ত্যখণ্ডে সূত্রাকারে স্থান

পেয়েছে মহাপ্রভুর নীলাচলে গমন এবং তথাকার লীলাংশ। সুতরাং অন্ত্যখণ্ডে আকস্মিক ছেদ-চিহ্ন পড়ায় গ্রন্থখানি অসম্পূর্ণ এবং খণ্ডিত হয়েছে। এ গ্রন্থে গৌর লীলা বর্ণিত হয়েছে কিন্তু চৈতন্যের প্রেম-ধর্মের মহাবাণী ব্যাখাত হয়নি, নিখিল ভারতে প্রেমধর্ম প্রচারের কথাও বাদ পড়েছে, সর্বোপরি অন্তরালে রয়ে গেছে মহাপ্রভুর জীবন-লীলার শ্রেষ্ঠতম সম্পদ কৃষ্ণ-বিরহ-কাতর ভাবোন্মত্ত ধ্যান-সর্গ। চৈতন্য-ভাগবতের অন্ত্যখণ্ড যে অসম্পূর্ণ ছিল তার প্রমান পাই স্বয়ং কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর বাণীতে ঃ

নিত্যানন্দ-লীলা বর্ণনে হৈল আবেশ।
চৈতন্যের শেষ লীলা রহিল অবশেষ॥

এই অসম্পূর্ণ কাজের সমাপ্তি-সাধনের ভার পড়েছিল কবিরাজ গোস্বামীর উপর। মহাপ্রভুর শেষলীলা জানার জন্যে সবাই ছিল উন্মুখ—অথচ জানার উপায় নেই। ষড়্‌গোস্বামিগণ এই অজ্ঞাত তথ্য জানানোর ভার দিয়েছিলেন কৃষ্ণদাস কবিবাজের ওপর। মহাভার ন্যস্ত হয়েছিল মহান ব্যক্তিব উপরেই।

যে অন্ত্যলীলার অমৃত আস্বাদনের অসীম পিয়াসা ছিল নিষ্ঠাবান ভক্তগণের হৃদয়-মূলে—চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ সম্পূর্ণ হওয়ায় সে পিয়াসা মিটেছে বৈষ্ণব-সাধকগণের। চৈতন্যভাগবতের আদি ও মধ্যলীলা পাঠের পর চৈতন্য-চবিতামৃতের অন্ত্যলীলার অসীমামৃত পান—সুতরাং এদিক দিয়ে চৈতন্যচরিতামৃত নিঃসন্দেহে চৈতন্যভাগবতের পরিপূরক। চৈতন্য ভাগবতে যা অপূর্ণ চৈতন্য চরিতামৃতে তাই সম্পূর্ণ।

কিন্তু এছাড়াও আরো অনেক কারণ আছে।

বৃন্দাবন দাসের কাব্যে আমরা শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর একটা স্থানিক রূপ পাই—তা' মহাপ্রভুর জীবনের এক ভগ্নাংশ মাত্র। এ চৈতন্য দেব একান্তভাবেই যেন গৌড়ের সম্পদ—কিন্তু গৌড়ের বাহিরে বিশাল ভারতবর্ষ ব্যাপী যে মহাপ্রভুর চলেছিল প্রেমলীলা সে সম্পর্কে

বৃন্দাবনদাস নীরবষ্টিদৃ। কিন্তু কৃষ্ণদাসের ছিল বিপুল বিস্তারী। উদার দৃষ্টি-ভংগীতে তিনি মহাপ্রভুর উদার জীবন-লীলাই লিপিবদ্ধ করেছেন। নিখিল ভারতের বৃহত্তর পটভূমিকায় তিনি মহাপ্রভুকে স্থাপন করে তাঁর সমগ্র জীবন-রূপ এবং জীবন-বাণীর মর্মনির্যাস গ্রহণ করেছেন। বৃন্দাবন দাসে পাই গৌড়ীয় চৈতন্যদেবকে আর কৃষ্ণদাসে অবলোকন করি ভারতের মহাপ্রভুকে। সুতরাং এদিক দিয়েও চৈতন্য-চরিতামৃত চৈতন্যভাগবতের পরিপূরক—অবশ্য ব্যাপক এবং উদার অর্থে। বৃন্দাবনদাস ছিলেন প্রায় চৈতন্যদেবের সমসাময়িক। তখন কৃষ্ণ-বিরহী মহাপ্রভুর ন্যায় মহাপ্রভুর নামে সব পাগল। মানুষের বিচারশীল মন তখন বোবা। সুতরাং বৃন্দাবনদাসের দৃষ্টিভংগীর সীমাবদ্ধতা প্রায় অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। তাই তাঁর গ্রন্থেব মধ্যে দেখি অলৌকিকতার আন্দোলন এবং সে আন্দোলন যত্রতত্র প্রবেশ। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই এই অলৌকিকতা লেখকের স্ব-কল্পিত। কিন্তু কৃষ্ণদাস গ্রন্থ রচনা সুরু করেছেন মহাপ্রভুর তিরোধানের দীর্ঘদিন পর। এ সময় মানুষের, বিশেষ করে লেখকের মন ছিল বিচার-বিবেচনার পক্ষপাতী। অবশ্য তিনি যে চৈতন্য-প্রিয় ছিলেন না তা' নয়—হয়তো বা অন্ধ ভক্তই। তথাপি বিভিন্ন গোস্বামীগণের সাথে আলোচনায় পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে তিনি সকল বিষয়কে বিচার-বিবেচনার দ্বাবা গ্রহণ করতে চেয়েছেন। এবং এই জন্যেই তাঁব বিশালায়তন গ্রন্থে অলৌকিকতা মাত্র কয়েকবার আত্মপ্রকাশ করেছে। আবেগ-বশে বৃন্দাবন দাস অনেক ঘটনা অতিরঞ্জিতভাবে উপস্থিত করেছেন কোন ঘটনা অপলাপ-প্রায় হয়ে উঠেছে —কৃষ্ণদাসকবিরাজ সেই সকল ঘটনাকে যতদূর সম্ভব অবিকৃত রেখে আপন গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন। কোন কোন স্থানে বৃন্দাবন দাস বর্ণিত ঘটনা কবিরাজ গোস্বামী নতুন ভাবে উপস্থিত করেছেন অবশ্য এই নতুন উপস্থাপনা বৃন্দাবনদাসের ভ্রম সংশোধন ছাড়া আর কিছুই নয়। এই উপস্থাপন ছাড়াও বৃন্দাবন দাস যে ঘটনাগুলি সূত্রাকারে বলেছেন কৃষ্ণদাস সেগুলির বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন আবার

বৃন্দাবন দাসে যেগুলির বর্ণনা বিস্তারিত কৃষ্ণদাসে সেগুলি সংক্ষিপ্ত। সুতরাং গ্রন্থ দু'টি একসাথে মিলিয়ে পড়লে মহাপ্রভুর জীবন-লীলার সম্পূর্ণ এবং সত্যতম অংশটি গ্রহণ করা সহজ হবে। এদিক দিয়েও উভয় গ্রন্থ উভয়ের পরিপূরক।

বৃন্দাবনদাসে গৌরলীলার বর্ণনা আছে কিন্তু যে মহান সাধন-তত্ত্বের ওপর সমগ্র বৈষ্ণবধর্ম দাঁড়িয়ে আছে তার কোন দার্শনিক ভিত্তি দান করতে পারেননি। কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তা, করেছেন। মহাপ্রভুর সমগ্র জীবন-ধর্ম সম্পূর্ণ রূপে 'হৃদয়াবেগের মিষ্টিক্' অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই নয় তাকেই কৃষ্ণদাস কবিরাজ সর্বজনগ্রাহ্য মনস্তত্ত্ব-সম্মত দার্শনিক ভিত্তি ভূমিব ওপর প্রতিষ্ঠিত কবেছেন। চৈতন্য-জীবন ও ধর্ম-দর্শনের যে সকল অভিনব রত্নভাণ্ডার সংস্কৃত-কাব্যের জঠোরাভ্যান্তরে আত্মসাৎ করা ছিল কবিরাজ গোস্বামী-বীর বিক্রমে বিবামহীন মল্ল-যুদ্ধের পর তা, উদ্ধার করে এনেছেন। এজন্যেই তো বৈষ্ণব সাধকের কাছে চৈতন্যচরিতামৃত চৈতন্যেব নব-জীবন-বেদ।

বৃন্দাবনদাস চৈতন্যভাগবতে যে সকল ঘটনা বিবৃত করেছেন সেগুলির কোন ঐতিহাসিক ক্রম অনুবর্তন নেই। তিনি নিজেই বলেছেনঃ 'এসব কথার আমি নাহি জানি ক্রম'। কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃতে সমুদয় ঘটনা ঐতিহাসিক ধারা বাহিকতায় গ্রথিত করেছেন।

বৈষ্ণব রস-শাস্ত্রের দিক থেকে উভয় গ্রন্থ উভয়ের পরিপুরকের সমর্থনে আর একটি যুক্তি দেখানো যেতে পারে। বৃন্দাবনদাসের কাব্য একান্ত রূপেই ঐশ্বর্যভাবের প্রতীক। কিন্তু চরিতামৃতে প্রধান হয়ে উঠেছে মধুর ভাব অবশ্য ঐশ্বর্যভাব যে এ গ্রন্থে একেবারেই নেই তা' নয়— কিন্তু তার পরিমাণ সামান্যই। এদিক থেকেও উভয় গ্রন্থ উভয়ের পরিপুরক। স্বয়ং কৃষ্ণদাস কবিরাজও গ্রন্থ রচনায় বারবার বিভিন্ন স্থানে কৃতজ্ঞতা-চিত্তে বৃন্দাবনের নাম উল্লেখ করেছেন:

কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।
চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবনদাস॥

অন্যত্রঃ

মানুষে রচিতে পারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
বৃন্দাবন দাসমুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য॥

এবং এত নম্রতা স্বীকারের পর তিনি আপনার গ্রন্থকে দীনভাবে বৃন্দাবন-দাসের গ্রন্থের পরিপূবক বলেছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় এ নিছক বিনীত বৈষ্ণবোক্তি মাত্র। আসলে চৈতন্যচরিতামৃত নতুন গ্রন্থ। উপরের কারণগুলি গভীরভাবে বিবেচনা করলে আমবা স্পষ্টই বুঝতে পারবো চৈতন্যচরিতামৃতকে চৈতন্যভাগবতের পরিপূরক গ্রন্থ বলা অপেক্ষা—নতুন চৈতন্য-জীবন-বেদ বলাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। বাস্তবিক কি ঐতিহাসিক সত্য নিষ্ঠায়, কি দার্শনিক তত্ত্ববিশ্লেষণে কি জীবন চরিতের স্বরূপ-বর্ণনায়, কি কাব্য রচনায় সকল দিক দিয়েই চৈতন্যচবিতামৃত চৈতন্যভাগবত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং অভিনব। চৈতন্য ভাগবত বাল্য কৈশোরের কাব্য, চরিতামৃত যৌবন প্রৌঢ়ত্বেব বাণীঅর্ঘ্য। বৃন্দাবন দাসেব কাব্য বয়ঃসন্ধি-উন্মাদনার, কৃষ্ণদাসের কাব্য যৌবন-বিবহের। একটি ভাসমান অপবটি অতলান্ত। 'বৃন্দাবনদাসের অকৃতকার্যই কৃষ্ণদাসের আরাব্ধ।' সুতরাং চৈতন্যচরিতামৃত চৈতন্যভাগবতের পরিপূরক গ্রন্থ হয়েও নতুন মহাকাব্য।

॥ সাত ॥

॥ নবদ্বীপ ও বৃন্দাবন : ধর্মমত ॥

আজকাল চৈতন্যভাগবত এবং চৈতন্যচরিতামৃত এই দুটি গ্রন্থকে কেন্দ্র করে নবদ্বীপ এবং বৃন্দাবনের ধর্মমতের মধ্যে পার্থক্য রচনার চেষ্টা করা হয়। অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর ভাষায় উভয় স্থানের ধর্মমতের মধ্যকার ব্যবধান, সুন্দররূপে প্রকাশিত হয়েছে : "নবদ্বীপের

বৈষ্ণবগণের নিকট শ্রীচৈতন্য আরাধ্য উপেয়। আর বৃন্দাবনের আদর্শে তিনি উপায়। অবশ্য বৃন্দাবন ও নবদ্বীপ উভয়ত্র তাঁহার ঈশ্বরত্ব স্বীকৃত তথাপি নবদ্বীপে তিনি

মূলতঃ কৃষ্ণভাবে পুজিত হইবেন 'বৃন্দাবনের ভক্তেরা তাঁহাকে শ্রীরাধার ভাব আস্বাদনের জন্য অবতীর্ণ কৃষ্ণরূপে মানিতেন, এবং 'নরহরি শিবানন্দ বাসুঘোষ প্রভৃতি ভক্তেরা তাঁহার কৃষ্ণভাবকে অবলম্বন করিয়াও নিজেরা গৌরনাগরী-ভাবে আবিষ্ট হইয়া তাঁহার মাধুর্য আস্বাদন করিতেন। আর বৃন্দাবনবাসী ভক্তগণ তাঁহার রাধাভাবকে অবলম্বন করিয়া ও আপনাদিগকে মঞ্জরিভাবে ভাবিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিতেন।" ধীর ভাবে বিবেচনা করলে শেষ পর্যন্ত এই বিরোধের অস্তিত্ব থাকে না। নবদ্বীপ এবং বৃন্দাবনের আদর্শের মধ্যে ভেদ-কল্পনা শেষ পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়। যাঁবা এই উভয় ধর্মের মধ্যে শ্রীচৈতন্যকে উপায় এবং উপেয় রূপে কল্পনা করেছেন তাঁদের নিজেদেরই যুক্তি 'কিন্তু', 'যে', 'যদি', ইত্যাদি সন্দেহাত্মক শব্দের প্রয়োগে দুর্বল হয়ে পড়েছে। প্রসঙ্গত তাঁদেব সামান্য মত উল্লেখ করা যেতে পারে "গৌড়ভক্তেরা যে শ্রীচৈতন্যের রাধা ভাবের বিরহ স্বীকার করিতেন না, তাহা নয়....নীলাচলে শ্রীচৈতন্য কখনো কৃষ্ণভাবে' কখনো রাধাভাবে পুজিত হইতেন" ইত্যাদি।

নবদ্বীপে শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে উপেয় বলা হয়েছে—অর্থাৎ তিনিই স্বয়ং কৃষ্ণ, তাঁকে পেলেই ভক্তের আকুল আবেদনেব চরম শান্তি। কিন্তু চৈতন্য এবং চৈতন্যোত্তব যুগে নবদ্বীপে ধর্মসাধনাব বিষয় লক্ষ্য করলে দেখা যায় শ্রীচৈতন্য এবং কৃষ্ণ একই সময়ে পুজিত হয়েছেন।

চৈতন্য ভাগবতের কাহিনী হ'তে জানা যায় গয়া হ'তে ফেরার পর কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণকীর্তন ও কৃষ্ণলীলার প্রণোন্মাদিনী আবেশেই মহাপ্রভুর দিন কেটেছে। গয়াতীর্থে ঈশ্বরপুরীর নিকট আলাপচারনায মহাপ্রভুর জীবনে অভিনব ভাবাবেগ এবং পরিবর্তন দেখা যায়। ঈশ্বরপুরী স্থানান্তরে গমন করলে মহাপ্রভুর মধ্যে ভাবাবেগ তীব্র হয়ে ওঠে এবং কৃষ্ণের নাম ধরে কেঁদে ওঠেনঃ 'কোথা মোর বাপ কৃষ্ণ ছাড়িয়া আমারে।' এই মাত্র সুরু। এর

পর নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন করে তিনি কৃষ্ণপ্রেমে একেবারে আত্মহারা হয়ে যান এবং তিনি নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে আদেশ করেন :

প্রতি ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণশিক্ষা (চৈতন্য ভাগবত)

এখানে আমরা স্পষ্টই দেখ্‌তে পাচ্ছি শ্রীচৈতন্যের সময়ে নবদ্বীপে কৃষ্ণ পুজিত হতেন। প্রভু নিত্যানন্দ ও স্বয়ং কৃষ্ণ ও কৃষ্ণচৈতন্য উভয়ের পুজা করতেন। তাঁহাদের পক্ষে নিছক অনুপ্রেরণা দাতা বলিয়া মহাপ্রভুকে গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। তাঁহারা যে তাহা করিতেনও না, চৈতন্যচরিতামৃতে তাহার উল্লেখ আছে। চরিতামৃত হইতে জানা যায়, রঘুনাথ দাস প্রত্যহ "প্রহরকে মহাপ্রভুর চরিত্র কথন" করিতেন; এবং রূপসনাতনাদির দৈনন্দিন কর্ত্তব্যের অন্তর্গত ছিল চৈতন্যকথা শ্রবণ ও চৈতন্য-চিন্তন—প্রত্যহ "চৈতন্যকথা শুনে করে চৈতন্য-চিন্তন।" ভক্তিরত্নাকরে আছে, বৃন্দাবনের গোস্বামীগণ শ্রীচৈতন্যেব অষ্টকালীন নিত্যলীলার চিন্তাও কবিতেন : "চৈতন্যচন্দ্রের নিত্যলীলা রসায়ণ। নিশান্ত নিশা পর্যন্ত চিন্তে বিজ্ঞজন।।"
এ ছাড়াও রূপ, সনাতন ও রঘুনাথের স্তবস্তোত্রে এবং নবোত্তম দাস ইত্যাদির প্রার্থনা পদসমূহে শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুকে স্পষ্ট অবতাররূপে স্বীকার করা হয়েছে। ব্রজলীলা এবং নবদ্বীপ লীলা উভয়ের সম্মিলিত আস্বাদ-নজনিত মাধুর্যই যে চরম মাধুর্য সে সম্পর্কে বৃন্দাবন গোস্বামীগণের কোন সন্দেহ ছিল না। সুতরাং মহাপ্রভু বৃন্দাবনে কেবল উপায় রূপে পুজিত হতেন এমন প্রকাশের পিছনে বিশেষ কোন যুক্তি নেই—ভিত্তি অনেকখানি দুর্বল।

॥ আট ॥

॥ সার্বভৌম জয় : বেদান্ত বিচার ॥

সীমাতিক্রমী প্রেম-পারাবারের কল্লোল-গানে মধ্যযুগের গাথাবাহী বাংলা-সাহিত্য উতরোল হয়ে উঠেছিল। প্রেমের বাঁধন-ভাঙা দুর্বার স্রোতে বাঙালী মানস হয়ে উঠেছিল বিষয়-বিলোপী অসীম-অভিসারী। এই প্রেম-ধর্ম-প্রচারই শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর জীবন-রূপের শ্রেষ্ঠতম রূপ। কিন্তু এই প্রেম-মন্ত্রোচ্চারণের অন্তরালে ফুটে উঠেছে মহাপ্রভুর আর এক রূপ—সে রূপ গৌণ। মহাপ্রভুর মধ্যে আমরা দেখেছি সেই যুগ-মানবের বিপ্লবাত্মক এক বহ্নি-স্ফুরণ। প্রেম বিতরণের সময় তিনি কুসুম-কোমল—চন্দ্রালোকিত সিক্ত বেলা-ভূমির পেলব-মসৃণতার রূপই তাঁর আজীবন আচরণের মধ্যদিয়ে প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু এই লাবণ্য-কোমলতার অন্তরালে আমরা আর এক রূপ দেখেছি—সে রূপ কঠোর, ভয়াল-ভীষণ না হলেও তেজ-দীপ্ত। মহাপ্রভুর দ্বি-মুখী সত্তার একটি যেমন 'মৃদূনি কুসুমাদপি' অন্যটি তেমনি 'বজ্রাদপি কঠোরাণি।' চৈতন্যচরিতামৃত হতে পাই :

> মহানুভবের স্বভাব এই মত হয়।
> পুষ্পসম কোমল কঠিন বজ্রময় ॥

এই বজ্রলস্ফূর্তির দীপ্তময় প্রকাশ ঘটেছে পাণ্ডিত্য-গর্বোদ্ধত কুতার্কিক-কুলের পাণ্ডিত্য-নিধনের সময়। সেখানে মহাপ্রভু কমল নন—কঠোর, নিরাহঙ্কার নন—বোধহয় কিছু অহংকারীও। আত্মগর্বী বৈদান্তিক পণ্ডিত সার্বভৌমের পাণ্ডিত্য-বিনাশনের সময় মহাপ্রভুর এই বজ্র-সুন্দর রূপের অভিনব প্রকাশ ঘটেছে। কাশীর প্রকাশানন্দের ন্যায় সার্বভৌম ছিলেন নীলাচলের বহুখ্যাত বেদান্ত বিশারদ। সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা অসংখ্য সন্ন্যাসীকে তিনি বেদান্ত শিক্ষা দিতেন। এই বেদান্ত-গর্বী

কুতার্কিত পণ্ডিত শেষ পর্যন্ত মহাপ্রভুর বজ্র-দীপ্ত মণীষায় এবং তীক্ষ-ধার পাণ্ডিত্যে একেবারে বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত হ'য়ে গেছেন। মহাপ্রভুর চরণতলে এই বৈদান্তিক পণ্ডিতের বেদান্ত-বিস্ফারিত উর্ধোত্থিত মস্তক অবনত হয়ে পড়েছে। আপন ক্ষুর-ধার প্রতিভা-বলে মহাপ্রভু বেদান্তের সকল ভ্রান্ত মত খণ্ডন করে আপনার ন্যায় ও চিরন্তন সত্যানুগ মতের প্রতিষ্ঠা করেছেন।

বৌদ্ধধর্মের করাল-গ্রাসে যখন ভারতবর্ষ হতে বেদান্ত-ধর্ম লুপ্তপ্রায় হয়ে উঠেছিল সে সময় আবির্ভাব হয়েছিল বেদান্তের বহুখ্যাত ভাষ্যকার শ্রীশঙ্করাচার্যের। তিনি এসে বেদান্তের এক নতুন ভাষ্যে মায়াবাদ-প্রতিষ্ঠা করলেন। মহাপ্রভুর-আগমণের পূর্ব পর্যন্ত বেদান্তের এই ভাষ্যই সর্বজন গ্রাহ্য ছিল এবং প্রকাশানন্দ সার্বভৌম ইত্যাদি পণ্ডিতগণ সেই ভাষ্যেরই যথার্থ উত্তারাধিকারী।

শঙ্করাচার্যের প্রতিষ্টিত ভাষ্যগুলি ভ্রমাত্মক হওযার প্রধান কাবণ হলো শঙ্করাচার্য শ্রুতির ব্যাখ্যায় লক্ষণা বৃত্তির দ্বাবস্থ হয়েছিলন। কোন বাক্য বা শব্দের অর্থ করাব দুটি প্রণালী আছে—একটি মুখ্যা বা অভিধাবৃত্তি এবং দ্বিতীয়টি লক্ষণা বা গৌনী বৃত্তি। মুখ্যাবৃত্তিতে শব্দের বাচ্যার্থই প্রধান, শ্রবণমাত্রই যে অর্থ আমাদেব গহন মনে ভেসে ওঠে তাই মুখ্যার্থ—এখানে কল্পনার কোন স্থান নেই। কিন্তু লক্ষণাবৃত্তিতে বাচ্যার্থ অপেক্ষা ব্যাঙ্গার্থই প্রধান হয়ে ওঠে। শ্রবণমাত্রই যে অর্থ হৃদয়-দ্বাবে আঘাত হানে তাকে পরিত্যাগ করে কল্পনার আশ্রয়ে শব্দের নতুন অর্থ করার প্রবণতাই হলো লক্ষণাব্রাত্তি। শঙ্করাচার্য শ্রুতির যে সকল ভাষ্য রচনা করেছিলেন এই লক্ষণাবৃত্তিই হলো সেগুলির সূতিকাগার। শ্রীশঙ্করাচার্য শ্রুতির সরল সহজ অর্থ পরিত্যাগ করে লক্ষণা-বৃত্তিতে অর্থ করেছিলেন বলেই ভ্রমাত্মক হয়ে উঠেছিল। সুদীর্ঘ সাতদিন বেদান্ত পড়ার পর তাই সার্বভৌম যখন মহাপ্রভু কিছু বুঝেছেন কিনা জিজ্ঞাসা করেন তখন মহাপ্রভুর কণ্ঠ হ'তে শোনা যায়ঃ

প্রভু কহে সূত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্মল।
তোমার ব্যাখ্যা শুনি মন হয়তো বিকল॥

সূত্রের অর্থ ভাষ্য কহে প্রকাশিয়া।
ভাষ্য কহ তুমি সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়া॥

কেন না :

সূত্রের মুখ্য অর্থ না কর ব্যাখ্যান।
কল্পনার্থ তুমি তাহা কর আচ্ছাদন॥

মুখ্যার্থ পরিত্যাগ করে কল্পনার্থে জোর দেওয়ায় সার্বভৌম তথা শঙ্করাচার্যের সকল ভাষ্য ভ্রান্ত হয়ে উঠেছে। এই ভ্রান্ত ভাষ্যের যেগুলি মহাপ্রভু যেভাবে খণ্ডন করে আপন মত প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন নিম্নে আমরা সেগুলিই উত্থাপন করার চেষ্টা করবো :

ক ।। সবিশেষ নির্বিশেষ তত্ত্ব : মায়াবাদী শঙ্করাচার্যের প্রথম এবং প্রধান মত হলো ঈশ্বর নির্বিশেষ। ভগবানের এই নির্বিশেষত্ব প্রতিপাদন এবং প্রতিষ্ঠার জন্যে তাঁর কত না আকুল আগ্রহ। নির্বিশেষ কথার অর্থ হলো নিঃশক্তি। মায়াবাদীদের মতে ভগবানের কোন নিজস্ব শক্তি নেই এবং তিনি নিরাকার ভগবান কোন শক্তির কথা স্বীকার করলে তিনি আর নির্বিশেষ থাকেন না। কেন না শক্তির জন্যে আধার চাই—সুতরাং শক্তির কথা স্বীকার করে নিলেই আধারের কথা স্বীকার করতে হয়। তখন ভগবান সবিশেষ হয়ে ওঠেন। তাই মায়বাদীগণ ভগবানের নির্বিশেষত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যেই তাঁর সকল শক্তিকে উপেক্ষা করেছেন। কিন্তু মহাপ্রভু প্রমাণ করেছেন ব্রহ্ম সবিশেষ—তাঁর বুকেই নিহিত আছে অনন্ত শক্তির লীলা-প্রবাহ। প্রথমতঃ ব্রহ্ম শব্দের মুখ্যার্থই হলো বৃহদ্বস্তু—সর্বশক্তিময়। সুতরাং এই সর্বশক্তিই ব্রহ্মের সবিশেষত্ব দান করেছে। দ্বিতীয়তঃ শ্রুতির ভাষা রচনা করে শঙ্করাচার্য ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব প্রতিপন্ন করছেন সেই শ্রুতিতেই মুক্ত কণ্ঠে স্বীকৃত হয়েছে ব্রহ্মের অসংখ্য শক্তির কথা। এই শক্তিপুঞ্জ সততঃ ক্রিয়াশীল এবং এরা ব্রহ্মের স্বাভাবিক অংশ হ'তে অবিচ্ছেদ্য। ব্রহ্মের এই অনন্ত শক্তির মধ্যে তিনটি শক্তি প্রধান—চিচ্ছক্তি (অন্তরঙ্গা

বা স্বরূপ শক্তি) মায়াশক্তি (বহিরঙ্গা) এবং তটস্থা (জীবশক্তি)। প্রকৃত বিশাল ব্রহ্মাণ্ড তাঁর মায়াক্তির লীলানিকেতন গণনাতীত অনন্ত লক্ষ-কোটি জীব তাঁর তটস্থা শক্তির বহিঃপ্রকাশ এবং ঐশ্বর্য-মাধুর্য গুণাবলী তাঁর চিচ্ছক্তির মহান বিকাশ। শ্রুতিবাক্যের আর এক স্থানে ব্রহ্মের অনন্ত শক্তিসমূহের কথা সুন্দর রূপে বিধৃত হয়েছে। ব্রহ্মকে বলা হয়েছে অপাদান, করণ এবং অধিকরণের কারক। ব্রহ্মের অনন্ত শক্তি হতে বিশ্বের সৃষ্টি—অপাদান, ব্রহ্মের দ্বারাই জগৎ-জীবের—প্রাণ-প্রবাহ চালিত—কারণ, এবং অন্তিমে সকল কিছুই ব্রহ্মতে বিলীন হয়ে যাবে—অধিকরণ। শ্রুতির এই বাক্যে নিহিত রয়েছে ব্রহ্মের অনন্ত শক্তির বিজয় ঘোষণা। সুতরাং ব্রহ্ম স্ব-শক্তিতে অধিষ্ঠিত, সবিশেষ। তৃতীয়তঃ কোন কোন শ্রুতিতে ব্রহ্মকে নির্বিশেষ বলায় শঙ্করাচার্য সেই সকল শ্রুতিসমূহ দিয়ে ব্রহ্মের যে নির্বিশেষত্ব প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন তাও ভ্রান্ত। মহাপ্রভু প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে ঐ সমস্ত শ্রুতির মূল তাৎপর্য হলো ব্রহ্মের অপ্রাকৃত শক্তিসমূহের (প্রাকৃত শক্তি নয়) অস্তিত্ব স্বীকার করা। যেমন শ্রুতিতেই আমরা পাই সৃষ্টির প্রারম্ভে এক ব্রহ্ম বহু হতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন এবং তখন তিনি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন প্রাকৃত শক্তির দিকে ঃ

> ভগবান বহু হৈতে যবে কৈল মন।
> প্রাকৃত শক্তিকে তবে কৈল বিলোকন ॥....॥চৈ, চ, মধ্যে, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥

এই বাক্যে ভগবানের চিন্তা করার শক্তি হ'তে মনের এবং দৃষ্টিপাত করার শক্তি হতে চক্ষুর অস্তিত্ব স্বীকৃত। কিন্তু তখনো প্রাকৃত নয়ন মনের সৃষ্টি হয়নি—মায়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করার পর হতে প্রাকৃত নয়ন মনের সৃষ্টি। কিন্তু প্রাকৃত নয়ন মন না থাক্‌লে ভগবানের এই দর্শন এবং চিন্তা শক্তি কোথা হতে এল ? শঙ্করাচার্য এখানে এসেই ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন কিন্তু মহাপ্রভু বলেছেন প্রাকৃত নয়ন মন না থাক্‌লেও ব্রহ্মের অপ্রাকৃত নয়ন ছিল এবং এই অপ্রাকৃত নয়ন মন দিয়ে তিনি চিন্তার এবং দর্শনের কার্যাবলী

সুসম্পন্ন করেছেন। অন্য আর এক শ্রুতি হ'তে আমরা ব্রহ্মের কর এবং চরণ না থাকলেও তাঁ ধ্বর এবং চলৎ শক্তির ইংগিত পাই। এখানেও ব্রহ্মের এই কর-চরণ প্রাকৃত নয়—অপ্রাকৃত। সুতরাং ব্রহ্মের শক্তি এবং অপ্রাকৃত বিশেষত্বে সন্দেহ স্থাপন করার কোন কারণ নেই। ব্রহ্ম চিদ্‌ঘন জ্ঞানঘন এবং আনন্দঘন বিগ্রহ—তিনি ষড়ৈশ্বর্য পূর্ণানন্দের প্রতিমূর্তি। চতুর্থতঃ শঙ্করাচার্য 'তত্ত্বমসী' বাক্যের অর্থ নির্ণয়ে মুখ্যাবৃত্তি ছেড়ে লক্ষণাবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন ফলে ব্রহ্ম নির্বিশেষ হয়ে পড়েছেন। কিন্তু শ্রুতিতে স্পষ্টাক্ষরে উল্লিখিত হয়েছে যে ব্রহ্ম হলেন শক্তি-প্রবল আনন্দ। তা' ছাড়াও এই শব্দটি মহাবাক্য নয়—খণ্ডিত একটা

প্রাদেশিক রূপের প্রতীক মাত্র—'প্রণবই'-হলো অখণ্ড মহাকাব্য এবং প্রণব বাক্যই ব্রহ্মের স্বজনী, পালিনী, সংহারিণী শক্তিপুঞ্জের বাস্তবা লয়। সুতরাং ব্রহ্ম নির্বিশেষ হন কিরূপে ? পঞ্চমতঃ ব্রহ্ম শব্দের অর্থে দুটি অংশ বর্তমান—একটি বৃংহতি। অপরটি বৃহয়তি এই উভয়ের সম্মিলিত অর্থে ব্রহ্ম পূর্ণ। কিন্তু শক্তির কথা অস্বীকার করলে 'বৃংহয়তি' অংশ বাদ পড়ে যায় এবং ব্রহ্মের পূর্ণ-স্বরূপের হানি হ'তে বাধ্য। সুতরাং ব্রহ্মের শক্তিকে অস্বীকার করবে কে ?

মহাপ্রভুর এই তীক্ষ্ণধার যুক্তি-বাণে মায়াবাদীদের নির্বিশেষত্ব নিমিষে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এবং নির্বিশেষত্বের ধ্বংসস্তূপের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শেষত্বের অটল বৈভব।

খ॥ জীবতত্ত্ব ঃ জীবের স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে শ্রীপাদ শঙ্কর বলেছেন যে মায়কবলিত ব্রহ্মই জীব—জীব হ'তে এই মায়া বিদূরীত হলে জীবই ব্রহ্ম হয়ে ওঠে। তখন জীব-ব্রহ্মে কোন পার্থক্য থাকে না। বলাবাহুল্য। শঙ্করের এই মত শ্রুতির লক্ষণার্থের ওপর প্রতিষ্ঠিত কেবল লক্ষণার্থই নয় লক্ষণার্থের সাথে মিলিত হয়েছে তাঁর নিজস্ব চিন্তা ভংগী ফলে শ্রুতির মুল অর্থ সম্পূর্ণ কাল-কবলিত। শ্রুতির মুখ্যা-

র্থানুযায়ী জীব হলো ব্রহ্মেরই অংশ—তাঁরই শক্তির অনন্ত বিকাশ। ব্রহ্ম মায়াধীশ আর জীব মায়াবশ জীব ব্রহ্মেরই নিত্যদাস।

গ॥ সম্পদ সম্বন্ধতত্ত্ব: শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের মতানুযায়ী নির্বিশেষ ব্রহ্মই সমস্ত বেদের প্রতিপাদ্য সম্পদ তত্ত্ব কিন্তু শ্রুতি মুখ্যার্থ অনুযায়ী মহাপ্রভু প্রমাণ করেছেন সবিশেষ ব্রহ্মাই বেদের প্রতিপাদ্য এবং শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মত্বের ও রস স্বরূপত্বের বিকাশ বলেই শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধতত্ত্ব।

ঘ।। সাধনতত্ত্ব: বৈদান্তিক-বিশারদ শঙ্করাচার্যের মতে জ্ঞানমার্গের সাধনই মায়াকবলিত জীব-মুক্তির শ্রেষ্ঠপন্থা কিন্তু মহাপ্রভু প্রমাণ করেছেন দেবরেপ্রতিপাদিত অভিধেয় তত্ত্ব হলো ভক্তি। ভক্তিমার্গের সাধনাই সর্বোত্তম।

ঙ।। শঙ্করাচার্যের মতে সাযুজ্য মুক্তিই হলো একমাত্র সাধ্যবস্তু। মায়াকবলিত জীবরূপ ব্রহ্মের পক্ষে মায়ার নিষ্ঠুর কবল হ'তে মুক্তি পাওয়াই হলো সাযুজ্য মুক্তি কিন্তু এই সাযুজ্য মুক্তির মধ্যে একটি বিষয় গভীর-ভাবে চিন্তা করার আছে। প্রথমতঃ বলা হয়েছে জীব মায়াকবলিত ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মের নিজের প্রতিরোধ করার কোন শক্তি না থাকায় তিনি মায়ার বশ হয়েছেন। সুতরাং জীব মুক্তি পেয়ে যখন ব্রহ্ম হ'য়ে যাবে সেই মুক্তিপ্রাপ্ত ব্রহ্মের নিজস্ব প্রতিরোধের কোন শক্তি না থাকায় আবার মায়ার কবলে পড়ে জীবে পরিণত হবে। এই দুর্ঘটনা যদি চিরকালের মত চল্‌তে থাকে, তা হলে জীবের পক্ষে মুক্তি পাওয়া কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। সুতরাং সাযুজ্য মুক্তিতে মোক্ষ লাভ অসম্ভব। এ প্রসঙ্গে মহাপ্রভু সাযুজ্য মুক্তির কথা না বলে বলেছেন জীব কৃষ্ণের শক্তির অংশ, সুতরাং কৃষ্ণের দাস। ফলে সর্বান্তকরণে কৃষ্ণসেবাই তার লক্ষ্য। আর কৃষ্ণ সেবার তুষ্টির শ্রেষ্টতম উপায় হলো প্রেম। সুতরাং মহাপ্রভুর মতে প্রেমই একমাত্র কৃষ্ণপ্রাপ্তির পথ—প্রেমের পথ চেয়েই রসলোকের স্বর্ণপ্রসাদে পৌছানো সম্ভব। সাযুজ্য মুক্তি নয়, কৃষ্ণ-প্রাপ্তিইজীবের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

চ ॥ পরিবর্তন-বিবর্তনবাদ : বিশ্ব এবং ব্রহ্মের মধ্যকার কার্যকরণ সম্পর্ক নির্ণয় হতেই বিবর্তন ও পরিবর্তনবাদের উৎপত্তি। বিবর্তন-বাদীরা বলেন জগৎ সম্পূর্ণ অলীক, মিথ্যা কিন্তু পরিণামবাদীরা বলেন জগৎ মিথ্যা নয়—নশ্বর মাত্র। বিবর্ত শব্দের অর্থ ভ্রম। বিবর্তনবাদীদের মতে পৃথিবী হলো ভ্রম-সাধনের স্থান—এখানে নানাভাবে মানুষ ভ্রম-কবলিত হয়। মরুর উত্তপ্ত বুকে মরীচিকার দেখে পিপাসা নিবারণার্থে মানুষ ভ্রম-পথে ধাবিত হয়, রজ্জুকে সর্প ক্রমে মানুষ আতঙ্কিত শুক্তির ঔজ্জ্বল্যকে সে অনুরূপ ভ্রম বশতঃ মুক্তা মনে করে অনুরূপ অজ্ঞান মানবকুল অজ্ঞানবশে ব্রহ্ম পরিদৃশ্যমান জগৎকে সত্য বলে জেনে ভ্রমে পতিত হয় দর্পণে প্রতিবিম্বিত ছায়া যেমন অসত্য—কায়াটাই সত্য, তেমনি পরিদৃশ্যমান জগৎ ছায়া—সে ছায়ারমতই অসত্য। আসল সত্য কায়া—তিনি ব্রহ্ম। সুতরাং জগৎ মিথ্যা—ভ্রম-কেন্দ্র। বিবর্তনবাদীদের আর একটি মূল সিদ্ধান্ত হলো ঈশ্বর জগতের কারণ নন—তিনি জগৎরূপে পরিণত হননি। দুগ্ধ দধিতে পরিণত হলে যেমন দুগ্ধের আর কোন আস্বাদ থাকে না তেমনি ঈশ্বর জগৎরূপে পরিবর্তিত হলে—ঈশ্বরের সকল স্বরূপই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়—অন্ততঃ ঈশ্বরের রূপ বিকৃত হয়ে যাওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। সুতরাং ঈশ্বর হতে জগৎ সৃষ্ট হয় নি—তিনি জগতের কারণ নন।

বিবর্তনবাদীদের এই যুক্তিগুলি এতই ক্ষীণ ও দুর্বল যে মহাপ্রভু এগুলিকে অতি সহজেই খণ্ডন করতে পেরেছিলেন। প্রথম ভ্রমের উত্তরে মহাপ্রভু বলেছেন সাধারণত সমবস্তুতেই আমাদের ভ্রম হয়। রজ্জু ও সর্প একই আকারের শুক্তি ও মুক্তা একই ঔজ্জ্বল্যের প্রতীক—সুতরাং এখানে রজ্জুকে সর্প ও শুক্তিকে মুক্তা বলে ভ্রম হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। কিন্তু জগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যে এমন কোন সাদৃশ্য-সম্বন্ধ নেই—সুতরাং এখানে ভ্রম কল্পনা করা অনর্থক। তা' ছাড়া আর এক দিকে হ'তে বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। বিবর্তন বাদীদের মতে ব্রহ্ম হতেই জীবের সৃষ্টি ব্রহ্ম ও জীব এক, সুতরাং জগৎ প্রপঞ্চের মধ্যে যদি জীবের ভ্রম হয় তা,

হলে সে ভ্রম ব্রহ্মেরই কেননা জীবই ব্রহ্ম। এখন ব্রহ্মেরই যদি ভ্রম হয় তা' হলে ব্রহ্মের অংশ জীবের পক্ষে তো কোন কালেই অজ্ঞানতা হ'তে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। অনন্তকাল ধরে জীবকে ভ্রম-মরীচিকার পিছু পিছু দুর্দমনীয় পিপাসা নিবারণার্থে কাতর-ক্লান্ত হয়ে ছুটে বেড়াতে হবে। বিবর্তন বাদীদের ভ্রমতত্ত্ব যে কত দুর্বল তা' এখানেই লক্ষিতব্য।

বিবর্তনবাদীদের দ্বিতীয় কারণ অর্থাৎ ঈশ্বর জগতের কারণ নয়—এর উত্তরে পরিবর্তনবাদীরা বলেন যে ঈশ্বর জগতের কারণ নয় এটি সম্পূর্ণ অলীক কল্পনা বরং ঈশ্বর হ'তেই জগতের সৃষ্টি তিনি জগতের কারণ। শাস্ত্র, শ্রুতি ইত্যাদিও বহুস্থানে, বহুভাবে এ কথা উল্লিখিত হয়েছে। দুগ্ধদধির উপমা দিয়ে জগৎরূপে পরিণত হলে ঈশ্বরের রূপ বিকৃত হওয়ার যে কথা বিবর্তনবাদীরা বলেছেন তাও সত্য নয় কেননা ঈশ্বর অচিন্ত্য-শক্তির অনন্ত আধার। এই অসীম অচিন্ত্যশক্তিব বলেই তিনি জগৎ রূপে পরিণত হয়েও নিজে অবিকৃত অবস্থায় থাকেন। সুতরাং ঈশ্বরই জগতের কারণ। এখানে বিবর্তনবাদীদের জগৎ মিথ্যা বলার পিছনে সকল অলীক এবং দুর্বল যুক্তির অপমৃত্যু প্রাপ্ত হ'লো। 'জগৎ মিথ্যা' নয় সত্য, ব্রহ্ম জগতের স্রষ্টা—তিনিই জগৎও জীবের পালক ও সংহারক।

মহাপ্রভুর এই অনল তেজস্বী প্রতিভায়, দীপ্তজ্জ্বল মণীষায় বৈদান্তিক বিশারদ সার্বভৌম সম্পূর্ণ নির্বাক হয়ে গিয়েছিলেন, স্বীয় ভ্রান্তি উপলব্ধি করে মহাপ্রভুর চরণতলে লুটিয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। এই মহান প্রতিভার বিদ্যুৎ-তীক্ষ্ণালোকে প্রকাশানন্দের, সকল পাণ্ডিত্য গর্ব বিলীন হয়ে গিয়েছিল। সার্বভৌমকে জয় করে আনন্দে মহাপ্রভু নৃত্য করে বলেছিলেন, আজ আমার বিশ্বনিখিল জয় সম্পন্ন হল। বস্তুতঃ বিশ্বনিখিল না হোক সমগ্র উড়িষ্যা যে তাঁর করতলগত হয়েছিল সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ।

॥ নয় ॥

॥ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্মের মূল বৈশিষ্ট্য ॥

১ ॥ ব্রহ্ম নির্বিশেষ নন—সবিশেষ। তিনি ষড়ৈশ্বর্যময় পূর্ণানন্দ। অপাদান, করণ এবং অধিকরণের কর্তা একমাত্র তিনিই।

২॥ যাগ-যজ্ঞ, ব্রত তপস্যা নয়—একমাত্র প্রেমাবেশে নাম সংকীর্তনই কলিযুগের ধর্ম।

৩॥ যে নাম সংকীর্তন কলিযুগের ধর্ম তা' সহজ সাধ্য নয়। নামসংকীর্তন করতে হলে নিজেকে তৃণ অপেক্ষা নীচ, তরু অপেক্ষা সহিষ্ণু হ'তে হবে। তা' ছাড়া আপনার দেহমন হ'তে মানকে বিদূরীত করে অপরকে মান দান করতে হবে। মান বা গর্বের এতটুকু স্পর্শ যদি মনের অলিগলিতে বিরাজিত থাকে তা' হলে নামসংকীর্তনে শ্রীভগবানের সান্নিধ্যলাভ সম্ভব নয়।

৪॥ ঈশ্বর এবং জীব অভিন্ন নয় আবার ভিন্নও নয়। উভয়ে এক নয় আবার কোন পার্থক্যও নেই। উভয়ই চৈতন্যময় কিন্তু ভগবান বিভুচৈতন্যময় এবং জীব অনু চৈতন্যময় অদ্বৈত তত্ত্ব নয়—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্বেই উভয়ের মধ্যকার সম্পর্ক নির্ণীত।

৫॥ জ্ঞান, কর্ম এবং যোগ সাধনায় ভগবানকে পাওয়া যায় না—ভগবানকে আপন করে পেতে হলে চাই 'কৃষ্ণেন্দ্রিয়' প্রেম—ভগবান একমাত্র ভক্তি এবং প্রেমেই বশীভূত।

৬॥ ভগবানের সীমাহীন কৃপাংশ ব্যতীত কোন ক্রমেই ভক্তিলাভ করা সম্ভব নয়—এবং এই কৃপালাভ করতে হলে দীনতা এবং আর্তির মাধ্যমে বিগলিত দেহমনে ভগবানের স্মরণ করতে হবে।

৭॥ ভক্তির মধ্যে রাগানুগা ভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ—সুতরাং রাগানুগা ভক্তির মাধ্যমে যিনি শ্রীভগবানের অর্চ্চনা করেন তিনিই শ্রীকৃষ্ণের অসীম লীলা-রস-আস্বাদনের উপযুক্ত পাত্র।

৮॥ শ্রীকৃষ্ণের ভজনার মধ্যেও অধিকার ভেদ আছে। ভক্তির তারতম্য অনুযায়ী এই ভেদ-স্তর গঠিত—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর। মধুর রসই সর্বশ্রেষ্ঠ—এই মধুর রসের মধ্যেই শান্ত, দাস্য, সখ্য এবং বাৎসল্যের গুণাবলী বর্তমান। এ ছাড়াও আছে মধুরের নিজস্ব রূপ-মাধুর্য।

৯॥ মোক্ষবাঞ্ছা বা মুক্তি লাভই ভক্তের বা সাধ্যের কাম্য হওয়া উচিত নয়—কেন না মোক্ষবাঞ্ছা প্রবল হলে অন্তর হ'তে কৃষ্ণভক্তি দূর হয়।

॥ চট্টগ্রাম—রোসাঙের মুসলিম কবি ও কাব্য ॥

॥ এক ॥

॥ মুসলিম কবিগণের কাব্য-পটভূমি ও বাংলা কাব্যে নতুন-ধারার প্রবর্তনা ॥

শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে বাংলা সাহিত্য যখন একান্তভাবে দেব-দেবীর লীলা-ভূমি হ'য়ে উঠেছিল, দৈবী বিলাস-চিত্রনের উৎস-ক্ষেত্রে পরিণত ঠিক সেই সময় বাংলার সুদূর সীমান্ত চট্টগ্রাম-আরাকানেব (রোসাঙের) মুসলিম কবিগণের কাব্য-সাধনার মধ্যে শোনা গিয়েছিল আর এক নতুন সুরালাপন, ফুটে উঠেছিল দেব-বিনির্ভর বলিষ্ঠ লৌকিক প্রেম-কাহিনীর বর্ণ-সুষম চিত্র-সম্পদ। এ চিত্র-সম্পদ একান্তভাবে মানবীয় জীবনায়নেরই প্রতীক। এখানে দেব-দেবীর কোন স্থান ছিল না, তাঁদেব বিলাস-লীলায় এ কাহিনী সমাচ্ছন্ন নয়—এ কাহিনী একান্তভাবে বিশুদ্ধ মানব-প্রেমের ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রেমেব পথে মানব-জীবনে যে রোমান্স, যে যৌবন চাঞ্চল্য, যে ব্যাকুল আবেগ, যে বিরহ-বেদনা ফুটে ওঠে এ কাহিনী প্রেমের সেই বিচিত্র গতিভংগীব জীবন-রসটুকু পান করে শত ধাবায় বিকশিত হ'য়ে উঠেছে। এইভাবে চট্টগ্রাম রোসাঙের (আরাকানের) মুসলিম কবিগণের কাব্য-সাধনার মধ্য দিয়ে বাংলা কাব্য সাহিত্যের আর এক নতুন দিগন্তেব আববণ উন্মোচিত হয়। বৈষ্ণব কাব্য, মঙ্গল কাব্য কিংবা চরিত-সাহিত্যের দেবতা অথবা দেবোত্তম নরের চরিত্রাঙ্কনে নয়—মাটির মানুষের মনের কথা, প্রাণের ব্যথা নিয়েই এসব কাব্য মানবীয় সুরাল্পনায় সার্থক সৌন্দর্যলোকের সৃষ্টি করেছে। দেব-নির্ভর গাথা কাব্যের বুকে এ যেন দেব-বিনির্ভর মানবতার বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। চট্টগ্রাম রোসাঙের মুসলিম কবিদের শিল্প-প্রতিভার মূল বৈশিষ্টটুকু এখানে। যে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পটভূমিতে বসে এই উভয় দেশের মুসলিম কবিগণ কাব্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন এ প্রসঙ্গে তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাসটুকু জেনে নিলে কাব্যের মূল সুর অনুধাবন করা সহজ হ'বে। ইতিহাস

আলোচনা করলে জানা যায় বৃহত্তর বাংলা দেশের সাথে প্রত্যন্ত এই প্রদেশের বিষয় কোন প্রত্যক্ষ যোগসূত্র ছিল না। "এই অঞ্চল তখন আরাকান রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল। আরাকান পুর্ববঙ্গের সীমান্তবর্তী ব্রহ্মদেশের নিম্নাঞ্চলের একটি বিভাগ।" এই আরাকানীরা ছিলেন বর্মী। কিন্তু বর্মী হ'য়েও সাংস্কৃতিক মানের দিক দিয়ে এঁরা ঠিক খাঁটি বর্মী ছিলেন না। ভাষা, সাহিত্য, সমাজ, সংস্কার,সংস্কৃতি ইত্যাদি বিভিন্ন দিক দিয়ে এঁদের স্বাতন্ত্র্য লক্ষিতব্য। আবার চট্টগ্রাম বাংলার সাথে যুক্ত হ'লেও বৃহত্তর বঙ্গের সংস্কৃতির সাথে তার বিশেষ কোন যোগ ছিল না— বঙ্গ-সংস্কৃতি অপেক্ষা আরাকানী সংস্কৃতির সাথে তার ছিল ঘনিষ্ঠতা। সুতরাং চট্টগ্রাম আরাকানের সংস্কৃতিতে যুগ্মভাবে মিশেছে বর্মী ও বাঙালী সংস্কৃতি। তা' ছাড়া আরাকানের বৌদ্ধ-রাজারা বুদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন বলেই নিতান্ত ধর্মের খাতিরে পালি-প্রাকৃত ভাষার চর্চা তাঁদের করতেই হ'তো। এই পালিও প্রাকৃত ভাষার পথ বেয়ে আরাকানে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল বৃহত্তর ভারতবর্ষের আর্য সংস্কৃতি। এই আর্য-বর্মী বাঙালী সংস্কৃতির সাথে মিশেছিল মুসলিম সংস্কৃতি। প্রকৃতপক্ষে মুসলিম সংস্কৃতি ছিল এদেশের সংস্কৃতির প্রধান এবং প্রবল অংশ। দিল্লীর সিংহাসনে তখন মোঘল রাজ—উন্নতির স্বর্ণশিখরে তাঁরা সুপ্রতিষ্ঠিত, আর তাঁদের জীবণাচরণ হল তাঁদের সংস্কৃতিরই প্রতিবিম্ব। মোঘল বাদশা'দের বিলাস-ব্যসনের পথ বেয়ে মুসলিম সংস্কৃতিতে আকৃষ্ট হয় নি এমন জনসংখ্যা সে সময় নিখিল ভারতবর্ষ-ব্যাপী একটিও ছিল কিনা সন্দেহ। আরাকানীরাও এ সংস্কৃতিতে বিশেষরূপে প্রলুব্ধ হ'য়ে-ছিলেন তা' ছাড়াও বর্তমান কালের মত তখনও এই বঙ্গ-প্রত্যন্ত প্রদেশের অধিবাসীর'প্রধান অংশ ছিল বাংলাভাষী মুসলমান। ফরাসী চর্চা তাদের মধ্যে ছিল ব্যাপক। তাই নিয়তির মত অনিবার্য কারণে এদেশে মুসলিম সংস্কৃতির ব্যাপক এবং বহুল প্রসার ঘটে। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি এদেশের অধিবাসীদের মধ্যে যুগপৎ ছিল ভারতীয় আর্য এবং মুসলিম সংস্কৃতির চর্চা এবং চর্যা। এই উভয় সংস্কৃতির পরিচয় নিবিড় হ'য়ে ধরা পড়েছে এখানকার মুসলিম কবিকূলের কাব্যরচনায়।

একদিকে আছে পৌরাণিক সংস্কৃতি (চৈতন্য-সংস্কৃতি নয়) অন্যদিকে মুসলিম সংস্কৃতি—এই উভয় সংস্কৃতি হ'তে বেগ নিয়ে মুসলিম কবিগণ তাঁদের লৌকিক প্রেম-কাব্য-রচনায় আত্ম-নিয়োগ করেছিলেন। কাব্যের আলোচনায় একথা সুন্দররূপে প্রতীয়মান হ'বে।

আরাকান বা রোসাঙে বসে যাঁরা কাব্য রচনায় ব্যাপৃত হ'য়েছিলেন আজ পর্যন্ত তাঁদের মধ্যে আমরা এই পাঁচজনের নাম জান্‌তে পেরেছি। ক ॥ দৌলত কাজী। খ ॥ মরদন। গ॥ কোরেশী মাগন ঠাকুর। ঘ॥ মহাকবি আলাওল। ঙ ॥ আবদুল করীম খোন্দাকার। আর চট্টগ্রামের অসংখ্য কবিকূলের মধ্যে এই কজন প্রধান : ক ॥ সৈয়দ সুলতান। খ ॥ শেখ পরাণ। গ ॥ হাজী মহম্মদ। ঘ ॥ নসরুল্লামহ খাঁ। ঙ ॥ মুহম্মদখান। চ ॥ শেখ মুত্তলিব। ছ ॥ নওয়াজিশ খাঁ। জ ॥ করম আলী। ঝ ॥ আবদুল নবী। ঞ ॥ শেখ মনসুর। ট ॥ মহম্মদ উজীর আলি ইত্যাদি। নিম্নে আমরা এই কবিগণের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো।

॥ দুই ॥

॥ আরাকান বা রোসাঙের কবিকুলের কাব্যালোচনা

ক ॥ দৌলত কাজী—(আনুমানিক ১৬০০-১৬৩৮) : দৌলত কাজীর সৌভাগ্যে ঈর্ষা হয়। ঈর্ষা হওয়ারই কথা। মাত্র একখানি অসম্পূর্ণ কাব্য রচনা করে তিনি বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে এক চিরস্থায়ী গৌরবোজ্জ্বল আসন লাভ করেছেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আর কোন কবি এমন সৌভাগ্যবান বলে আমাদের জানা নেই। কবির এই কীর্তিসমুজ্জ্বল কাব্যটির পুর্ণ নাম সতীময়না ও লোর-চন্দ্রানী—সংক্ষেপে 'সতীময়না' অথবা 'লোরচন্দ্রানী'।

দৌলত কাজীর বাল্যজীবন বৈচিত্রময়। তাঁর জন্মস্থান নিয়ে পণ্ডিতকুলে সংশয় আছে কিন্তু "মুসলিম বাংলা সাহিত্যের" ঐতিহাসিক ডক্টর মহম্মদ এনামুল হক সাহেব স্পষ্টই ঘোষণা করেছেন "তিনি (কবি) চট্টগ্রামের রাউজান থানার অন্তর্গত সুলতানপুর গ্রামের কাজী বংশে জন্মগ্রহণ করেন।" কবি অল্প বয়সেই বিস্ময়কর পাণ্ডিত্যের অধিকারী হন কিন্তু

স্বদেশে তাঁর সমাদর না হওয়ায় তিনি আরাকান রাজদরবারে আসেন। আরাকানের রাজা তখন শ্রীসুধর্ম (১৬২২-১৬৩৮ খৃঃ) এই সুধর্মের 'সমর সচিব' এবং 'ধর্মপাত্র' ছিলেন আশরাফ খান। দৌলত কাজী এই আশরাফ খানের স্নেহচ্ছায়া ও অনুগ্রহ লাভ করেন। এঁরই নির্দেশ এবং প্রেরণায় কবি 'সতী ময়না' কাব্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু ভাগ্য বিরূপ—বিধি নির্দয়।

কাব্য অর্ধ সমাপ্ত রেখেই নিয়তির অনিবার্য আহ্বানে পরপারে যাত্রা করেন। এই অসম্পূর্ণ কাব্যটি সমাপ্ত করেন রোসাঙের আর এক মহাকবি আলাওল—সুদীর্ঘ কুড়ি বছর পরে। এই কাব্যের কাহিনীও কবির মৌলিক কল্পনা প্রসূত নয় ঠেঠ্ হিন্দী ভাষায় চৌপদি ও দোহার ছন্দে বিরচিত 'সাধন' নামক কোন হিন্দী কবির 'সতীময়না' কাহিনী শুন্‌তে শুন্‌তে আশরাফ খান এটাকে দেশীয় ভাষায় রূপ দিতে বলেন দৌলত কাজীকে। কাহিনী আপন কল্পনা প্রসূত নয় এমন কি কাব্যটিও অসম্পূর্ণ তা সত্ত্বেও কেবল রোসাঙের মুসলিম কবিদের মধ্যে নন সমগ্র বাংলা সাহিত্যের কয়েক জন শক্তিশালী কবির মধ্যে তিনি অন্যতম। যে বিরল কবিত্ব শক্তির জন্যে তিনি দুর্লভ সম্মানের অধিকারী হয়েছেন এবার আমরা সেই শক্তির মুল স্বরূপটির সাথে পরিচিত হতে চেষ্টা করব। আমরা পুর্বেই বলেছি রোসাঙের মুসলিম কবিগণের লৌকিক প্রেম গীতিগুলি মানবতার বিজয় গানে মুখর। কবি দৌলত কাজীর কাব্যের মুল কাহিনীর মধ্য দিয়ে তো বটেই উপরন্তু গ্রন্থারম্ভের মধ্য দিয়ে দেব-বিনির্ভর মানবতার সুরটি সুন্দর হয়ে ফুটেছে। এখানে ত্রিভুবনের প্রভুর স্তুতিগানের উপরে উঠেছে নর-সুন্দরের জয়গাথা ঃ

নিরঞ্জন-সৃষ্টি নর অমূল্য রতন। ত্রিভুবনে নাহি কেহ তাহার সমান ।।
নর বিনে চিন নাহি কেহ কিতাব কোরান। নর সে পরম দেব তন্ত্র মন্ত্র জ্ঞান
নর সে পরম দেব নর সে ঈশ্বর। নর বিনে ভেদ নাহি ঠাকুর কিঙ্কর ॥
তারাগণ শোভা দিল আকাশ মণ্ডল। নরজাতি দিয়া কৈল পৃথিবী উজ্জল ॥

মানবমহিমার এমন অকুণ্ঠ বিজয়গাথা বহুদিন পর দেখি রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ঃ

তুমি তো গড়েছ শুধু এ মাটির ধরণী তোমার
মিলাইয়া আলোকে আঁধার।
শূন্য হাতে সেথা মোরে রেখে
হাসিছ আপনি সেই শূন্যের আড়ালে গুপ্ত থেকে।
দিয়েছ আমার পরে ভার,
তোমার স্বর্গটি রচিবার। ॥ বলাকা ॥

কাব্যের কাহিনী আলোচনা করলেও এই মানব প্রীতি সুন্দর হয়ে ধরা পড়বে। কাব্যটি তিনখণ্ডে সম্পূর্ণ। ডক্টর মহম্মদ এনামূল হক কাব্যের প্রথম খণ্ডকে 'পরিচয় খণ্ড' দ্বিতীয় খণ্ডকে 'বিরহ খণ্ড, এবং তৃতীয় খণ্ডকে বলেছেন 'মিলন খণ্ড'।

প্রথম খণ্ডে কবি দিয়েছেন কাব্যের নায়ক-নায়িকাদের পরিচয়, এঁকেছেন দাম্পত্য জীবনের ছবি। নায়ক লোর অপূর্ব সুন্দরী ময়নাকে বিয়ে করে সুখে জীবন যাপন করেন। হঠাৎ একদিন রাণী ময়না বৃদ্ধ পাত্রদের হাতে রাজ্যভার দিয়ে তিনি বনে গমন করলেন। বনে এক যোগীর কাছে গোহারী রাজ-কন্যা চন্দ্রানীর প্রতিকৃতি দেখে লোর প্রলুব্ধ হন এবং রাজ-কন্যার সাথে মিলনের জন্যে গোহারী রাজ্যে গমন করেন। কিন্তু চন্দ্রানীর বিয়ে হয়েছিল অমিত বীর্যবান এক বামুনের সাথে। এ বামুন ছিল নপুংসক। ফলে যৌন অতৃপ্তির জন্যে চন্দ্রানী লোরের সাথে পালিয়ে আসেন। বামুনও পিছু নেয় কিন্তু গভীর জঙ্গলে লোরের সাথে সংগ্রামে বামুন নিহত হন। ইতিমধ্যে চন্দ্রানীর পিতা এসে উভয়কে আপন রাজ্যে নিয়ে গিয়ে বিয়ে দেন এবং রাজ্য শাসনের সমুদয় ভার লোর-চন্দ্রানীর হাতে অর্পণ করেন। এখানে প্রথম খণ্ড শেষ।

দ্বিতীয় খণ্ডের সুরু ময়নার অতলান্ত বিরহ-বর্ণনা দিয়ে। এই বিরহ-বর্ণনা শতধারায় উৎসারিত হয়েছে বারমাস্যার মধ্য দিয়ে। মাসে মাসে

ঋতুতে ঋতুতে প্রকৃতির পট পরিবর্তন চলে—সেই পরিবর্তনের সাথে সাথে বয়ে চলে ময়নার বিরহের ফল্গুপ্রবাহ। বিরহ কাতরা ময়নার দেহকান্তিতে প্রলুব্ধ হয় রাজপুত্র ছাতনা। রতনা মালিনীকে হাত করে ছাতনা তার কুৎসিত কামনা প্রকাশ করে ময়নার কাছে। ময়নার তখন বারমাসী দুঃখ বর্ণনা চলছে। একাদশ মাসের দুঃখ বর্ণনা শেষ হয়েছে (আষাঢ় হতে বৈশাখ) কেবল জ্যৈষ্ঠ মাসে পড়েছে এমন সময় দৌলতকাজীর কবিধর্ম স্তব্ধ হয়ে যায়। এরপর হ'তে অবশিষ্টাংশ রচনা করেন কবি আলাওল। ছাতনার দূতী রতনা মালিনী লাঞ্ছিতা হয়ে ফিরে আসেন সতী ময়নার নিকট হতে।

এরপর তৃতীয় খণ্ডের সুরু। এক সখীর পরামর্শে ময়না একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের হাতে একটি শুক পাখী দিয়ে রাজা লোরের কাছে পাঠান। ব্রাহ্মণ কৌশলে শুকপাখীর ইংগিতে লোরের হৃদয়ে ময়নার কথা জাগ্রত করতে সমর্থ হন। ইতিমধ্যে চন্দ্রাণীর একটি পুত্র হয়েছিল। সেই পুত্রের হাতে রাজ্যভার দিয়ে চন্দ্রাণীকে নিয়ে ময়নার কাছে ফিরে আসেন লোর এবং সুখে কাল যাপন করতে থাকে সকলে। এখানেই কাব্যের পরিসমাপ্তি।

অনেকে এ কাব্যের উপাখ্যান ভাগকে চমকপ্রদ মনে করেন না—কিন্তু এমন না মনে করার হেতু দেখি না। আমাদের মতে এ কাব্যের কাহিনী নিরন্ধ্র না হ'লেও জমাট। তবে লক্ষণীয় বিষয় এই আলাওল যেখান হ'তে হস্তক্ষেপ করেছেন সেখান হতে এ কাব্যের কাহিনী অনেকখানি শিথিল হয়ে গেছে। অন্ততঃ এ কাব্যে আলাওলের কবি প্রতিভা দৌলৎ কাজীর প্রতিভার সমকক্ষ নয়। আলাওল দৌলত কাজী অপেক্ষা অধিকতর পণ্ডিত ব্যক্তি কিন্তু অনুভবের গভীরতায় আলাওলের মনোভংগী দৌলত কাজীর নিম্নেই। তাই কাব্যের শেষাংশে কেবল বাক্য-জাল বিস্তার করে আলাওল যখন কাব্যের গতিকে শিথিল-স্রোতা করেছেন—অনুভূতির গভীরতায় এবং সরল অন্তস্পর্শী বাক্-বিন্যাসে দৌলত কাজী তখন সমগ্র কাব্যখানিকে করে তুলেছেন নাটকীয় সংঘাতে দ্বন্দ্ব-সংকুল। তা' ছাড়া টুক্‌রো টুক্‌রো বর্ণনার মাধ্যমে একটি

সম্পূর্ণ চিত্রকে পাঠক চিত্তে সঞ্চারিত করে দেওয়ার দুর্লভ ক্ষমতা ছিল দৌলত কাজীর—এই চিত্রাঙ্কনে আলাওল কাজী-কবির প্রতিভা-সীমাকে স্পর্শ করতে পারেননি। কাজী কবির অনুভূতি-গুণের সাথে মিশেছিল তাঁর প্রকাশ-ভংগীর রিজুতা। রিজু ভাষণেই তাঁর বক্তব্য পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করে গিয়েছে। কাব্যের মধ্যে ব্রজবুলির ব্যবহারে কাজী-কবি যে বিরল-বৈশিষ্ট্যের ও মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন আলাওলের পদে তা' নেই। রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-লীলার বাইরেও ব্রজবুলির সার্থক প্রয়োগ এবং প্রতিষ্ঠা হতে পারে আপনার অলোক-সামান্য প্রতিভা বলে কাজী- কবি তা' আমাদের দেখিয়েছেন। শ্রাবণ মাসের দুঃখ বর্ণনার সামান্য অংশ আমরা এখানে তুলে দিলাম। এই বারমাস্যার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় দাঁড়াবার মত বারমাস্যা বাংলা সাহিত্যে বোধহয় আর কোথাও নেই—এমন কি মুকুন্দ রামের বারমাস্যাও যেন এর পাশে অনেকখানি নির্জীব বলেই মনে হয়। শ্রাবণের অবিরল বারিধারায় সাথে নায়িকা হৃদয়ের বেদনার্তিটুকু যেন অভিনব রূপায়নায় বিধৃত। মেঘলা শাঙন-গগন যেন সতী ময়নার বিরহ-ম্লান প্রাণ-প্রদেশের প্রতিবিম্ব :

মালিনী কি কহিব বেদন-ওর
লোর বিনে বামহি বিধি ভেল মোর।
শাঙন-গগণ সঘন ঝরে নীর
তবে মোর না জুড়ায় এ তাপ শরীর।
মদন-অসিক জিনি বিজলীর রেহা
থরক এ যামিনী কম্পয় দেহা।

এ প্রসঙ্গে বৈষ্ণব-কবির 'রজনী শাঙণ ঘন ঘন দেওয়া গরজন' পদটির কথা মনে পড়বেই। রাধা-কৃষ্ণ-লীলা-চিত্রণের বাইরে ব্রজবুলির এমন সার্থক প্রয়োগ অন্যত্র বিরল।

আমরা পূর্বেই বলেছি সামান্য কথায় কাজী কবি একটি সম্পূর্ণ চিত্রকে পাঠক-চিত্তে সঞ্চারিত করে দিতে পারেন। নিম্নের সামান্য কয়েকটি

পংক্তির মধ্যে ময়নার সতীত্ব এবং দুর্লভ স্বামী-প্রেমকে কি অদ্ভুত ভাবেই না তুলে ধরেছেন ঃ

না বোল না বোল ধাই অনুচিত বোল
আন পুরুষ নহে লোর সমতুল।
লাখ পুরুষ নহে লোরের স্বরূপ
কোথায় গোময় কীট কোথায় মধুপ।

এই তো দৌলত কাজীর স্বরূপ—তাঁর বৈশিষ্ট্য। সরল, অনাড়ম্বর ভাষা অথচ কি বিপুল তার বেগ!

বহুক্ষেত্রে কবির বাস্তব অভিজ্ঞতা সুন্দর রূপ পেয়েছে। বৃদ্ধা নারীর পরিণতি ঃ

বৃদ্ধ হৈলে নারী　　যুবকের বৈরী
ফিরি তাকে না পুছারি
যাইব যৌবন　　নিশির স্বপন
জীবন দিবস চারি।

কবি সুফী মতাবলম্বী ছিলেন—মাঝে মাঝে সুফী মতেরও প্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু এসব একান্ত গৌণ—চল্‌তি পথে কুড়িয়ে পাওয়া বনফুল। লৌকিক গাথা-কাব্যে মানবীর সুরটি কোথাও সমাচ্ছন্ন হয়নি। লোর চন্দ্রাণীর লীলা-চাপল্য ও কেলি-বিলাসকে অতিক্রম করে প্রধান হ'য়ে উঠেছে সতী-ময়নার জীবনচারণার চিত্র-সম্পদ। মানবীয় অবদানটিই এ কাব্যের মুখ্য রাগিণী। দৌলত কাজীর বীণা-যন্ত্রে সে রাগিণী অপূর্ব মীড় রচনা করেছে।

খ॥ মরদন আনুমানিক ১৬০০-১৬৪৫) ঃ রোসাঙের দ্বিতীয় লৌকিক প্রেম-গাথার কবি মরদন দৌলত কাজীর সমসাময়িক ছিলেন। এর একটি মাত্র কাব্য “নসীরা-নামা” রাজা সুধর্মের পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত হয়। এঁর কাহিনীটি মৌলিক। 'অদৃষ্টলিপি অখণ্ডনীয়—এই কথাই কাব্যটির প্রতিপাদ্য বিষয়। আবদুল করীম ও আবদুল নবী নামক দুই বণিক-বন্ধু পরস্পর বৈবাহিক বা বেয়াই হইবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল।

আবদুল করীমের কন্যার নাম নসীরা বিবি এবং আবদুল নবীর পুত্রের নাম আবদুল সবীর। ঘটনাক্রমে দুই হবু বৈবাহিকের মধ্যে আবদুল করীমের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে এবং নসীরার সাথে সবীরের বিবাহ প্রস্তাব ভেঙে যায়। এতে আবদুল করীম অপমানিত মনে করে। তার স্ত্রী স্বামীকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে 'অদৃষ্টলিপি অখণ্ডনীয়' এই কথাটি গল্পের সাহায্যে অবতারণা করে। এইভাবে কাব্যটি গড়ে উঠলেও পরে আবদুল করীমের ভাগ্য ফিরে যায় এবং নসীরার সাথে সবীরের বিয়ে হয়।' এই হল কাহিনীর বক্তব্য। বলিষ্ঠ কোন কবি-ব্যক্তিত্বের পরিচয় এতে নেই, প্রকাশ-ভংগীতেও কোন বিশিষ্টতা ফুটে ওঠেনি। তবে লক্ষ্য করা উচিত কাহিনীটি সম্পূর্ণ লৌকিক ধারার অনুগামী। লৌকিক প্রেমই এ কাহিনীর গতিপথে তীব্র বেগ-সঞ্চার করেছে।

গ ॥ কোরেশী মাগন ঠাকুর (আনুমানিক ১৬০০-১৬৬০) ঃ

রোসাঙের তৃতীয় মুসলিম কবি। নামের শেষে "ঠাকুর" শব্দটি যুক্ত থাকায় ডক্টর সুকুমার সেন এঁকে অমুসলিম বলে সন্দেহ করেছেন কিন্তু ডক্টর এনামুল হক স্পষ্ট প্রমাণ করেছেন যে ইনি মুসলমান। ডক্টর হকের ভাষায় "মহাকবি আলাওলের আশ্রয়দাতা 'মাগন ঠাকুর' এবং 'চন্দ্রাবতী' কাব্য প্রণেতা 'মাগন, বা 'কোরেশী মাগন' এক ব্যক্তি। তিনি আরাকানের অধিবাসী ছিলেন। তিনি কোরেশ বংশজাত সিদ্দীকী গোত্রভুক্ত মুসলমান ছিলেন। তাঁহার প্রকৃত নাম কি ছিল তাহা জানা যায় না। 'মাগন' তাঁহার ডাক নাম মাত্র। তাঁহার নিঃসন্তান মাতাপিতা আল্লার নিকট বহু আরাধনা করিয়া, আল্লার কাছ হইতে মাগিয়া তাঁহাকে লাভ করেন, এই জন্য তিনি 'মাগন' নামে অভিহিত হইতেন। স্বয়ং আলাওল মাগন ঠাকুর সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, তাঁহার ন্যায় নানা গুণশালী মনীষী তৎকালে রোসাঙে ছিলেন না তিনি আরবী, ফারসী, বর্মী ও সংস্কৃত ভাষা জানিতেন। বাংলা ভাষায় তাঁহার কতখানি অধিকার ছিল 'চন্দ্রাবতী, কাব্যই তাঁহার জ্বলন্ত নিদর্শন। তিনি সংগীত, নাট্য, কাব্য ও অলংকার শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন।

১৬৬০ খৃষ্টাব্দে আরাকানেই পরিণত বয়সে তাঁর মৃত্যু হয় এবং তিনি তথায় সমাহিত হ'ন।"

মাগনের একটি মাত্র কাব্য 'চন্দ্রাবতী'। কিন্তু এ কাব্যটিতে লৌকিক কাহিনীর আবরণে রূপকথার গল্প বিন্যাস করা হ'য়েছে। ভদ্রাবতী নগরের রাজপুত্র বীরভান এবং সিংহলদ্বীপের রাজকন্যা চন্দ্রাবতী এ কাব্যের নায়ক-নায়িকা। রূপ এবং বীর্যের কথা শুনে উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন। ফলে নায়ক 'জালিয়া', 'গোবার', 'ডিঙ্গা', ইত্যাদি সহস্র নৌকাসহ সিংহল-যাত্রা করেন। এবং তথায় বহু দুর্বিপাকের ভিতর দিয়ে অবশেষে চন্দ্রাবতীকে বিয়ে করেন।

এ কাব্যটিরও কোন বিশিষ্টতা নেই। রূপকথা সুলভ কয়েকটি অসম্ভব ঘটনা কাব্যটিকে অবাস্তব করে ফেলেছে। লক্ষ্মীর বিষয় এ কাব্যেও উদ্ভব কিন্তু লৌকিক প্রেমের পটভূমিতেই।

ঘ॥ মহাকবি আলাওল (আনুমানিক ১৬০৭-১৬৮০): এই সুপণ্ডিত বর্ষীয়ান কবি সমগ্র বাংলা সাহিত্যের কবিকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং রোসাঙের মুস্‌লিম কবিদের মধ্যে তো বটেই, সমগ্র বাংলা সাহিত্যের মুসলিম কবিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। তিনি একাধারে পণ্ডিত এবং প্রবীণ, বর্ষীয়ান এবং বিদ্বান। তিনি বহু ভাষাবিদ্ এবং বহু গ্রন্থ প্রণেতাও। এত অধিক পরিমাণ গ্রন্থ প্রাচীন বাংলার আর কোন কবিই প্রণয়ন করেন নি। কাব্যের বিষয়-বস্তুও তাঁর বহু বিচিত্র। তিনি কেবল লৌকিক প্রেম-গাথা রচনায় আপনার বিপুল কাব্য-প্রতিভাকে আবদ্ধ রাখেননি—লৌকিক প্রেম-কাব্যের সাথে লিখেছেন ধর্মীয় গ্রন্থ। ইস্‌লামী সংস্কৃতির সাথে রচনা করেছেন রাধাকৃষ্ণ লীলা-বিষয়ক পদাবলী। সুতরাং এই বহু বিচিত্র প্রতিভার সাথে বাংলার খুব কম কবিই প্রতিযোগিতায় নামার স্পর্ধা রাখে।

কবির জীবন-কাহিনী বৈচিত্র্যময় এবং ঘটনাবহুল। সংক্ষেপে তাঁর জীবনের ঘটনা-পঞ্জীকে এইভাবে উপস্থাপিত করা যেতে পারে: ১৬০৭ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী থানার 'জোবরা'

নামক গ্রামে আলাওলের জন্ম হয়—ডক্টর এনামুল হকের সংশয়হীন এই মত কতটুকু সত্য সে বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট মতদ্বৈতার সম্ভাবনা আছে। যা' হোক সন তারিখ আর জন্মস্থান নিয়ে বিবাদে আমাদের কোন লাভ নেই। আমরা অতি সংক্ষেপে কবির ঘটনা-বহুল জীবনটি জেনে নিতে চেষ্টা করব। কোন সময় ঘটনা উপলক্ষে কবি এবং তাঁর পিতা ফতেয়াবাদ হ'তে জলপথে কোথাও যাচ্ছিলেন—পথিমধ্যে ফিরিঙ্গী জলদস্যু কর্তৃক তাঁরা আক্রান্ত হন এবং কবির পিতা শহীদ হন। কবি কোন ক্রমে প্রাণ নিয়ে আরাকান রাজদরবারে আসেন এবং রাজ আসোয়ার (Royal Body Guard) বা রাজ-দেহরক্ষী অশ্বারোহী দলে ভর্তি হন। এখানে "মুখ্যপাটেশ্বরীরঅমাত্য মহাজন" "পণ্ডিত মাগন ঠাকুরের অযাচিত অনুগ্রহ লাভ ক'রে কবি তাঁরই নির্দেশে 'পদ্মাবতী,' রচনা করেন। কবির দ্বিতীয় কাব্য 'সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জমাল'। এটিরও রচনা আরম্ভ হয় মাগন ঠাকুরের নির্দেশে কিন্তু গ্রন্থ সমাপ্তির পুর্বে মাগনের দেহান্তর ঘটে। তারপর কবি সোলেমানের অনুগ্রহে তাঁর আশ্রমে থেকে এবং তাঁর নির্দেশে দৌলত কাজীর 'সতী ময়না' বা লোর-চন্দ্রানীর উত্তরাংশের রচনা সমাপ্ত করেন। 'হপ্তপয়কর' কাব্যটিও রচিত হয় এই সময় সেনাপতি সৈয়দ মহম্মদ-এর অনুরোধে। এরপর আলাওলের জীবনে আসে নতুন দুর্যোগ। এ সময় ঔরঙ্গজেবের ভয়ে শাহসুজা আসেন রোসাঙে কিন্তু কিছুদিন আনন্দে বসবাস করার পর শাহ-সুজা রোসাঙ-রাজের বিরাগ-ভাজন হয়ে কষ্টের মধ্যে পড়েন। 'মৃজা' নামে কোন লোক আলাওলের বিরুদ্ধে রোসাঙ রাজের নিকট বলেন ফলে কবিকে পঞ্চাশ দিন "গর্ভবাস যন্ত্রনা ভোগ করতে হয়। অবশেষে আলাওলের নির্দোষিতা প্রমাণিত হয় এবং সৈয়দ মামুদ শাহার অনুগ্রহ লাভ করে তাঁরই নির্দেশে 'সয়ফুল-মুলুক বদিউজ্জমাল" এর উত্তরাংশ রচনা করে গ্রন্থটি সম্পূর্ণ করেন। এরপর স্বয়ং রাজা চন্দ্রসুধর্মার আদেশে কবি আর একটি নূতন কাব্য "সিকন্দার নামা" রচনা করেন। অতএব কবির গ্রন্থ সংখ্যা দাঁড়াল মোট ছয়খানা।। যথা : ক।। পদ্মাবতী খ। সতী ময়না বা লোর চন্দ্রানী

(উত্তরাংশ) গ ॥ হপ্ত পয়কর ঘ ॥ তোহফা ঙ ॥ সয়ফুল্‌-মুলুক্‌ বদিউজ্জমাল চ ॥ সিকান্দর নামা।

ক ॥ পদ্মাবতী ঃ এটি কবির মৌলিক রচনা নয়। বিখ্যাত হিন্দী কবি মহম্মদ্‌ জায়সীর 'পদুমাবৎ' কাব্যকে অবলম্বন করেই কবি এ কাব্য রচনা করেন '

এটি রূপক-কাব্য কিন্তু এর কেন্দ্রিয় ঘটনাগুলি ঐতিহাসিক সত্য। চিতোরের রাণী পদ্মাবতী এবং দিল্লী-সম্রাট আলাউদ্দীনের প্রেমকাহিনী এবং যুদ্ধ-বিগ্রহের ওপর কাব্যটি গড়ে উঠেছে। এ কাব্যটি পদুমাবৎ-এর অনুকরণে রচিত হ'লেও এর মধ্যে কবির কল্পনাও মিশে আছে যথেষ্ট। প্রয়োজন মত তিনি মূল গ্রন্থের কিছু অংশ বাদ দিয়েছেন আবার কোন অংশ বা নতুনরূপে সংযোজিত করেছেন আবার মূলগ্রন্থের কোন সংক্ষিপ্ত অংশকে তিনি আপনার অলোকসামান্য প্রতিভাবলে অপূর্ব ব্যঞ্জনালোকে তুলে ধরেছেন। বলাবাহুল্য এই পরিবর্তন এবং পরিবর্ধনে কাব্যের তো কোন অঙ্গহানি হয়নি বরং রূপ-লাবণ্যে অধিকতর ঝলকিত হয়ে উঠেছে। উদাহরণ স্বরূপে বলা যায় 'সাতসমুদ্র খণ্ড' এবং "স্ত্রী-ভেদবর্ণন-খণ্ড"দুটি আপনগ্রন্থ হতে বর্জন করে কবি ভালই করেছেন। পদ্মাবতী যখন সখীদের নিকট হ'তে বিদায় নিয়ে স্বামীগৃহে যাত্রা করছেন সে সময়কার বর্ণনায় পরিবর্ধনের মাধ্যমে কবি আলাওল যথেষ্ট মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। এ অংশটি আন্তরিকতার গুণে বাস্তব এবং ক্রন্দন-সিক্ত হ'য়ে উঠেছে—মূল হ'তে তো উত্তম বটেই। পদ্মাবতীর সখিদের নিকট বিদায় প্রার্থনা ঃ

গমনের কাল নিকট হইল। পদ্মাবতী সব সখীগণ আনাইল ॥....
একে একে গলে ধরি কান্দে বারবালা। সকল ছাড়িয়া আমি যাইব একেলা
তোমরা সবেরে কোন মনে পাশরিব। স্মরণ হইলে মতে জ্বলিয়া মরিব ॥
শুন প্রাণ সখী আমি চলি যাব যথা। তথা গেলে পুনি ফিরি না আসিব এথা
যেই দিন লাগি সখী মনে ছিল ভীত। সেই দিন আসি আজি হৈল উপস্থিত

পরদেশী হৈল বলি দয়া না ছাড়িও। অবশ্য বারেক মোরে স্মরণ করিও ॥
তুমি সব ভাগ্যবতী রহিলা স্বদেশে। মোর মনে রহিলেক এ জনম ক্লেশে ॥

এখানে কবির স্বদেশ প্রীতিটুকুও লক্ষ্য করার মত। এ অংশটুকু পাঠ করতে করতে শকুন্তলার বিদায়-দৃশ্যের কথা মনে পড়বেই।

কাব্যের সমাপ্তিতে কবি এ কাব্যের রূপক-ব্যঞ্জনার আধ্যাত্মিকতাটুকু সুন্দর রূপে তুলে ধরেছেনঃ "চৌদ্দ ভুবনের সব কিছু আছে মানুষের ঘটে। চিতোর হইতেছে মানব-দেহ, রাজা রত্নসেন মন, সিংহল হৃদয়, পদ্মাবতী বুদ্ধি, শুক পথ নির্দেশকারীগুরু, রত্নসেনের প্রথম পত্নী নাগমতী ঢুনিয়া ধান্ধা রাঘবচেতন শয়তান, আলাউদ্দীন-সুলতান মায়া"। কিন্তু এ রূপকটুকু দেওয়াতেও লৌকিক প্রেমের অবদান ক্ষুণ্ণ হয়নি। প্রকৃত পক্ষে এ কাব্যের একটি ধর্ম-নিরপেক্ষ লৌকিক আবেদন আছে। নায়ক-নায়িকা নামে মাত্র রাজা অথবা রাণী কিন্তু বর্ণনার সর্বত্রই মাটির মানুষের কথা বাঙ্ময় হ'য়ে উঠেছে।

আমরা পূর্বেই বলেছি কবি ছিলেন বহুভাষাবিদ পণ্ডিত। এ গ্রন্থের বাংলার সাথে বর্মী, আরবী, ফার্সী, জ্ঞান তো বটেই উপরন্তু আছে সংস্কৃতে রচিত ধর্ম-অলংকার-পুরাণ শাস্ত্রাদির ওপর কবির গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয়। আর একটি বিষয় লক্ষণীয় এ কাব্যে মুস্‌লিম সংস্কৃতির সাথে হিন্দু-সংস্কৃতিটুকু যেন সুন্দর ভাবে মিলে গেছে। এক বৃন্তে দুই পুষ্পের মত একে অপরের পরি-পূরক হ'য়ে উঠেছে। এটি কবির হিন্দু-মুস্‌লিম মিলনাকাঙ্খার বহিঃপ্রকাশ। প্রেমকেই কবি এ কাব্যের মূলীভূত শক্তিরূপে ধরেছেন। প্রেমের ওপর কবির আছে আস্থা—প্রেমই সব। গ্রন্থারম্ভেই প্রেমের ওপর এই নিশ্চল-নিষ্ঠার পরিচয়টুকু সুন্দর রূপে তুলে ধরেছেন কবি ঃ

যার ভাব রস দেশ সুক্ষ্ম মোক্ষ কাম ॥
প্রেম হন্তে সকল যতেক হৈল নাম ॥

প্রেম হস্তে পুত্রদারা প্রেম গৃহবাস ॥
প্রেমেতে ধৈর্যতারূপ প্রেমেত্তে উদাস ॥
প্রেম মূল ত্রিভুবন যত চরাচর ।
প্রেম তুল্য বস্তু নাই পৃথিবী ভিতর ।
প্রেম কবি আলাওল প্রভুর ভাবক ।
অন্তরে প্রবল পুণ্য প্রভুর আসোক ॥....
প্রেম পুথি পদ্মাবতী রচিতে আশায় ।
অসাধ্য সাধন মোর গুরু কৃপায় ॥

কাব্যটি প্রেম-কাব্য তো বটেই, প্রেমের পবিত্রা পরিস্ফুটনের সাথে সাথে প্রতি পদে পদে ফুটে উঠেছে কবির কবিত্ব, পাণ্ডিত্য, অদ্ভুত মনীষা ও ধীশক্তির পরিচয়। কাব্যটি নিঃসন্দেহে কবিব শ্রেষ্ঠ রচনা। সমগ্র মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যেব একটি অমূল্য সম্পদ।

খ ।। সতী ময়না বা লোর-চন্দ্রানী : পুর্বেই বলেছি এ কাব্যটি সম্পূর্ণ কবির নিজস্ব নয়—দৌলত কাজীর অবরুদ্ধ কাজই আলাওলের আরব্ধ। মূল কাব্য রচনার সুদীর্ঘ কুড়ি বছর পর কবি উত্তরাংশ রচনা করে গ্রন্থটির পুর্ণাবয়ব দান করেন। এ কাব্যে আলাওলের বিশেষ কোন কলাকৃতির পরিচয় নেই।

পাণ্ডিত্যে নয় কিন্তু কলা কৃতির দিক দিয়ে আলাওল অপেক্ষা দৌলত কাজী নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ।

গ ।। হপ্ত-পয়কর : এ কাব্যের উপাদান কবি সংগ্রহ করেছেন ফারসী কাব্য হ'তে। ফারসীতে কবি নিজামী রচিত 'হপ্ত-পৈকর' কাব্যটিই কবির কাব্যের উৎস-ভূমি। হপ্ত-পয়করে আছে হপ্ত বা সপ্ত পয়কর। পয়কর অর্থে গল্প। সাত রাজকন্যার মুখ দিয়ে এ সাতটি গল্প বর্ণিত হ'য়েছে। এক সপ্তাহের শনিবার হতে আরম্ভ করে অপর সপ্তাহের শুক্রবার এই সাত দিনে মোট সাতটি গল্প সমাপ্ত হ'য়েছে। গল্প গুলির কোন মৌলিক বিশিষ্টতা নেই। নিছক আনন্দদানই বোধহয় এর উদ্দেশ্য। প্রাসঙ্গিক রূপে নীতিকথা ও উপদেশ আছে যথেষ্ট।

ঘ ।। তোহ্‌ফাঃ এটি গাথা-কাহিনী কাব্য নয়—ধর্মীয় উপদেশের গ্রন্থ। এটিরও ভাব-উৎস ফারসী কাব্য। ফারসী ভাষায় "তোহ্‌ফা" লেখেন ক'বি ইউসুফ গদা। আলাওল ২৭৮ বৎসর পর কাব্যটির ভাষানুবাদ করেন।

ঙ ।। সায়ফুল-মূলক বদিউজ্জমাল্‌ কাব্যটিও কবির মৌলিক রচনা নয়—এটিও ফারসী গ্রন্থের অনুবাদ। গ্রন্থটির দুই-তৃতীয়াংশ রচনার পরে কবি গ্রন্থটির অবশিষ্টাংশ সমাপ্ত করেন। ফলে প্রথমাংশের রস-মাধুর্য শেষাংশে নেই। শেষাংশে কাহিনীর জমাটত্ব অনেকখানি শিথিল হ'য়ে গেছে। কাহিনী অংশ অবাস্তব। মিশরের রাজপুত্র সয়ফুল-মুলক্‌ এর-সাথে পরী রাজ্যের সুন্দরী নায়িকা বদিউজ্জমালের পুর্বরাগ, প্রেম এবং মিলনের মধ্যেই কাহিনার উৎস-ভূমি, পরিণতি এবং সমাপ্তি। এতে অনেক আজগুবি গল্পের অবতারণা আছে। তবে আলাওলের স্ব-জাত পাণ্ডিত্য এবং কবিত্ব লক্ষণীয়।

চ ।। সিকান্দর নামা কবির সর্বশেষ রচনা। এটিও ফারসী কাব্যের অনুবাদ। ইতিহাসের কীর্তিখ্যাত বীর আলেকজাণ্ডারের অপর নাম ছিল সিকান্দার বা সেকেন্দর। এ কাব্যে তাঁরই দিগ্বিজয়ের কাহিনী অলংকার-সুষম গুরুগম্ভীর ভাষায় বর্ণিত হয়েছে।

এ ছাড়াও আলাওল বহু বৈষ্ণব-পদ রচনা করেছেন। "বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলিম কবি ও কাব্য" অধ্যায়ে আমরা আলাওলের বৈষ্ণব কাব্য নিয়ে আলোচনা করেছি। এ অংশের সাথে সেটুকু মিলিয়ে পাঠ করলে বৈষ্ণবপদ বচনায় আলাওলের কৃতিত্ব ধরা পড়বে।

সবশেষে আলাওল-সম্পর্কে আর একটি কথা বলা যেতে পারে। উপরের আলোচনায় আমরা লক্ষ্য করেছি আলাওলের কোন কাব্যই মৌলিক কল্পনা-প্রসুত নয়, প্রত্যেকটিই অনুবাদ। কিন্তু এই অনুবাদের মধ্যেও কবি তাঁর কবিত্ব-শক্তির জীয়ন-কাঠির স্পর্শ এমন ভাবে বুলিয়েছেন যে অনুবাদ কাব্যই মৌলিক-সৃষ্টির পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। অনুবাদের কোন আড়ষ্টতা নেই এমনকি কোন বিজাতীয় ভাব পর্য্যন্ত

নেই—এক সরল স্বাভাবিক নিটোল সৌন্দর্যের প্রতীক হ'য়ে কাব্যগুলি বিকশিত হয়ে উঠেছে। ভাষায় পাণ্ডিত্যের সাথে কবিত্বের, সারল্যের সাথে গাম্ভীর্য্যের অদ্ভুত সংমিশ্রণ ঘটেছে। বহুমুখী প্রতিভার সাথে দুর্লভ কবিত্বের স্পর্শ এবং ভাষার ওজস্বিতা মিশে আলাওলের কাব্যকে করে তুলেছে অনন্য-সুন্দর।

ঙ।। আবদুল করীম খোন্দকার: ইনি আরাকানের অধিবাসী। এঁর কাব্যগুলিব মধ্যে 'দুল্লা মজলিস', 'হাজার মসাইল' এবং 'নূর-নামা' প্রধান। 'দুল্লা মজলিসের' পুর্ণ গ্রন্থটি পাওয়া যায় নি—খণ্ডিতাকাবে আবিষ্কৃত হয়েছে। দুল্লা মজলিস এবং নূর-নামা মুসলিম মণীষী ও অলিআউলিয়াগণেব জীবনী গ্রন্থ। তবে লক্ষণীয় বিষয় আরাকানের কবিদের কাব্যে লৌকিক প্রেমগাথা রচনার যে প্রয়াস চলে এসেছিল তা এঁর কাব্যে নেই। এঁর সব কটি কাব্যই ধর্মীয় আবেদন-যুক্ত।

।। তিন ।।

।। চট্টগ্রামের কবিকুলের কাব্যালোচনা ।।

পুর্বে আমরা চট্টগ্রামের কবিকুলের যে সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রস্তুত করেছি এখানে তাঁদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র আলোচনা সম্ভব নয়। এখানে আমরা দু'জন প্রতিনিধি স্থানীয় কবির কাব্যালোচনা করব। অন্যান্য পরিচয় জানার জন্য উৎসুক পাঠক ডক্টর এনামুল হকের "মুসলিম বাংলা সাহিত্য" পড়তে পারেন।

ক।। সৈয়দ সুলতান (আনুমানিক ১৫৫০—১৬৪৮ খৃঃ): চট্টগ্রামের অন্তর্গত পরাগলপুরেআনুঃ১৫৫০খৃঃকবি জন্মগ্রহণকরেন। বাংলাসাহিত্যে প্রাচীন কবিদের মধ্যে সৈয়দ সুলতানের এক বিশিষ্ট স্থান আছে। কবির সঠিক কবি-কর্ম এতদিন অজ্ঞাত ছিল। সম্প্রতি ডক্টর এনামুল হক কর্তৃক "মুসলিম বাংলা সাহিত্যের" ইতিহাসে কবির কাব্যগুলির একটি তালিকা এবং প্রমাণাদি সহ প্রতিটি গ্রন্থের যে বিবরণ প্রকাশিত

হয়েছে তা' দেখে কবির প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে। আয়তনে প্রায় প্রতিটি কাব্যই বিশাল—কোন কোনটি আবার বিষয় বস্তুর প্রাচুর্য ও বর্ণনা ভংগীর রিজু বলিষ্ঠতা নিয়ে মহাকাব্যের প্রান্তসীমা স্পর্শ করেছে। নিম্নে তাঁর রচিত কাব্য গুলি দেওয়া হ'ল ঃ

ক ।। নবীবংশ। খ ।। শব্-ই-মিরাজ। গ ।। রসুল-বিজয়। ঘ ।। ওফাৎ-ই-রসুল। ঙ ।। ইব্লিস্-নামা। চ ।। জ্ঞান-চৌতিশা। ছ ।। জ্ঞান-প্রদীপ। জ ।। জয়কুম-রাজার লড়াই। ঝ ।। মারফতি গান। ঞ ।। পদাবলী

প্রথম সাতখানি গ্রন্থই ধর্মীয় বিষয়ক। 'নবী-বংশ' সম্পর্কে ডক্টর হক সাহেব বলেছেন"কবি সৈয়দ সুলতানের গ্রন্থগুলির মধ্যে 'নবী-বংশ' কাব-টিকে ম্যাগ্নাম্ ওপাস (Magnum opus) বা কবির শ্রেষ্ঠ বৃহত্তম গ্রন্থ বলিতে পারা যায়। ইহা বিষয়-বৈচিত্র ও আকারে সপ্তকাণ্ড 'রামায়ন'কেও হার মানাইয়াছে। এই কাব্যটিকে বাংলা মহাকাব্যের একটি মহান আদর্শ বলা চলে"। নবীবংশে কবি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, এবং কৃষ্ণকে নবী রূপে কল্পনা করেছেন। ইসলাম-বিরোধী এই কল্পনা কবির উদার মনোভংগীরই পরিচায়ক। কবির পক্ষে এ এক দুঃসাহিক অবদান। "শব-ই মিরাজ" গ্রন্থে কবি বর্ণনা করেছেন হজরত মহম্মদের বেহেস্তে পরিভ্রমণের ঘটনা। "ওফাৎ-ই-রসুল" গ্রন্থে আছে হজরতের মৃত্যু-দৃশ্যের করুণ বর্ণনা। "ইবলিস নামা" গ্রন্থে আছে শয়তানের অপকীর্তির কথা। "জ্ঞান চৌতিশা" এবং "জ্ঞান প্রদীপ" এ দুখানি গ্রন্থেই তান্ত্রিক যোগ সাধনার কথা লিপিবদ্ধ হ'য়েছে। সৈয়দ সুলতানের রাধা-কৃষ্ণ-লীলা বিষয়ক পদগুলিতে সুগভীর আত্মতন্ময়তার আভাস ফুটেছে। "বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলিম কবি ও কাব্যের" অধ্যায়ে আমরা কবির বৈষ্ণব মনোভংগীর আলোচনা করেছি। এখানে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

এঁর কয়েকটি পদে চর্যায় সাংকেতিক-ধর্মী রচনা ও ভাব-ব্যঞ্জনার আভাস আছে ঃ

কাহে কাহে ধনি বাগ বানায়া।
দুনিয়া মিছে ধান্দা লাগায়া ॥

এখানে সৈয়দ সুলতানের কবি-কর্ম সম্পর্কে একটি কথা বলা যেতে পারে। কবির সমুদয় কাব্য ইসলাম ধর্মীয় আবেদন-যুক্ত হলেও প্রতিটি কাব্যের মধ্যে হিন্দু-মুসলিম সমন্বয়-আকাঙ্খাটি ব্যাকুলভাবে ফুটে উঠেছে। বাংলাভাষায় ইসলাম ধর্মের তত্ত্বকথা প্রচার করা এবং হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটানই ছিল কবির হৃদয়াকাঙ্খা। কবি আলাওয়ালের মত তিনি একাধারে ছিলেন বিদ্বান এবং বর্ষীয়ান, সাধক এবং তত্ত্বজ্ঞানী। দুর্লভ কবিত্বশক্তির সাথে এই বহুমুখী প্রতিভার সংমিশ্রণ ঘটায় সৈয়দ কবির কাব্যগুলি বাঙালীপ্রাণের সামগ্রী হয়ে উঠেছে।

খ।। মহম্মদ খান (আনুমানিক ১৫৮০—১৬৫০)ঃ মহম্মদ খান সপ্তদশ শতাব্দীর কীর্তি-খ্যাত মুসলিম কবি। কবির নিবাস ছিল চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানায়। তাঁর পিতার নাম মুবারিজ খান, পিতামহ জালাল খান প্রপিতামহ নসরৎ খান।

আজ পর্য্যন্ত কবির চারখানি গ্রন্থেব পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। যথাঃ ক।। সত্যকাল-বিবাদ সংবাদ। খ।। হানিফার লড়াই। গ।। মকতুল-হুসৈন। ঘ।। কিয়ামত-নামা। আসহাব নামা, দজ্জাল নামা এবং কাসিমের লড়াই বলে যে তিনখানি গ্রন্থ পৃথক ভাবে প্রচলিত আসলে এগুলি স্বতন্ত্র কাব্য নয়—মক্তুল হুসৈন অথবা কিয়ামত নামার অংশ।

মক্তুল হুসৈন কবির শ্রেষ্ঠ রচনা। এই গ্রন্থখানির পরিচয় দিতে গিয়ে ডক্টর হক সাহেব বলেছেন "ইহাই কবিব, ম্যাগনাম ওপাস বা শ্রেষ্ঠ কাব্য। বহুদিন পুর্বে কলিকাতার বটতলায় এই পুস্তক ছাপা হইয়াছিল। এখন এই মুদ্রিত পুঁথিটিও পাওয়া যায় না। ইহাতে কারবালার ঐতিহাসিক কাহিনীটিই বিবৃত হয়েছে। চট্টগ্রাম অঞ্চলে এমন দিনও গিয়াছে, এই 'মক্তুল হুসৈন' মহরমের সময় ঘরে ঘরে সুর করিয়া দল বাঁধিয়া পড়া হইত। এখনও কোথাও কোথাও হইয়া থাকে। বিষয়টি যতখানি ঐতিহাসিক, কাব্যে ততখানি ঐতিহাসিকতা রক্ষিত হয় নাই। বোধহয় তজ্জন্যই ইহাতে কাব্যরস বিশদ রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সত্যই কাব্যখানি করুণ রসের অফুরন্ত ভাণ্ডার।

বিস্তারিত সূচীপত্র

চর্যাপদ ঃ

জয়দেব ও বাংলা সাহিত্য ঃ

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ঃ

বৈষ্ণব পদাবলী ঃ

চণ্ডীদাস ঃ

বিদ্যাপতি ঃ

গোবিন্দদাস কবিরাজ ঃ

জ্ঞানদাস ঃ

মহাজন চতুষ্টয় :

মঙ্গলকাব্য :

মৈমনসিংহ-গীতিকা ঃ

গ্রন্থ-তালিকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—আধুনিক সাহিত্য।

ডক্টর মহম্মদ শহীদুল্লাহ—বিদ্যাপতি-শতক, বাংলা সাহিত্যের কথা।

ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পুর্ব মৈমনসিংহ গীতিকা।

মণীন্দ্রমোহন বসু—চর্যাপদ, বাংলা সাহিত্য (প্রথম খণ্ড)

ডক্টর শশিভূষণ দাসগুপ্ত—চর্যাপদ বৌদ্ধগান।

আশুতোষ ভট্টাচার্য—বাংলা মঙ্গল-কাব্যের ইতিহাস।

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—জ্ঞানদাসের পদাবলী।

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক—বাংলা মুসলিম সাহিত্য।

ডক্টর সুকুমার সেন—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)

অরবিন্দ পোদ্দার—মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যেব মধ্যযুগ।

মদনমোহন কুমার—বাংলা সাহিত্যের আলোচনা।

ভূদেব চৌধুরী—বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা।

অধ্যাপক শংকরীপ্রসাদ বসু—মধ্যযুগের কবি ও কাব্য।

শ্রীশিবেন্দ্রনাথ গুপ্ত—বৈষ্ণব কবিতার রসধারা।

ডক্টর শশিভূষণ দাসগুপ্ত—শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ দর্শন ও সাহিত্যে।

তুলাসীপ্রসাদ লাহিড়ী—মধ্যযুগের বাংলা কাব্য।

যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য—বাংলা বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি।

আশুতোষ ভট্টাচার্য—লোকসাহিত্য।

শ্রীকণক বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা সাহিত্য পরিক্রমা।

আবদুল আজীজ আল্-মানের অপর প্রবন্ধ গ্রন্থ "সাহিত্যসঙ্গে"র বিস্তারিত সূচীপত্র নিম্নে দেওয়া হ'লো। গ্রন্থটি আধুনিক সাহিত্যের ওপর গবেষণামূলক তথ্যনিষ্ঠ মননশীল আলোচনায় সমৃদ্ধ।

● সূচীপত্র

চতুর্দশপদী কবিতাবলী ঃ

এক ।। সনেট এবং "চতুর্দশপদী কবিতাবলী"র আঙ্গিক দুই ।। নিভৃত মনের চিন্তা-আলাপনা ও ব্যথা-বেদনার প্রকাশ তিন ।। "চতুর্দশপদী"র স্বদেশীকতা চার ।। "চতুর্দশপদী কবিতাবলী"তে উপমা প্রযোগ ও অন্যান্য চিন্তা

কমলাকান্তের দপ্তর ও বিবিধ প্রবন্ধ ঃ

এক ।। প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্র এবং উভয় গ্রন্থের স্বরূপ দুই ।। কমলাকান্তের দপ্তর তিন ।। বিবিধ প্রবন্ধ

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবি মানস ঃ

এক ।। যতীন্দ্র-কাব্যের পটভূমিকা দুই ।। যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ ও তা'র স্বরূপ তিন ।। শাসক ও শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চার ।। যতীন্দ্র-কাব্যে সুর পরিবর্তন পাঁচ ।। প্রেম-সম্পর্কে সুর পরিবর্তন ছয় ।। রোমান্টিকতা সম্পর্কে সুর পরিবর্তন ঃ যতীন্দ্রনাথ রবীন্দ্র বিরোধী কিনা সাত ।। যতীন্দ্র কাব্যের ছন্দ ও আঙ্গিক

সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য-বৈশিষ্ট্য ঃ

এক ।। সত্যেন্দ্র কাব্যের পটভূমি দুই ।। কৌতুক ও কৌতুহলের কবি সত্যেন্দ্রনাথ তিন ।। ছান্দসিক সত্যেন্দ্রনাথ চার ।। সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ-বৈশিষ্ট্য পাঁচ ।। সত্যেন্দ্রনাথের কবি-বৈশিষ্ট্যের সার-সংকলন

বিহারীলাল ঃ

এক ।। বাংলা কাব্যের সুর পরিবর্তন দুই ।। সুর পরিবর্তন স্বরূপ ঃ সারদামঙ্গল তিন ।। সৌন্দর্য-চেতনা ঃ সাধের আসন চার ।। বিহারীলাল যত বড় কবি তত বড় শিল্পী নন

মধুসূদনের "বীরাঙ্গনা" কাব্য :

এক ।। বীরাঙ্গনা কাব্যের উৎস, আঙ্গিক ও নামকরণ দুই ।। মৌলিকত্ব, পত্রিকার শ্রেণীবিভাগ এবং বিচার তিন ।। দু'টি শ্রেষ্ঠ পত্রিকার বিচার

কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক :

এক ।। কুমুদরঞ্জনেব কাব্য-পটভূমি দুই ।। পল্লীপ্রীতি তিন ॥ ঐতিহ্য সংস্কৃতি-ধর্মমূলক কবিতাবলীর আলোচনা চার ॥ ইতিহাস-চেতনা স্বদেশ প্রীতি পাঁচ ॥ পল্লীপ্রীতিমূলক কবিতাবলীর আলোচনা ছয় ।। ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ জিনিষের বাজকীয় আধিপত্য সাত ॥ ধর্মচেতনা ও হবি-ভক্তি আট ।। কুমুদরঞ্জনের কাব্য-বীতি ও আঙ্গিক নয ॥ কুমুদ-কাব্য কালান্তরের সামগ্রী কিনা তা'ব বিচার

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী :

এক ॥ প্রাবন্ধিক রামেন্দ্রসুন্দব ত্রিবেদী দুই ॥ বামেন্দ্রসুন্দবের জ্ঞানানুসন্ধান এবং তিনি এবং তিনি সংশযবাদী কিনা

বাংলা নাটকের উদ্ভব ও বিকাশ :

এক ॥ যাত্রার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ : নাটকের সাথে তা'ব সম্পর্ক দুই ॥ বাংলা নাটকে সংস্কৃত নাটক, রঙ্গমঞ্চ এবং পাশ্চাত্ত্য নাটকের প্রভাব তিন । প্রাক্-ন্যাশনাল যুগেব প্রহসনধাবা

দীনবন্ধু মিত্র ও নীলদর্পণ :

এক ॥ বাংলা নাট্য-সাহিত্যে দীনবন্ধু মিত্র দুই ॥ দীনবন্ধুব প্রথম প্রচেষ্টায় নীলদর্পন এবং নাট্য-সাহিত্যেব তা'ব স্থান তিন ॥ নীল-দর্পণে উন্নত চবিত্রগুলি অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীব চরিত্রগুলি অধিকতর সার্থক চার ॥ নীলদর্পণে সমসাময়িক ঘটনা এবং নাটকের চিরন্তনতা পাঁচ । নায়ক-চরিত্রেব স্বরূপ এবং নীলদর্পণের নায়ক

বাংলা গদ্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ :

এক ॥ বাংলা গদ্যের প্রাচীন নিদর্শন ও সূচনা দুই ॥ বাংলা গদ্যে বিদেশীদের দান এবং তাঁ'রা বাংলা গদ্যের জনক কিনা তিন ॥

সাময়িক পত্রের উদ্ভব : বাংলা গদ্যে তা'র দান চার ॥ কয়েকজন শক্তিশালী .গদ্য-লেখকের রচনা-রীতি (মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ মিত্র)

ছিন্নপত্র :

এক ॥ রবীন্দ্রনাথের পত্রসাহিত্যের বহুমুখীনতা দুই ॥ ছিন্নপত্রের নামকরন এবং রবীন্দ্র-পত্র সাহিত্যের মধ্যে তা'র স্থান তিন ॥ সমকালীন সৃষ্টিতে ছিন্নপত্রের দান চার ছিন্নপত্রে হাস্যরস

জীবনস্মৃতি :

এক ॥ ভূমিকা : অত্মজীবনীর শ্রেণীবিভাগ দুই ॥ জীবন স্মৃতিতে অত্মজীবনীর অংশ তিন ।। বিভিন্ন অভিজ্ঞতা বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রভাব ।

লিপিকা :

এক ॥ ভূমিকা: লিপিকার রচনার শ্রেণীবিভাগ দুই ॥ ছোট গল্প তিন ॥ নিবন্ধ সাহিত্য চার ॥ গদ্যকাব্য পাঁচ ॥ রূপক রচনা

প্রাবন্ধিক বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর :

এক ॥ প্রবন্ধিক বলেন্দ্রনাথেব স্বরূপ দুই ॥ বলেন্দ্র-প্রবন্ধের শ্রেণী-বিভাগ ও আলোচনা ক ॥ প্রাচীন শিল্পলোচনা খ ॥ প্রাচীন সাহিত্য সংক্রান্ত আলোচনা গ ॥ ঐতিহাসিক স্মৃতিমূলক প্রবন্ধ ঘ ॥ সামজিক প্রবন্ধ ঙ ॥ ব্যক্তিগত প্রবন্ধ

শিশু-সাহিত্য ও নজরুল :

এক ॥ শিশু-সাহিত্যের ভূমিকা দুই ॥ বাংলা ভাষায় শিশু-সাহিত্যের ক্রমবিকাশ তিনি ॥ নজরুলের শিশু-সাহিতের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট এবং শ্রেণী-বিভাগ চার ॥ নাটিকা ও কবিতাবলীর আলোচনা পাঁচ ॥ শিশু-সাহিত্যে নতুনতর সুরের প্রবর্তনা

কবি নজরুল :

এক ॥ নজরুল-সাহিতের পটভূমি দুই ।। নজরুল কাব্যের স্বরূপ তিন ।। নজরুলের প্রেমের কবিতা

কয়েকটি-ধারার উৎপত্তি ও বিকাশ :

এক ।। রস রচনার উদ্ভবও বিকাশ দুই ।। গীতি-কবিতার ক্রমবিকাশের ধারা তিন ।। উপন্যাসের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ ক ।। প্রাথমিক অবস্থা উপন্যাসের সূত্রপাত খ ।। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র এবং সামাজিক উপন্যাস গ ॥ বাংলার ঐতিহাসিক উপন্যাসের সূচনা ও ক্রমবিকাশ

কাব্যালোক :

এক ॥ নাট্যরস ও কাব্যবস দুই ॥ কযেকটি অলংকারিক পবিভষার (স্থায়িভাব, বিভাব-আলম্বন বিভাব, উদ্দীপন বিভাব, অনুভাব. ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাব, বিভানা ব্যাপার, সাধারণীকবণ, অঙ্গীবস দীপ্তি কাব্য, দ্রুতিকাব্য, বাচ্যার্থ,ব্যঙ্গার্থ) ব্যাখ্যা তিন ।। ভাবেব স্থায়ী ও ব্যভিচারী রূপে ভেদ স্বীকারেব প্রযোজন চাব ॥ রস অভিব্যক্ত হয বলার পিছনে যুক্তি পাঁচ ॥ রস আলৌকিক এবং কাব্যের আত্মা ছয় ॥ রস নিষ্পত্তিতে বিভাব, অনুভাব এবং সঞ্চাবী ভাব সাত ॥ ধ্বনি ধ্বনিবাদের উৎপত্তি ও বিকাশ আট ॥ দ্রুতিকাব্য এবং দীপ্তিকাব্য নয ॥ দ্রুতি এবং দীপ্তিকাব্য কি পবস্পর-বিবোধি দশ ॥ শব্দ ও অর্থ কুন্তক এগাব ।। বক্রোক্তিবাদ : কুন্তক

রবীন্দ্রনাথের কালান্তর ঃ

এক ।। কালান্তর